বাঙালী জীবনে রমণী

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

নীরদচন্দ্র চৌধুরী—অথবা আরও পরিচিত—Nirad C. Chaudhuri ইংরাজী তথা বিশ্বসাহিত্যে এক বিস্ময়কর নাম। তাঁর যে কোন রচনা প্রকাশিত হলেই একটা বিতর্ক বিসম্বাদের ঝড় ওঠে। তবুও, বহুবিতর্কিত এই লেখকের মতবাদ যে পৃথিবীর লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে সাবধানে পাঠ করেন তার কারণ লেখকের অবিশ্বাস্য মনীষা। তাঁর মেধা, তাঁর জ্ঞান কোন একটি বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ নয়, বস্তুত তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিধি নির্ণয় করতে গেলে তাঁকে অমানুষিক শক্তির অধিকারী বলেই মনে হয়। সঙ্গীত থেকে অর্থশাস্ত্র, চিত্রশিল্প থেকে ভূবিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে নৃতত্ত্ব, রাজনীতি থেকে সাহিত্যতত্ত্ব—সকল বিদ্যা ও শাস্ত্রেরই একেবারে শিখরচূড়ায় তাঁর আনাগোনা। তাঁর এক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ কল্পনাতীত মূল্যে গ্রহণ করেন বিখ্যাত পত্রপত্রিকারা। কিন্তু শুধু ইংরাজীতেই নয়—বাংলাসাহিত্যেও তাঁর অসামান্য দখল। খুব অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী লেখকই এই ইংরেজীনবিশ লেখকের মতো শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লিখে পুনরায় বাংলাসাহিত্যের দরবারে বিজয় প্রবেশ করেন। এই গ্রন্থ তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই—সে হিসেবে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। নীরদবাবুর এই বই পাঠকদের উপহার দিতে পেরে প্রকাশকগণ গৌরবান্বিত বোধ করছেন।

বাঙালী জীবনে রমণী

আবির্ভাব

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

"To burn always with this hard, gemlike
flame, to maintain this ecstasy,
is success in life."

—Pater

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

যে

ভালবাসার কাহিনী

এই বই-এ লিখিলাম

তাহারই উদ্দেশে

এই বইখানা

উৎসর্গও

করিলাম

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

লেখকের অন্যান্য বই

THE AUTOBIOGRAPHY OF AN UNKNOWN INDIAN
London, New York 1951, Bombay 1964

A PASSAGE TO ENGLAND
London, 1959, New York 1960

THE CONTINENT OF CIRCE
London 1965, New York 1966, Bombay 1966

THE INTELLECTUAL IN INDIA
New Delhi 1967

TO LIVE OR NOT TO LIVE
New Delhi 1970

SCHOLAR EXTRAORDINARY
The Life of F. Max Muller
London 1974

CLIVE OF INDIA
London 1975

CULTURE IN THE VANITY BAG
Bombay 1976

HINDUISM
London 1979

THY HAND, GREAT ANARCH!
London 1987
(Ananda Puraskar)

বাঙালী জীবনে রমণী
(লেখকের প্রথম বাংলা বই, কলিকাতা ১৯৬৮)

আত্মঘাতী বাঙালী
(দ্বিতীয় বাংলা বই—যন্ত্রস্থ)

পরিচ্ছেদ বিভাগ

পাঠক-পাঠিকার প্রতি নিবেদন

আমার বইটা পড়িবার সময় একটি দেশী ও একটি বিদেশী উক্তি মনে রাখিতে বলিব। দেশীটি এই—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

আত্মার সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, যে-কোনও বিষয়ে সত্য আবিষ্কার সম্বন্ধে তাহাই বলা চলে—শুধু বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের সব চেয়ে বড় দৈন্য উষর তর্কপ্রবণতা, হৃদয়হীনতা।

দ্বিতীয় কথাটি হৃদয় ও বুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে। উহা প্যাস্কালের উক্তি—

Le coeur a ses raisons, que la raison
ne connait point : on le sait en mille choses.

(হৃদয়ের যুক্তি আছে কিন্তু তাহা যুক্তির একেবারে অগোচর। ইহা সহস্র ব্যাপার হইতে জানা যায়।)

সুতরাং বাংলাদেশে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত আমার বই তাঁহাদের জন্য নয়, যে-বাঙালীর এখনও হৃদয় আছে তাঁহারই জন্য। আশা করি এত দুঃখকষ্টেও বাঙালীর হৃদয় একেবারে শুকাইয়া যায় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া বই লিখিবার অধিকার আছে তাহা জোর করিয়া বলিব না। বাংলাতে বই লিখিবার কারণ আমার দিক হইতে সরল ভাবে জানাইতেছি।

এ পর্যন্ত আমি বাংলা বই লিখি নাই, এই আমার প্রথম বই। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইংরাজীতে প্রথম বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সত্তর বৎসর বয়সে বাংলায় লিখিলাম। ইংরাজীর বেলাতেই দেরি হইয়া গিয়াছে মনে করিয়াছিলাম, সুতরাং বাংলার ক্ষেত্রে আরও কত দেরি যে হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিতেও ভীতি হইতেছে।

ইহার চেয়েও ভয়ের কথা, ১৯৪৩ সন হইতে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত দুই একটা অত্যন্ত তুচ্ছ রচনা ছাড়া বাংলাতে কিছুই লিখি নাই। একসময়ে আমি যে বাংলা ভাষাতেও লেখক ছিলাম তাহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামী বারো বৎসর নিরুদ্দেশ হইবার পর স্ত্রীও যখন বিবাহ করিতে পারে, তখন লোকের ভুলিয়া যাওয়া অবিচার মোটেই নয়। ১৯৬৬ সনের মাঝামাঝি আবার বাংলাতে লিখিতে

আরম্ভ করিয়াছি। উহার ফলে বাঙালী পাঠক সমাজে বাংলার লেখক হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছি কিনা বলিতে পারি না।

নূতন করিয়া বাংলা লেখার মূলে বন্ধুবর গজেন্দ্রকুমার মিত্র। তিনি পীড়াপীড়ি না করিলে আবার বাংলা লিখিবার ধারণাও আমার মাথায় আসিত না। পঁচিশ বৎসর দিল্লীতে আছি, এখানকার বাঙালী সমাজের সহিত সেদিন পর্যন্ত কোনও পরিচয়ই ছিল না, এখনও বিশেষ নাই—তাই বাঙালীর সাহচর্য হইতেও যে বাংলা লেখার ঝোঁক আসিবে তাহারও সম্ভাবনা ছিল না।

কেহ কখনও বাংলা লিখিতে বলিলে একটা বড় বাধার কথা বলিতাম। সেটা এই—আমি আধুনিক বাংলা লিখিতে পারি না, প্রয়োজনও হয় না, কারণ ইংরেজীতেও লিখি বলিয়া আমার ইংরেজীতে লেখার স্পৃহা ইংরেজীগন্ধী বাংলা লিখিয়া তৃপ্ত করিবার কোন মানসিক তাগিদ আসে না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি আজিকার বাংলা বুঝিতেও পারি না।

ইহা সাধু ভাষা ও কথিত দুই ভাষার পার্থক্যের জন্য নয়। আমি বাংলা সাধু এবং কথিত দুই ভাষাই বুঝি। কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্য না আগেকার সাধু না আজিকার মৌখিক ভাষা, এই দুইটার কোনটাই নয়। উহা সম্পূর্ণ নূতন ভাষা। কথিত ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ বা তিঙ্‌ন্তপ্রকরণ ভিন্ন ইহাতে স্বাভাবিক কিছুই নাই। বাংলা গদ্যের যে অপূর্ব প্রাঞ্জলতা ও তীক্ষ্ণ ধার ১৯১০ পর্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা আর দেখা যায় না। এখন একটা নব্য গৌড়ী রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার 'মাধ্যমে' লিখিবার সাধ্য আমার নাই, নীচু গলায় বলিব—ইচ্ছাও নাই। আমি যখন বাংলা লিখি তখন বোধ্য বাংলায় লিখি, অথচ ইহাতে যে বিপদ আছে তাহাও পরিষ্কার। আমার কথা বোঝা যায় বলিয়া বোঝামাত্র প্রবল আপত্তি আরম্ভ হয়। যাহারা অবোধ্য ভাষায় লেখেন, তাঁহাদের এই ফ্যাসাদ বা বালাই নাই—তাঁহারা দিব্য লেখক বলিয়া খ্যাতি পান, আমার ভাগ্যে সাধারণত নিন্দাই জোটে।

ভাষাগত আপত্তি ছাড়াও বাংলা লেখা সম্বন্ধে আমার উদাসীনতার আর একটা কারণও ছিল। ১৯২৭ সনে প্রথম বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিবার মাসকয়েকের মধ্যেই আমার বিশেষ নিরুৎসাহ আসে একটা জিনিস উপলব্ধি করিয়া। সেটা এই যে, লিখিয়া পাঠক সমাজের কাছ হইতে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। এই নিরুৎসাহের কথা আমি তখনই মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে এই নিরুৎসাহ কাটাইয়া উঠিতে বলেন। কিন্তু নিরুৎসাহ কোনদিনই কাটে নাই।

যাহার মধ্যে সত্যকার লেখকধর্ম আছে সে কখনও শুধু নাম বা প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিতে পারে না। যে ব্যক্তি কেবল এই দুটির জন্য লেখে তাহার অপেক্ষা নিম্ন-স্তরের লেখক হইতে পারে না। অবশ্য জীবিকার জন্য অনেক সময়ে অন্য উপায় না থাকিলে বাধ্য হইয়া লিখিতে হয়। কিন্তু ইহাতে লেখার কোন উৎসাহ থাকে না, পরে লেখা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। আমার ইংরেজী বা বাংলায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিখ্যাত সাহিত্যিক হইবার আশা কোনকালেই ছিল না। আমি চাইতাম শুধু আমার 'আইডিয়া' প্রচার করিতে। সুতরাং সাড়া না পাইয়া মনে হইয়াছিল বাংলাদেশে লেখকবৃত্তি নিষ্ফল। খ্যাতির কুমীর যাঁহারা হইতে চান, তাঁহারা তাই হউন, তাঁহাদের সহিত আমি টেক্কা দিতে যাইব না।

আশ্চর্যের বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনেই বাঙালী সাহিত্যিকের এই ব্যর্থতা অনুভব করিয়াছিলেন। গেটের জীবনী পড়িবার সময়ে জার্মানীর সাহিত্য-রসিক সমাজের সহিত বাংলাদেশের পাঠক সমাজের পার্থক্য অনুভব করিয়া তিনি ১৮৯৪ সনের ১২ই আগস্ট তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন—

"আমরা হতভাগ্য বাঙালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্তমনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি—তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড় শরীরের মধ্যে একটা মানস শরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেই জন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যক বোধ নিতান্তই কম—অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই, কেননা বোলচাল সমস্তই ইংরাজী থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে—সেই জন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল, তাহলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণ-সঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব। আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক—নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।"

এই কথাগুলি তখন না পড়িলেও, এই নিরুৎসাহ আমিও অনুভব করিয়াছিলাম।

ইহার উপরও আবার বাঙালী জাতি ও বাঙালীর সভ্যতা সম্বন্ধে একটা নিরাশা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই দুই-এর কোনও ভবিষ্যৎ ভরসা আছে তাহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাংলা ভাগ হইবার পর এই বিশ্বাস একেবারে দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। তাই ভাবিতাম যে-জাতির মৃত্যু বা অধোগতি অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য পরিশ্রম করা কেন ?

তবে আবার বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিলাম কি কারণে, এই কৈফিয়ত চাহিতে পারেন। বলিব, কারণটা একটা উপলক্ষ হইতে দেখা দিল। গজেনবাবু বরাবরই আমাকে মৃত বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখিতে বলিতেন। আমি নানারকম স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতাম। কিন্তু ১৯৬৬ সনে নন্দলাল বসুর মৃত্যুর পর যখন তিনি আমাকে 'কথাসাহিত্যে'র জন্য কিছু লিখিতে বলিলেন, তখন নন্দবাবুর উপর অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকাতে একটা প্রবন্ধ লিখিলাম।

লিখিবার সময়ে দেখিলাম, বাংলা লেখার অভ্যাস একেবারে হারাই নাই। সুতরাং যে একটা মনোভাব কিছুদিন আগে হইতে অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল, তাহা জোর পাইল। নূতন তাগিদটা এই প্রকার।

আমার ইংরেজী বই মুখ্যত ইংরেজী-ভাষা-ভাষী সমাজের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত হইলেও আমি জানিতাম ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে ইংরেজী জানা পাঠকেরা উহা পড়িবেন। আমার আলোচ্য বিষয় যখন আমাদের ইতিহাস, আমাদের জীবন সমাজ ও সভ্যতা এবং এই সব সম্বন্ধে বিশেষ মত প্রচার করাই যখন আমার উদ্দেশ্য, তখন ভারতবর্ষের লোকের কাছে উহা না পৌছিলে আমার লেখা অনেক অংশে বৃথাই হইত ভাবিয়াছিলাম, ইংরেজীতে লিখিয়াই এদেশের পাঠকসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিব। এই আশা খানিকটা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে নিষ্ফলও হইয়াছে।

আমি বুঝিয়াছি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া আজিকার বাঙালী শিক্ষিতসাধারণের কাছে পৌছিতে পারিব না। প্রথমতঃ, তাহারা ইংরেজী পড়িবার অভ্যাস হারাইয়াছে, সুতরাং কোনও রকম ইংরেজী পড়িতেই আয়াস অনুভব করে, রস তো পায়ই না। দ্বিতীয়তঃ, যে-ইংরেজীতে লিখিলে বই বিলাতি প্রকাশক গ্রহণ করিবে, সেই ইংরেজী বুঝিবার ক্ষমতা বেশীর ভাগ বাঙালী পাঠকের গিয়াছে। অর্থের অর্ধেক হয়ত তাহারা বুঝিতে পারে, কিন্তু বাকী অর্ধেক ও ব্যঞ্জনা তাহাদের মনে প্রবেশ করে না। কেউ যদি সঙ্গীত শুনিবার সময় বেশ খাদের দিক (অর্থাৎ ১৫০ স্পন্দনের নীচেকার ধ্বনি) ও বেশ চড়ার দিক (অর্থাৎ ৪০০০ স্পন্দনের উপরের ধ্বনি) শুনিতে না পায়, তাহার সঙ্গীত শোনা যে কি প্রকার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বিলাতে যে ইংরেজী গ্রাহ্য তাহার বেশীর ভাগ সাধারণ পাঠক এই রূপে অংশত মাত্র নিতে পারে। সুতরাং ইংরেজীতে বাঙালী সাধারণের জন্য লেখা কেন? অথচ বাংলা দেশ ও বাঙালীর যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কাহারও যদি কিছু বলিবার থাকে উহা বাঙালীর বোধ্য ভাষায় বলা উচিত।

এইভাবে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে নন্দবাবু সম্বন্ধে লিখিবার অনুরোধ আসিল এবং এই লেখার ফলে অনেক দিন ধরিয়া বাংলা লেখার সম্বন্ধে যে সঙ্কোচ ছিল তাহা কাটিল, বাংলা লেখা সম্বন্ধে আড়ষ্টতাও খানিকটা গেল। তাহার ফলে ভাবিলাম, বাংলাতে লেখা চালাইলে হয় না? আরও একটু সাহস করিয়া তখন 'দেশে'র জন্য একটা প্রবন্ধ পাঠাইলাম। উহার ভাব ও ভাষা দুইএর সম্বন্ধেই প্রবল সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছ হইতে ভরসা পাইলাম। সুতরাং বাঙলাতে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলাম। পরে যখন গজেনবাবু বই লিখিতে বলিলেন, উহাতেও একটু ভরসা করিয়া সম্মত হইলাম। এই হইল বইটা লিখিবার ইতিহাস। এই বিষয় লইয়া ইংরেজীতে বই লিখিবার ধারণা অনেকদিন হইতেই ছিল, সুতরাং বিষয় সম্বন্ধে ভাবনায় পড়ি নাই।

এই কৈফিয়ত হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আমি বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবার জন্য বা বাঙালী সমাজে সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য বই লিখিতে বসি নাই। আরও বই লিখিব, কিন্তু উদ্দেশ্য হইবে একান্তই বাঙালীর সহিত বাঙালী জীবনের ইতিহাস ও ধর্ম লইয়া কথাবার্তা চালানো। যতক্ষণ পাঠক-পাঠিকা আমার কথা শুনিবেন (অর্থাৎ পড়িবেন) ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত থাকিব, বাংলাতে সাহিত্যিক হইলাম কি হইলাম না এই প্রশ্ন তুলিব না।

দিল্লী

মার্চ, ১৯৬৮

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

এই বই-এ 'দেশ' ও 'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ অদলবদল করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এই দুই পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীরা আমাকে প্রবন্ধগুলি এইভাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

ভূমিকা

বিষয়টা কি ?

'বাঙালী জীবনে রমণী', শুধু এই নাম হইতে বই-এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানারকমের ধারণাই জন্মিতে পারে। তাই আমি কি বিষয়ে লিখিতে যাইতেছি তাহা গোড়াতেই পরিষ্কার করিয়া লইতে চাই। আমরা বাঙালীরা ধাতে নৈয়ায়িক, ন্যায়ের ফক্কিকা তোলা আমাদের কথাবার্তা ও লেখার একটা বড় আনন্দ। আমার কাছে কিন্তু এই কচ্‌কচি অত্যন্ত খারাপ লাগে। তাই তর্কের কোনও অবকাশ বই খুলিবা-মাত্রই দিতে চাই না।

প্রথমতঃ, বইটা পুরুষ ও নারীর দৈহিক সম্পর্কের আলোচনা নয়। উহা জৈব ব্যাপার। ইহাতে বাঙালী-অবাঙালীর প্রভেদ দূরে থাকুক, মূলত মানুষে এবং পশুতেও কোনও তারতম্য নাই। সুতরাং এই জিনিসটাই যদি প্রসঙ্গ হয় তাহা হইলে উহাকে বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের মধ্যে আবদ্ধ করিবার কোনও অর্থ হয় না। এই দেহধর্মের যতটুকু নৈসর্গিক তাহার সম্বন্ধে কেবলমাত্র জ্ঞানমার্গে থাকিতে হইলে জীবতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বই পড়াই যথেষ্ট। অবশ্য ইহা সত্য যে, মানুষ এই জৈব ব্যাপারের কর্মকাণ্ডকে পুরাপুরি জৈব রাখে নাই, উহার উপর এক ধরনের 'মনুষ্যত্ব' বা 'ইনসানিয়ৎ' চাপাইয়াছে। কিন্তু এই জৈববৃত্তির নিসর্গোত্তর পরিতৃপ্তির জন্য পুরাতন কামসূত্র বা নূতন 'যৌনবিজ্ঞান' পড়িলেই চলে। আমি বেনামীতে এই পুরাতন শাস্ত্র বা নূতন বিজ্ঞান লিখিতে বসি নাই।

ইহার পর আর একটা কথাও বলা আবশ্যক। আমি বাঙালী নরনারীর সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কের আলোচনাও করিব না। উহা সমাজতত্ত্বের বিষয়। আমার কারবার একান্তই ব্যক্তিগত মানসিক জীবন লইয়া। সুতরাং ব্যক্তি হিসাবে নরনারীর মধ্যে যে নিবিড় ও বিশিষ্ট মানসিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার পরিধিই আমার আলোচনারও গণ্ডী। তবে এই সম্পর্কও বিশ্বজনীন এবং সর্ব-কালীন। সুতরাং আমার বিষয়বস্তুকে দেশে ও কালে আরও নির্দিষ্ট করিতে হইবে। সোজা কথায় বাঙালী জীবনের একটা বিশেষ যুগে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক যে বিশিষ্ট রূপ ধরিয়াছিল তাহার একটা বিবরণ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

আসলে বইটার বিষয়বস্তু বাঙালী জাতির মানসিক ইতিহাসে আধুনিক কালের মধ্যে আবদ্ধ। এই কাল বিগত দেড়শত বৎসর। এই যুগটা আবার আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবের কাল। সুতরাং আর এক দিক হইতে বইটাকে বাঙালী জীবনে ইউরোপীয় প্রভাবের ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ বলা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে আমাদের জীবন ও কার্যকলাপের উপর ইউরোপীয় জীবনধারা ও সভ্যতার ধাক্কা লাগিতে আরম্ভ হয় ও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই প্রভাব একটা বন্যার মত হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে যে নব্য বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ধর্মানুভূতি ও ধর্মান্দোলন দেখা দেয়, সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, অবশেষে জাতীয়তাবোধ জাগে ও স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে। ইংরেজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা বাংলা দেশে না আসিলে এ-সবের প্রবর্তন যে হইত না, উহাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা, চিন্তা ও ভাব আমাদের মানসিক জীবন ও অনুভূতিতে কি নূতনত্ব আনিয়াছিল তাহার আলোচনা হয় নাই বলিলেই চলে। অথচ ইউরোপীয় সভ্যতার সম্পর্শে আসিবার পর বাঙালীর মন যে আর আগেকার বাঙালী মন থাকে নাই তাহা পরবর্তী যুগের কার্যকলাপের যে-কোনও একটার বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়িবে, দেখা যাইবে যে এই কার্যকলাপের পিছনে যেসব ধ্যান-ধারণা বা ঝোঁক ছিল তাহার প্রায় সবটুকুই বিদেশী, শুধু দেশী ছাঁচে নূতন করিয়া ঢালা।

এই মানসিক পরিবর্তনের প্রধান সাক্ষী ভাষা। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা ভাষাই মানসিক জীবনের আধার ও অবলম্বন—ভাষায় ব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানসিক জীবনের ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হয় না, এমন কি মনের যে অস্তিত্ব আছে তাহারও উপলব্ধি হয় না। সেজন্য মানসিক জীবনের প্রসার ও শক্তি যত বেশী হয়, ভাষারও তত উন্নতি হইতে থাকে। মানসিক জীবনের প্রসার বা পরিবর্তন হইতে পারে দুই ভাবে—কোনও জাতির এবং তাহার সভ্যতার আভ্যন্তরীণ পরিণতির ফলে; তাহার পর বাহিরের কোনও জাতি বা সভ্যতার সংস্পর্শে। সাধারণত উহার পিছনে এই দুইটা কারণই একই সঙ্গে বর্তমান থাকে।

বাংলা দেশে ভাষাবিবর্তনের প্রধান কারণ কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাবের সংঘাত। সুতরাং যেই এই ধাক্কা লাগিল তখনই বাংলা ভাষার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল, উহার অতিরিক্ত বাঙালীর মধ্যে ভাষাগত একটা দ্বিত্বও দেখা দিল, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালী বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সৃষ্টি হইল তাহা আজও চলিয়াছে।

তবে যেটা নূতন যুগের সর্বাপেক্ষা বড় লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ইংরেজীর প্রাধান্য। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি চরম প্রমাণ। ১৮৭২ সনে 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাকু, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায়

হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাংলায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।"

ইংরেজীর প্রতি এই পক্ষপাতের কারণ দেখাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটু বিদ্রূপও করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান ; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজীতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না ; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান-মর্য্যাদা হয় না ; ইংরাজের কাছে মান-মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন ; ইংরাজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত।"

এইবার বাংলা বই সম্বন্ধে মন্তব্য :—

"সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবর্ষঃ পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।"

ব্যাপারটা বিসদৃশ এবং কতকটা ব্যঙ্গের যোগ্য হইলেও একথা বলা দরকার যে, ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের পিছনে একটা দুর্নিবার শক্তি ছিল, সুতরাং ব্যবহার না করিবার উপায় ছিল না। যেসব নূতন চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার ধারণা বাঙালী সে-যুগে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ও বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিতেছিল, বাংলা ভাষার এত ক্ষমতা ছিল না যে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে, এমন কি অংশতও প্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইল এই—বাংলা ভাষার উপযুক্ত প্রসার না হওয়া পর্যন্ত এসব ভাব ও চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখা, না তখনকার মত অর্থাৎ সাময়িকভাবে এইসব চিন্তা ও ভাবের মৌলিক ভাষা যাহা তাহাকে, অর্থাৎ ইংরেজীকেই অবলম্বন করা। সে-যুগের

বাঙালী নূতন মানসিক জীবনকে প্রত্যাখ্যান করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পরিশ্রম এড়াইবার ঝোঁকে ইংরেজীই ধরিয়াছিল।

এই জিনিসটা যে কেবলমাত্র বাংলা দেশেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, অন্যত্রও দেখা গিয়াছে। রোমানদের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব পড়িবার পর তাহারা কতকগুলি ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া দার্শনিক আলোচনায় গ্রীক ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের দার্শনিক চিন্তা গ্রীকে লেখা, তিনি রাজকার্য অবশ্য ল্যাটিন ভাষাতেই চালাইতেন। আধুনিক ইউরোপেও এই ধারার ব্যতিক্রম হয় নাই। ফরাসী সভ্যতার প্রভাব ইউরোপের অন্যত্র বিস্তৃত হইবার পর জার্মেনিতে ও রুশিয়ায় ফরাসী ভাষা ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট ফরাসী ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন, চিঠিপত্রও সেই ভাষাতেই লিখিতেন। এমন কি বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন তাঁহার প্রথম বই ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। আসলে জীবনযাত্রা, চিন্তা ও অনুভূতির পরিবর্তন যদি কোনও বিদেশী সভ্যতার সংঘাতে হয়, তাহা হইলে বিদেশী ভাষাও আসে, এবং দুই ভাষার সংঘর্ষে একটা ভাষাগত বিপ্লব দেখা দেয়।

এই বিপ্লবের জন্য বাংলা দেশে, কিংবা শুধু বাংলা দেশ বলি কেন সমস্ত ভারতবর্ষেই, ভাষা সম্পর্কিত বহু সমস্যা দেখা দেয়। উহার সমাধান না বাংলা, না অন্যত্র, কোথাও আজ পর্যন্ত হয় নাই। ইংরেজী ভাষা ও দেশী ভাষার ব্যবহার ও সম্বন্ধ লইয়া আজকাল যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, উহা প্রায় প্রলাপের মত ; এইরূপ হইবার কারণ সমস্যাটার গুরুত্ব ও জটিলতা। ইহার সহজতম সমাধান ইংরেজীতে কথা বলা বা লেখা। পঁচিশ বৎসর দিল্লীতে থাকিয়াও আমি কাহারও সহিত হিন্দীতে কথা বলি না। ইহাতে এ অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায় আশ্চর্য হন না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই আর একটা ব্যাপার দেখিয়া—কলিকাতা হইতে কতজন বাঙালী আসিয়া আমার বাড়ীতে আমার সহিত নিতান্ত ঘরোয়া বিষয়ের আলোচনাতেও কতটা ইংরেজী চালান। উহা আমার কাছে বিরক্তিকর।

তবে এও আমি বলিব যে, এমন কতকগুলি বিষয়, চিন্তা, ভাব ও অনুভূতি আজিকার বাঙালীর মনে আছে, যাহার জন্য আমরা ইংরেজী ব্যবহার না করিয়া এখনও বাংলাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি না। এমন কি খাঁটি বাঙালী জীবনেরও এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহার বেলাতে উহারই সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য হইতে নূতন অনুভূতি আসার ফলে আমরা এখনও বাংলা ব্যবহার করিতে পারি না—অবশ্য যদি বক্তব্য হইতে সেই নূতন অনুভূতি একেবারে বাদ দিতে না হয়। আমি বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই লিখি এবং কথা বলি, সুতরাং এই দ্বিত্ব ও দ্বন্দ্ব আমি খুব

বেশী করিয়া অনুভব করি। নিজের লেখা হইতেই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরে দুর্গাপূজার মন্ত্রও ইংরেজীতে পঠিত হইবে। মন্ত্র না হউক, দুর্গাপূজা সম্বন্ধে এক ধরনের বর্ণনা যে ইংরেজী ভিন্ন বাংলায় লেখা সম্ভব নয় তাহা আমি নিজের ইংরেজী আত্মজীবনীতে দুর্গাপূজার বৃত্তান্ত লিখিবার পর বুঝিয়াছি। এই বৃত্তান্তের পিছনে যে অনুভূতি ও আবেগ আছে তাহা বাঙালীর প্রথাগত অনুভূতি নয়—যে চোখ দিয়া আমি উহা দেখিয়াছি, যে মন দিয়া আমি উহা উপলব্ধি করিয়াছি, উহা বাঙালীর পুরাতন চোখও নয়। সুতরাং কেহ যদি আমার বিবরণকে বাংলা করিবার চেষ্টা করেন, তিনি দেখিবেন যে উহা প্যারা যায় না। আমি নিজেও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইংরেজীতে আমি যাহা বলিয়াছি বা যাহার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছি, আমিও বাংলা ভাষায় তাহা করিতে পারি না। গোটাকতক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "The evening which followed had no suggestion of what we had seen in the morning, nor of what had sung at mid-day. It was neither orgiastic nor devotional, but gay and heart-free with lights blazing, a whole crowd laughing and jostling, and the wild music more self-abandoned and noisy than ever."

দুর্গাপূজা একান্ত করিয়া বাঙালীর জিনিস। ইহার বেলাতেই যদি নূতন অনুভূতির দরুন ভাষাগত বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেসব ব্যাপার একেবারে বিদেশী উহা বাংলাতে প্রকাশ করা কত দুরূহ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কষ্ট ও উৎপাত এড়াইবার জন্য বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণের প্রথম যুগে ইংরেজী ব্যবহার করিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাই বাঙালীর ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের মূল কারণ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিমান করিবার চেষ্টাও আরম্ভ হইল। ইহার ফলে ১৯০০ সনের মধ্যে বাংলা গদ্য ও পদ্যের যে রূপ দেখা দিল, আমরা তাহার গর্ব করিতে পারি। কিন্তু ভাষার পরিধিকে আগেকার সীমার মধ্যে রাখিয়া এই উন্নতি হয় নাই, আগেকার প্রকাশরীতি রাখিয়াও হয় নাই। ইহার জন্য বাংলা ভাষাকে ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি শুধু একটা বিষয়ের নূতন ব্যাখ্যারীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিব। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি যাহা একান্তভাবে হিন্দুরই, সেই

গীতার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে। গীতার নূতন ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কৈফিয়ত হিসাবে তিনি বলিতেছেন :—

"এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর 'শিক্ষিত' বলা হইয়া থাকে, আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে 'শিক্ষিত' শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিত-দিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্ত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না।

"ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।"

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে নূতন যুগের জন্য বাংলা লেখা কি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তবু নূতন একটা বাংলা সাহিত্য যে গড়িয়া উঠিল উহা আমাদের বড় জাতীয় কীর্তি।

ভাষার আলোচনা এই বই-এর উদ্দেশ্য নয়; কেবলমাত্র বাঙালীর মানসিক পরিবর্তন কতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার আভাস দিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা সংক্ষেপে করিলাম। এই পরিবর্তনের ফলে বাঙালীর মনে ঊন-বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি জিনিস একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল—যেমন, মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা; আবার কতকগুলি জিনিস নূতন চক্ষে নূতন ভাবে দেখিতে

শিখিলাম—যেমন ঈশ্বর, নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এই সবগুলি লইয়া ইংরেজীতে একটা বই লিখিবার উদ্দেশ্য আছে। এই বাংলা বইটাতে শুধু দেহসৌন্দর্য ও নরনারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে যে নূতন ধারণা ও ভাব দেখা দিয়াছিল তাহার কথাই বলিব। আশা করি বই-এর বিষয়টা যে কি তাহা এতক্ষণে স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি।

ইহার পরও অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিষয়টা কি এতই বড় কিংবা এতই অজানা যে, ইহাকে লইয়া একটা পুরা বই লিখিতে হইবে ? এই বইটা শেষ করিবার পর পাঠক নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। আমি প্রধানত নিজের মনের তাগিদে কাহিনীটা লিখিতে বসিয়াছি। আমি মনে করি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীরা ইউরোপীয় ও হিন্দু এই দুই ধারার সমন্বয়ে নরনারীর সম্পর্কের যে একটা নূতন ধারণা করিয়াছিল—যাহার প্রকাশ সমস্ত বাংলা সাহিত্য জুড়িয়া আছে, এবং যে ধারণাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকটা কাজে পরিণত করিয়াছিল, উহা নূতন সাহিত্য, গান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা ধর্মান্দোলনের মত বর্তমান যুগের বাঙালীর একটা বড় কীর্তি। এই অভিমতের বশে আমি আমার নূতন বই 'দি কন্টিনেন্ট অফ্ সার্সি'-তে লিখিয়াছি :—

> "It was a revelation of the passional life of Europe through English literature which took the Bengali Hindus by storm, and its impact led them to recast the love of Europe in a Bengali Hindu mould, and bring into existence one of the most beautiful passional creations in literature and life ever seen in history."

অথচ ইহার কাহিনী বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, বাঙালীর কাছেও প্রায় অজ্ঞাত। সুতরাং উহা বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, উহাতে একটা মানসিক শান্তি এবং সুখের প্রশ্নও আছে। আজ বাঙালী জীবন সব দিকেই বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। ইহার ফলে সব দিকেই বাঙালীর অধোগতি হইতেছে, অন্ততপক্ষে তীব্র অসন্তোষ এবং চিত্তবিক্ষোভ যে সকলের মধ্যেই দেখা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সময়ে পুরাতন কীর্তির কথা স্মরণ করিয়া যদি উদ্যম ফিরিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা করা আবশ্যক। আর উদ্যম না আসিলেও পুরাতন সুখের কথা স্মরণ করিয়া যদি শুধু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, সে সুযোগই বা অবহেলা করিব কেন ?

নিজের দিক হইতে অন্তত একটা কথা বলিতে পারি। আমি আজ পঁচিশ বৎসর

বাংলা দেশ ছাড়া, দিল্লীপ্রবাসী, একদিনের জন্যও কলিকাতায় ফিরিয়া যাই নাই। তবু খবরের কাগজে, অন্য লেখায় বা কথাবার্তায় বাঙালীর বর্তমান অবস্থার যে সংবাদ পাই তাহাতে মনে ঘোর নিরুৎসাহ আসে, অধীর হইয়া পড়ি। কিন্তু এই অবস্থায় যখন আমাদের সেই সাহিত্য পড়ি বা গান শুনি, ও পুরাতন জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করি তখন অনেক সময়েই অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। ইহাতে দুঃখ এবং সুখ দুইই থাকে। যদি এই ধরনের অনুভূতি পাঠকের মনে আনিয়া একটাও সান্ত্বনার স্থল দেখাইতে পারি তাহা হইলেও বইটা লেখা সার্থক মনে করিব।

আমি জানি এই ধরনের কথা কলিকাতার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাল লাগিবে না। ইহারা অত্যন্ত বেশী 'ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল'। কিন্তু এই মনোভাব বর্তমান যুগের ঊষর ইউরোপীয় 'ইন্টেলেক্‌চুয়্যালিজমে'র এতই ক্ষীণ ও শৌখীন অনুকরণ যে ইহাকে ঢং ছাড়া কিছু বলা কঠিন। ইহারা সারৎর্ (সাখ্‌ত) কপ্‌চান, কিন্তু জর্জ সাঁ র 'লা মার ও দিয়াব্‌লে'র মত বই-এর রসোপলব্ধি করিতে পারেন না।

সুতরাং ইহারা অতীতের প্রতি আমার এই প্রীতি দেখিয়া আমাকে স্বপ্ন-বিলাসী 'এস্কেপিস্ট' বলিয়া তুচ্ছ করিবেন সন্দেহ নাই। এই বাস্তববাদ ও বাস্তব-বাদী সম্প্রদায়ের খবর আমি রাখি। ইঁহারা কার্যকলাপে বিত্তবান জীবনযাপন করেন—মোটা বা দোহারা মাহিনা পান, ভাল বাড়ীতে থাকেন, ভাল গাড়ীতে চড়েন, ভাল খান, দুঃখ-কষ্টের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন না—মা বা ভাইবোনের দারিদ্র্যের সঙ্গেও নয়; আর কথাবার্তায় ইঁহারা ধারকরা পাকামো দেখাইয়া পাশ্চাত্ত্য বুকনী আওড়ান, এবং পাশ্চাত্ত্য 'ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল'-দের শুকবৃত্তি করেন। ইঁহারা আমাদের সেই প্রাণহীন, জড়তাপ্রাপ্ত পুরাতন নৈয়ায়িক বা স্মার্ত—নূতন চেহারায়।

আবার এই বাস্তববাদীরা সামান্য একটু অভাবের সম্ভাবনা দেখিলে, চাকুরি যাইবার আশঙ্কা হইলে কত কেঁউ কেঁউ করিয়া কত হাত কচ্‌লাইতে পারেন, তাহার খবরও আমি কিছু কিছু রাখি।

সুতরাং ইঁহারা যদি আমাকে 'রিয়্যালিজম্‌' বর্জিত 'এস্কেপিস্ট' বলেন, তাহা হইলে আমি ভীত বা সঙ্কুচিত হইব না। তাঁহাদের বাস্তবের সহিত আমার কোনও কারবার নাই। আসল বাস্তব যে কি তাহা আমি দিল্লীতে পঁচিশ বৎসর মোরি-দরজায় থাকিয়া মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি। ১৯৪৮ সন হইতে বৎসরের পর বৎসর বিষ্ঠার গন্ধ ক্রমাগত নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাওয়ার ফলে মরিতে বসিয়াছিলাম। বাস্তবের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই—অন্ততপক্ষে এদেশের বাস্তবের প্রতি। আমি

সুদূর ছায়াপথের দিকে তাকাইয়া মানস ছায়াপথেই বসিয়া থাকিব। এই প্রত্যক্ষ ও মানস ছায়াপথের আলোই জীবনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আজিকার বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সবচেয়ে বড় দোষ প্রাণহীনতা। রবীন্দ্রনাথ এই তোতাদের জন্য তোতাকাহিনী বৃথাই লিখিয়াছিলেন।

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, আমি গবেষণা বা তত্ত্বের বই লিখিতে বসি নাই। সামান্য তথ্যাদি হয়ত বইটাতে থাকিবে, কিন্তু এই তথ্য দিবার জন্য বইটা লিখিত হইবে না। আসল উদ্দেশ্য আধুনিক বাঙালীর প্রাণ স্পর্শ করা।

তাহা ছাড়া বইটার বিষয়বস্তুর কথাও মনে রাখিতে হইবে। বইটার প্রধান বিষয় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক চিররহস্যময়। প্রেম বা ভালবাসা বুঝাইবার বা বুঝিবার জিনিস নয়, উপলব্ধির জিনিস। জ্ঞানের দ্বারা উহার অর্থ কোনও দিন কেহই আবিষ্কার করিতে পারিবে না। সে চেষ্টা কেহ করিয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়, করিয়া থাকিলেও উহা যে সফল হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। কবি, ঔপন্যাসিক, এমন কি সমালোচকও এই রহস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া উহার চারিদিকে ঘুরিয়া স্তব করিয়া বেড়াইয়াছে, কেহ বা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মেহের আলির মত চীৎকার করিয়াছে, 'তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়।'

কাহাকেও তফাত যাইতে না বলিলেও আমিও হয়ত স্তবের বেশী অগ্রসর হইতে পারিব না। ইহাতে ক্ষোভ বা লজ্জা নাই, কারণ বইটার বিষয় যাহা, তাহাকে লইয়া এর বেশী কিছু করিবার শক্তি কাহারও নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাম ও প্রেম

নরনারীর সম্পর্কের যে নূতন ধারণা বাঙালী আধুনিক কালে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার বিবরণ দিবার আগে পূর্বযুগের ধারণার সহিত উহার প্রভেদের মূল সূত্রটা ধরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সূত্রটা দিব। কিন্তু ধরাইবার জন্য শুধু ব্যাখ্যা করিবার আগে দুই যুগ হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত দিলে প্রভেদটা পাঠকের মানসিক অনুভূতির মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ধারণাতেই আবদ্ধ থাকিবে না। যুক্তির সাহায্যে বোঝা অপেক্ষা অনুভূতির সাহায্যে বোঝা অনেক সহজ। স্ত্রীলোক দেখিলে পুরুষের মনে কি ভাব জাগে তাহার বহু বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে আছে। আমি প্রথমে পূর্বযুগের কাব্য হইতে একটি উক্তি দিতেছি :—

"গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী
চক্ষু মুখ পদ্মছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী ॥
ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে একজন
এই ক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী ॥"

কবির নাম বলিব না, তাহা হইলে পাঠক শুধু জনপ্রচলিত ধারণার বশে কবিতাটির প্রতি অবিচার করিবেন। আমি যুবাবয়সে আমাদের সময়কার প্রচলিত নৈতিক ও সাহিত্যিক সংস্কার কাটাইয়া এই কবির অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠি। আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা—তাও আবার ইংরেজী ভাষায়—ইহারই সম্বন্ধে। সে ১৯২৫ সনের কথা। তখন এই কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাই আমার পূর্বতন শিক্ষক ও সাহিত্যগুরু মোহিতলাল মজুমদারের কাছে আবৃত্তি করি। তিনি এটাকে একেবারে দুয়ো দিয়া, অতি ছোটলোকের উপযুক্ত বলিয়া মুখ ফিরাইয়া নেন। আমি অপ্রতিভ হইলাম বটে, কিন্তু মত বদলাইলাম না। এই যুগেও ইহাকে ভাল কবিতা বলিলে অনেকে মুখ সিঁটকাইবেন, যদিও আধুনিক বাংলা লেখায় অত্যন্ত নোংরা ব্যাপারও তাঁহাদের কাছে পীড়াদায়ক না হইতে পারে। আসল কথা কি, আমাদের শ্লীল-অশ্লীলের ধারণা সাময়িক ফ্যাশনে হয়, এর চেয়ে গভীর কোন অনুভূতির দ্বারা না। যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম উহা

আজিকার যুগধর্মের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু উহাতে নারী সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য, এমন কি সুন্দরও হইতে পারে। ইহার ছন্দ, ধ্বনি, ও ভাষার অনবদ্যতা অসাধারণ।

এখন আধুনিক যুগ হইতে এই বিষয়েরই আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

"বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥
দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানি না কি লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির পরে তার করুণা মাটি হল—
সে পদ মোর পথে চলিবে না॥
তব কণ্ঠ-'পরে হয়ে দিশাহারা
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতিধীরে ভ্রমরগীতিসম
দু কথা বল শুধু 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম' তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী উছলে নিরবধি,
নয়নে ভরি উঠে অমৃতমহোদধি—
এত সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি আমারি তৃষাটুকু পুরাবে না॥"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। উহার ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, প্রকাশরীতি সবই খাঁটি বাংলা—এইসবে বিদেশী বোঁটকা গন্ধ একটুও নাই, তবু উহার অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দুই রকমের দুইটা অনুভূতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য দুইটি শব্দ ব্যবহার করিব। বলা যাইতে পারে, প্রথম কবিতাটিতে যে মানসিক বৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে উহা 'কাম' ও দ্বিতীয়টিতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে উহা 'প্রেম'।

'কাম' কথাটা ব্যবহার করিলাম বলিয়া অনেকের অসন্তোষ হইবে তাহা জানি। ইঁহাদের সর্বত্র দেখিতে পাই—ইঁহারা নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন অথচ জ্যোতিষী ও পুরোহিতের পদলেহন করেন ; ভুল অর্থে 'যৌন' কথাটা ব্যবহার করিয়া ভাবেন খুব আধুনিক, পাশ্চাত্য, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী হইয়াছেন ; কামশাস্ত্র বা রতিশাস্ত্রকে 'যৌনবিজ্ঞান' নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক হইবার চেষ্টা করেন ; এমন কি 'যৌন' 'যৌন' করিয়া চেঁচাইয়া ভদ্রলোককে অপ্রতিভ করিয়া ভাবেন ফরাসী ভাষায় যে বাহাদুরিকে "epater les bourgeois" বলে

তাহার হদ্দমদ্দ করিলেন। ইহাদের মুখে 'কাম' কথাটা আসিবে না, ইহাদের কলমে উহা সরিবে না।

যখন বলিলামই তখন ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কারই করি। 'যৌন' কথা-টার সংস্কৃত অর্থ কি তাহা বলিয়া দেওয়া দরকার। উহার ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, রূঢ় বা প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছিল 'বৈবাহিক'; অর্থাৎ পাণ্ডব ও পাঞ্চালের সম্পর্ক যৌন-সম্বন্ধ। এই অর্থ ধরিয়া কেহ যদি শ্যালককে 'যৌন সম্বন্ধী' বলেন তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু আধুনিক অর্থে ইহা বলিলে কখনই যুবক-শ্যালকের প্রতি ভদ্রোচিত মনোভাব দেখানো হইবে না। স্ত্রীরও রাগিয়া যাইবারই কথা। সেকালে বাঙালী মেয়েরা ননদকে লইয়া একটা স্থূল রসিকতা করিত, কিন্তু ননদের স্থলে নিজের ভাইকে বসাইতে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইত না।

অবশ্য অতি আধুনিক প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ছাড়িয়া দিলেও অনেক ভদ্র হিন্দু আছেন যাঁহারা কাম কথাটা প্রয়োগ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইহার কারণ কথাটার অর্বাচীন প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনা। আসলে 'কাম' শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক জৈব আকর্ষণ মাত্র বুঝায়। কিন্তু আধুনিক কালে শব্দটার অধোগতি হইয়াছে। এখন 'কাম' কামের বিকৃত ও অসংযত রূপ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়। এই আশ্লেষ ছাড়াইয়া উঠাই ভাল। তাহা না হইলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক আলোচনা করিবার জন্য একটা অতিপ্রয়োজনীয় কথা হইতে বঞ্চিত হইব।

তবে এই সব প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা একটু অবহিত হইয়া করা দরকার, নহিলে উহা বেলেল্লাপনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কাম ঘৃণা বা লজ্জার বিষয় না হইলেও উহা লইয়া দেশকালপাত্র নির্বিশেষে কথা বলা যায় না। এমন কি আমি মনে করি, আসরে বা আড্ডায় উহার প্রকাশ্য আলোচনা সাধারণত না হওয়াই ভাল। যে-সুরে কামের আলোচনা হওয়া উচিত সে-সুর ভিড়ের মধ্যে বাজে না। এমন কি স্ত্রী-পুরুষের প্রেম প্রকাশের যে-সব দৈহিক ভঙ্গী আছে, তাহাও প্রকাশ্যে হাস্যরসাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এযুগে নরনারীর চুম্বন আলিঙ্গন পাশ্চাত্ত্যে প্রায় লোক ডাকিয়া তামাশা দেখাইবার মত হইয়াছে। বিলাতে, ফ্রান্সে ও অন্যত্র এইটা দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিসদৃশ লাগিয়াছিল।

কেম্ব্রিজে নদীর ধারে বেড়াইবার সময়ে একদিন দেখিলাম, ভিড়ের মধ্যে ঘাসের উপর বসিয়া একটি প্রৌঢ় একটি প্রৌঢ়াকে আদর করিয়া কান কামাড়াইতেছে। দুইটি সমান কুশ্রী, সমান মোটা ও সমান লাল। ডানদিকে অদূরে বিরাট কিংস কলেজ চ্যাপেল। সেখানে ধর্মসঙ্গীত শুনিয়া ও উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আমি যে হিন্দু, যদি কোথাও আমারও খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা জাগিতে

পারে, তবে সে এই গির্জায়। তাহারই ছায়ায় এই দৃশ্য। তখন বুঝিলাম সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি সাক্লিং কেন লিখিয়াছিলেন—

"Love is the fart
Of every heart ;
It pains a man when 'tis kept close ;
And others doth offend when 'tis let loose."

সে-যুগে ইংরেজের জীবন ছিল, শক্তি ছিল, স্পষ্টবাদিতার সাহস ছিল ; শালীনতাও ছিল, তবে উহা অশালীনকে যেমন কুকুর তেমন মুগুর দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

এই সব ব্যাপার স্বাভাবিক সঙ্কোচের ব্যাপার। এগুলির সম্পর্কে যাহা সর্বদাই মনে রাখা উচিত তাহা এই—দেহ এবং দৈহিক কার্যকলাপও শ্রদ্ধেয়, বাচালতা ও অশ্লীলতার দ্বারা এই শ্রদ্ধার হানি হয়, সত্য তো একেবারেই প্রকাশ করা যায় না।

তবে ছাপায় বলা ও সম্মুখে বলাতে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত অর্থে অশ্লীলতা না করিলে এবং জনপ্রচলিত অর্থে অসভ্যতা না করিলে মানব-জীবনের সব দিক লইয়াই আলোচনা করিবার অধিকার লেখকের আছে। এই কাজে লেখক একাকী, পাঠকও একাকী। বিষয় যাহাই হউক, মানসিক আদান-প্রদান যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হইতে পারে, শ্রদ্ধার আব্রু ঘুচে না।

ইহার উপরেও কথা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, যদি যথাযথভাবে আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আসরেও কামের প্রসঙ্গ সঙ্কোচের কারণ হয় না। আমি দিল্লীতে একদিন জনত্রিশেক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সম্মুখে কাম ও প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। ইহাদের মধ্যে, নাবালক না হইলেও, অনেকের বয়স কম ছিল। তবু এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ঢাকাঢাকি বা চোখ টিপিয়া ইশারা করিলে ব্যাপারটা অশোভন হইত, তাই প্রয়োজনমত স্পষ্ট কথা বলিতে ইতস্তত করি নাই। তবু সকলে, বিশেষত মেয়েরা যেভাবে আমার কথা শুনিয়াছিলেন তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার একটা ধারণা আছে যে, অশ্লীলতা পুরুষের স্বাভাবিক বাঁদরামি ; মেয়েদের এটা স্বভাবত আসে না, শিক্ষার দোষে হয়।

এই বই-এ অনেক স্পষ্ট কথা বলিতে হইবে, অথচ বাঙালী সমাজে এখনও এক ধরনের শুচিবায়ু উগ্রভাবে বর্তমান। তাই এই সাফাই আগেই গাহিয়া রাখিলাম। এখন প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক। কাম কি ?

কামকে তুচ্ছ করিব, এমন মূঢ়তা আমার এখনও হয় নাই, কারণ তাহা হইলে জীবনকেই তুচ্ছ করিতে হইবে। জীব যেদিন 'প্রোটোজোয়া' হইতে 'মেটাজোয়া'-তে

উন্নীত হইয়াছে সেইদিন হইতেই সে কাম, অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয় জীবের পরস্পরের প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণেরও দাস হইয়াছে। ইহা ছাড়া কামকে পাপ বলিয়া প্রচার করিয়া উহাকে হেয় বা ঘৃণ্য বলিব সে নিবুদ্ধিতাও আমি দেখাইব না। এই অস্বাভাবিক 'মর‍্যালিটি' আমার 'মর‍্যালিটি' নয়। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম হইতে আসে নাই, আসিয়াছিল খৃষ্টধর্মের সন্ন্যাস হইতে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর মতের উল্লেখ করিয়া বারট্রাণ্ড রাসেল একদিন আমার কাছে একটা কঠিন উক্তি করিয়াছিলেন: তিনি বলিয়াছিলেন—"his vile morality." কথাটা রূঢ় হইলেও উহার যাথার্থ্য আমি অস্বীকার করিতে পারি নাই।

মহাত্মা গান্ধীর মতের সহিত এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তাঁহার উপন্যাসের একটি পাত্রকে দিয়া লেখাইয়াছেন,—

> "যে-বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে রূপজ মোহ মাত্র। এ-বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্বজীবমুগ্ধকারী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি; বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে।"

ইহার চেয়ে একাধারে সত্য ও উদার উক্তি কল্পনা করা যায় না।

কাম সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, উহার উচ্চ-নীচ, ভদ্র-ইতর, শ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য, লোকোত্তর ও লৌকিক—নানা রূপ আছে। নিম্নস্তরের কামও আবার বিভিন্ন হইতে পারে—যেমন, সাধারণ লোকের কাম স্বাভাবিক কিন্তু একেবারে ছ্যাঁচড়া; কিন্তু কাহারও মধ্যে উহা অস্বাভাবিক ও জুগুপ্সাজনক হয়। এই জাতিভেদ বুঝাইবার জন্য যে আলোচনার কথা বলিয়াছি উহাতে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। তাহার উল্লেখ করিব, যাহাতে পাঠক ব্যাপারটার খানিকটা আঁচ করিতে পারেন।

আমি ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা ধেনো মদ খাইয়াছেন কিনা। সকলেই হাসিলেন। তাহাতে বুঝিলাম অন্ততঃ জিনিসটা কি ইহাদের জানা আছে। তার পর একটি স্ফটিকের পাত্রে একটু ভি-এস্-ও-পি গ্রাদ-ফিন্-শঁপাঞ কনিয়াক ঢালিয়া একজনকে দিয়া বলিলাম—এটুকু খাইয়া আপনি আমাকে বলুন লোকে যাহাকে 'মদ' বলে এই জিনিসটা সেই বস্তু কিনা। অবশ্য অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধা হইবার নয়। ধেনোমদে ও উচ্চশ্রেণীর কনিয়াকে

যে তফাত ছোটলোকের কামে ও ভদ্রলোকের কামে ঠিক সেই তফাত।

কিন্তু উচ্চস্তরের কামের ধারণা কেহই আধুনিক, বিশেষত বর্তমান যুগের ইউ-রোপীয় সাহিত্য পড়িয়া করিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডি-এচ্-লরেন্সের "লেডী চ্যাটারলীজ লাভার"-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহা অতি ছোট-লোকের ব্যাপার। আমাদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা নিজেদেরকে অত্যন্ত ফ্যাশনেব্‌ল মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটি জাতগোলাম আছেন যাঁহাদের কাছে পাশ্চাত্ত্যের আঁস্তাকুড়ও ফুলের বাগান। আমি চল্লিশ বৎসর পূর্বে আরেতিনো হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাসানোভা, ফ্যানি হিল অবধি পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং পাঠককে এই কথাটা বিশ্বাস করিতে বলিব যে, ইউরোপীয় আদিরসাত্মক লেখা মোটের উপর 'পর্ণোগ্রাফী' মাত্র, ডি-এচ্-লরেন্সের উপন্যাসটিও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে আর কিছু বলা এখানে সম্ভব নয়। যাঁহারা আমার এই মত প্রকাশে একেবারে ক্ষিপ্ত না হইয়া আরও কিছু জানিতে চান তাঁহাদিগকে আমার নূতন বই "দি কন্টিনেণ্ট অফ্ সার্সি"-তে আমি ডি-এচ্-লরেন্স সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা পড়িতে অনুরোধ করিব। আমার মন্তব্য এই বই-এর ২০২ পৃষ্ঠায় পাইবেন।

ইউরোপের বেশীর ভাগ আদিরসাত্মক লেখাই কেন 'পর্ণোগ্রাফি' তাহার উপ-যুক্ত কারণ আছে। ইউরোপীয়েরা রোমান্টিক প্রেমের অনুভূতি পায় মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে। তাহার পর কামের যতটুকু প্রেমের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে সেইটুকুকে বাদ দিয়া, কামের বাকীটুকুকে সংস্কৃত করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের রহিল না, উহা নানারকমের স্থূল রসিকতা, এমন কি অসভ্যতাতেও পরিণত হইল। সুতরাং কাম হইয়া গেল নীতির দিক হইতে বর্জনীয় অথচ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির দিক হইতে অপরিহার্য। ইহাতে ইউরোপে নরনারীর সম্পর্কের এক দিকে একটা পোশাকী রূপ আর এক দিকে একটা ইতর রূপ, এক দিকে একটা সাজানো সদর ও আর এক দিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা আবর্জনাবহুল অন্দর দেখা দিল। ইহার ফলে রোমান্টিক প্রেমের মূলেও যে কাম আছে, তাহার উপ-লব্ধি হইল না, এবং নির্জলা কামও যে সুন্দর ও গৌরবের বস্তু হইতে পারে সে ধারণাও রহিল না। দুইটা তেল-জলের মত ভাগ হইয়া বিভিন্ন স্তরে রহিল।

এই বিভাগের একটা দৃষ্টান্ত দিব। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী সমাজ যেরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা দ্য ব্রাঁতোমের কাহিনীতে আছে। ইহা অতিশয় অশ্লীল পুস্তক। ইহাতে ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরি ও ডায়ানা অফ পোয়াতিয়ের্স হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অভিজাত স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে যে-সব গল্প আছে তাহার কদর্যতার

কোন আভাস দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাহার প্রায় একশত বৎসর পরেই এই সমাজ এবং সমাজের ঘটনা লইয়া মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উহার নাম "প্রিন্সেস্ অফ্ ক্লেভস্" (ইংরেজী নাম দিতেছি, ইংরেজী অনুবাদ আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই); উহা ফরাসী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সমস্ত বইএ একটি অভব্য কথা বা ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই—ইহার পবিত্রতা ও সৌরভ একসাজি যুঁই ফুলের মত।

একদিন এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ মহিলার কথা হইতেছিল। তিনি ইডিথ সিট্ওয়েল ও স্যর অসবার্ট সিট্ওয়েলের ভ্রাতা স্যাশেভেরেল সিট্ওয়েলের পত্নী। তৃতীয় সিট্ওয়েলও স্বনামখ্যাত লেখক। মিসেস সিট্ওয়েল 'প্রিন্সেস অফ্ ক্লেভ্সে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর আমি বলিলাম—মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ সে-সমাজের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম, কারণ উহার ঐতিহাসিক বর্ণনা আমার কাছে দ্য ব্রাঁতোমের মত মনে হইয়াছিল। আমি অবশ্য সেই সমাজের আচারব্যবহার ও মানসিক ধর্মের কথা সাধারণভাবে স্মরণ করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলাম, কোনও বিশেষ ঘটনা—কদর্য বা কলুষিত—তাহার কথা মনে করি নাই। কিন্তু মিসেস সিট্ওয়েল দ্য ব্রাঁতোমের উল্লেখে যেন শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি আমাকে বলিলেন, "I don't care for de Brantome." বুঝিলাম, দ্য ব্রাঁতোমের ইতর কাম, মাদাম দ্য লাফাইয়েতের প্রেম আলাদা হইয়া গিয়াছে।

বাঙালীর মনের উপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব পড়িবার আগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যেসব ধারণা ও দেশাচার প্রচলিত ছিল সেসব প্রাচীন হিন্দু ধারা ও আচরণেরই সহজ অর্থাৎ গ্রাম্য বা বিকৃত রূপ। সুতরাং প্রথাগত ধারার বৃত্তান্ত দিতে হইলে আরম্ভ করিতে হইবে প্রাচীন ভারতীয় রূপের পরিচয় দিয়া।

গোড়াতেই বলিতে হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষে নরনারীর বিশিষ্ট সম্পর্কের কাম ব্যতীত অন্য রূপ আবিষ্কারই হয় নাই। ইহার প্রমাণ হিসাবে কামসূত্রের উল্লেখ করিতে পারিতাম, এবং করা যুগধর্মসঙ্গত হইত। পাশ্চাত্য জগতে এখন কামসূত্রের বিশেষ ইজ্জৎ। সেই সমাজে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন বা কৌতূহলী তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে, কামসূত্রে হিন্দুদের মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের সত্য ও বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই ধারণা ভাঙাইয়া এ দেশের অনেকে বর্তমানে পয়সা করিবার ফন্দী আঁটিয়াছেন। অন্তত ইহা সত্য যে, কামসূত্র এবং গাঁজার আকর্ষণে অনেক পাশ্চাত্ত্য নরনারী এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে লোমশ বানর জাতীয় পাশ্চাত্য তীর্থযাত্রীগুলির মূর্তি সহজেই চেনা যায়।

পাশ্চাত্ত্যে কামসূত্রের এত প্রতিপত্তি হওয়া সত্ত্বেও উহাকে আমার বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিব না। আমার বিশ্বাস এ নয় যে, ইহাতে প্রাচীন হিন্দু সমাজে নরনারীর সম্পর্কের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়। খুব ভাল হইলেও উহা নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের, এবং এই দৈহিক সম্পর্কের জন্য যতটুকু মানসিক গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় তাহার ব্যাকরণ মাত্র। ভাষার ব্যাকরণে যেমন ভাষার প্রাণ পাওয়া যায় না, এই ব্যাকরণেও তেমনই নরনারীর সম্পর্কের জীবন্ত রূপ পাওয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া কামসূত্রে খানিকটা পুঁথিগত লোচ্চামি ছিল তাহাও অসম্ভব নয়।

সুতরাং নরনারীর সম্পর্কের প্রকৃত প্রাচীন হিন্দু রূপ দেখিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। আমার মতে বেদ ও মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সংস্কৃত কাব্যে উহার আসল পরিচয় মিলিবে। সুতরাং আমাদের এই সব বইকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সাহিত্যের সর্বত্র কামকেই নরনারীর সম্পর্কের অবলম্বন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্র কামের একটিমাত্র রূপই দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহাভারতে কামের যে রূপ আছে, উহা কালিদাসের কাব্যের রূপ নয়, আবার কালিদাসে যে রূপ আছে উহা 'দশকুমারচরিতে'র রূপ নয়। মহাভারতের কাম স্বাভাবিক, উহাতে শক্তি আছে কিন্তু লজ্জা নাই, সারল্য আছে কিন্তু বৈদগ্ধ্য নাই—উহার ধর্ম অনেকাংশে আদিম।

পরবর্তী যুগের কাব্যে কামের দুইটা রূপ দেখা যায়—উহাদের একটাকে 'রোমান্টিক' রূপ বলা যাইতে পারে, আর একটাকে বলিব বৈশিক রূপ। 'দশকুমারচরিতে' কামের যে রূপ দেখি, উহা বৈশিক রূপ, কিন্তু 'মেঘদূত' বা 'কাদম্বরী'তে যাহা পাই তাহার রূপ রোমান্টিক। যখন একটা ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করিলাম, তখন পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য আরও দুইটা ইংরেজী কথা ব্যবহার করিব। বলিব মানুষের মন এমনই যে কাম তাহার জীবনের একটা বড় উপজীব্য হইলেও সে শুধু একদিকে 'প্রিমিটিভ' কাম ও অন্যদিকে 'সিনিক্যাল' কাম লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না—তৃপ্তির জন্য কামের অন্য একটা রূপ চায় যাহাতে প্রাণরস ও মাধুর্য থাকে। সেজন্যই প্রাচীন ভারতবর্ষে কামেরই একটা রোমান্টিক রূপ দেখা দিয়াছিল। ইহাতে কাম একটা নূতন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উহাতেও একটা গৌরব আসিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই অনুভূতির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আমার নূতন

ইংরেজী বই-এ এই ব্যাপারটার আলোচনা করিয়াছি। কামের অন্য রূপের কথা সকলেরই জানা, কিন্তু এই রোমান্টিক রূপটা একেবারে অজানা না হইলেও সম্পূর্ণ ভাবে অনুভূত ও উপলব্ধ নয়। তাই শুধু ইহারই দুই-একটা উদাহরণ দিব।

প্রথমটি এই—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

শ্লোকটির অনুবাদ না দিতে হইলেই সুখী হইতাম। কিন্তু আমার মনে হয় অনুবাদ না দিলে আজিকার দিনের বহু বাঙালী পাঠক উহার মাধুর্য ও অনবদ্যতা বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এখানেও আর এক বিপদ। আমি সংস্কৃতের বহু বাংলা অনুবাদ পড়িয়া এবং কিছু করিবার চেষ্টা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, সংস্কৃত কবিতার উপযুক্ত অনুবাদ বাংলায় করা সম্ভব নয়, ইহার চেয়ে অনেক সহজে ইংরাজীতে হয়। ইহার কারণ এখানে দেখাইতে পারিব না, শুধু পাঠককে আমার কথাটা মানিয়া লইতে অনুরোধ করিব। তাই আমার কৃত ইংরেজী অনুবাদ, যাহা আমার ইংরেজী বইএ প্রকাশিত হইয়াছে উহাই দিতেছি। আমি ইংরেজীতে সংস্কৃত ছন্দ (শার্দূলবিক্রীড়িত অথবা অতিধৃতি) রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

Stole he my maidenhead, and today's husband he !
Just the same are nights of spring ;
Blossoming malati, cadamba's pollen blown
Scent the selfsame heavy breeze ;
I, too, the same, same she !—Still by Reva narrows,
'Neath a tree in tangled cane,
Ah ! on that very spot, for coitus-fantasies
Wistful, wistful grows heart !

একবার তরুণীর মূর্তিটি মনে করুন। মণিজাল-গবাক্ষে বসিয়া বিন্ধ্যপর্বতের নীলিমা, বিন্ধ্যবনভূমির শ্যামলতা, শিপ্রা বা বেত্রবতীর ধূসর-ধবল ফেনিল স্রোতের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া, কেতকী ও মধুকের সৌরভে আবিষ্ট হইয়া দয়িতের কাছে বিবাহের পূর্বে কৌমার্য হারাইবার সুখস্মৃতি স্বপ্নে ফিরাইয়া আনিতেছে।

সুরাজাতীয় পদার্থের সঙ্গে আবার তুলনা করিয়া বলিব, এই কাম কুয়াসাও বা কোয়াঁত্রোর মত।

দ্বিতীয় কবিতাটি এই—

স্বামিন্! ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং, বিলাসিন্! কুরু
প্রাণেশ! ত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়।
ইত্যুক্ত্বা সুরতাবসানসময়ে সম্পূর্ণচন্দ্রাননা
স্পৃষ্টা তেন তথৈব জাতপুলকা প্রাপ্তা পুনর্মোহনম্॥

ইহারও যে ইংরেজী অনুবাদ-আমি করিয়াছি তাহা দিতেছি,—

Husband mine ! tie this loosen'd hair ;
Its vermeil, to the brow, my dalliance ! give ;
And this chaplet broken, sweetheart !
String anew, to place aslant the swell of breasts,—
The fair one, ev'n as moonlight fair,
Said this, in her coitus ebbing to a close ;
And by him touched—there, there, and there,
Tingling, trembling, in a swoon she sank again.

ইহাকে কামের চেরী-ব্র্যাণ্ডি বলা যাইতে পারে।

আর একটি কবিতা এইরূপ (ইহা বসন্ততিলক ছন্দে)—

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিশ্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ! শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥

আমার অনুবাদ,—

Blessed you ! who can prattle so,
when with your love you lie ;
A hundred pretty-things, coolly,
even in coitus croon !
To this girdle, should my dearest
no more than stretch a hand,
O friends ! swear I, to you swear I,
if I remember aught.

ইহা বলিব আদিরসের ক্রেম্ ছ মঁাথ।

এইখানে সংস্কৃত সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্কের যে আদিরসাত্মক চিত্র আছে, তাহার একটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করিব। উহা দ্বারা আমার বক্তব্যেরও সহায়তা হইবে, কারণ কাম ও প্রেমের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা শুধু এই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। উহা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' হইতে।

সেদিন পর্যন্তও 'উত্তররামচরিত' সম্বন্ধে আমার একটু অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল। এমন কি আমি আমার নূতন বইএও লিখিয়াছি—

"But even early Aryan society, despite its robust naturalism, knew that something besides unthinking enjoyment had to be brought into sexual life. So early Brahmanism made procreation its supreme motive. To this it added a beautifully effervescent affection, deep and sparking at the same time. This picture of conjugal devotion is presented again and again in Sanskrit literature, and its locus classicus is, of course, Uttara Ramacharita of Bhavabhuti.'

(The Continent of Circe, p. 193)

কিন্তু আজ বলিব, ভবভূতি রামসীতার যে-সম্পর্ক দেখাইয়াছেন তাহাতে যে শুধু প্রগাঢ় স্নেহই আছে তাহা নয়, উহার উপর অতি উচ্ছলিত প্রেমও আছে। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে শুধু একটিমাত্র দিব। রাম সীতাকে নির্বাসন দিবার পর শূদ্রকবধ উপলক্ষ্যে আবার পঞ্চবটি বনে আসিয়া সীতার কথা স্মরণ করিয়া 'হা প্রিয়ে জানকি!' এই কথা বলাতে অভিমানিনী সীতা 'সমন্যু-গদ্‌গদ'-স্বরে বলিলেন—"আর্যপুত্র, অসদৃশং খল্বেতদ্বচনমস্য বৃত্তান্তস্য।" "তুমি এই যে কথা বলিলে উহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত অসমঞ্জস!"—অর্থাৎ আমাকে নিরপরাধে ত্যাগ করিয়া 'প্রিয়া' বলা শোভা পায় না।

কিন্তু তখনই অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রেমের আবেগে চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন,—

"অথ বা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরেষ্বপি পুনরসম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মামেব মন্দভাগিনীমুদ্দিশ্য বৎসলস্যৈবংবাদিন আর্য্যপুত্রস্যোপরি নিরনুক্রোশা ভবিষ্যামি। অহমেতস্য হৃদয়ং জানামি মমাপ্যেষঃ।"

"না, না, যাহার দর্শন জন্মান্তরেও অসম্ভব বা দুর্লভ বলিয়া মনে করি সেই আর্যপুত্র যখন মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই ভাবে ভালবাসার কথা বলিতেছেন, তখন আমি কি করিয়া বজ্রময়ী হইয়া তাঁহার প্রতি নির্দয় হইব? আমি ত তাঁহার হৃদয় জানি, আর তিনিও আমার হৃদয় জানেন।"

ইহা কামের কথা নয়, শুধু স্নেহের কথাও নয়,—সম্পূর্ণরূপে প্রেমের কথা, একাধারে সাধ্বী ও প্রণয়িনীর উক্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে এক ভবভূতি ছাড়া আর কাহারও মধ্যে এই ভাব আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই, অন্তত আমি পড়ি নাই। এই নূতন সুর শুনাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সে-যুগের গতানুগতিক সমালোচকেরা ভবভূতিকে নিন্দা করিয়া অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক ভবভূতি নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের লৌকিক 'থিসিসে'-র 'অ্যান্টি-থিসিস্' উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

আশা করি এই প্রসঙ্গে আমার যাহা প্রতিপাদ্য তাহা স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি।—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে নরনারীর সম্পর্কের ধারণা কামের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং সে কাম মোটেই নীচ বা নিন্দনীয় ব্যাপার নয়, এই দুইটা কথা পাঠক বুঝিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙালী সমাজে এই সম্পর্কের যে ধারণা ছিল উহা প্রাচীন হিন্দুধারারই অনুবর্তন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ সমস্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্য জুড়িয়া রহিয়াছে। এখানে একটা তর্ক উঠিবেই—বৈষ্ণব কবিতার মানস ধর্ম কি? উহা কি আদি-রসাত্মক লৌকিক কাব্য, না কাব্যচ্ছলে হিন্দু ধর্মসাধনার ভক্তিমার্গের রূপক?

বাংলা বৈষ্ণব কবিতা যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র সন্তান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'গীতগোবিন্দ' যে আদিতে লৌকিক আদিরসাত্মক কবিতা ছিল, সে বিষয়েও আমার মনে সন্দেহ নাই। 'গীতগোবিন্দের' প্রাচীন টীকাকারেরা উহার ব্যাখ্যা অন্যভাবে করেন নাই; স্থানবিশেষে কোনও কোনও পদের অর্থ 'কামসূত্রে'র সহায়তায়ও করা হইয়াছে। অবশ্য চৈতন্যের সময় হইতে যে উহাকে 'ভক্তি'-র গ্রন্থ হিসাবে দেখা আরম্ভ হইল তাহা আমি জানি। গোস্বামীরা 'যঃ কৌমারহরঃ' ইহারও ভক্তিতত্ত্বঘটিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে জয়দেবকে 'ভক্তির সাগর' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। আমরাও অল্প বয়সেও দেখিয়াছি—ভদ্রঘরের যুবতী খোল-করতাল-হারমোনিয়াম সহযোগে 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' গাহিতেছেন, আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া গড়াইতেছেন। ইহা সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবের জন্য ঘটিত, না চোরা লচ্চামির জন্য ঘটিত, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই ভক্তি দেখিয়া আমি বিচলিত হই নাই। সুতরাং জয়দেবের 'গীত-

গোবিন্দ'-কে শৃঙ্গার রসের লৌকিক কবিতা ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই স্বীকার করি নাই।

ইহার পর মৈথিল ও বাংলাতে লেখা বৈষ্ণব কাব্যের কথা। চণ্ডীদাসে আরোপিত 'কামগন্ধ নাহি তায়' এই কথা কয়টির উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব কাব্যকে অনেকে আদিরসের কবিতা না বলিয়া আধুনিক অর্থে প্রেমের কবিতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই কয়টা কথা বাদ দিলে সমগ্র বৈষ্ণব কবিতাকে যে কামাত্মক বলিয়া মনে হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া যে চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' লিখিয়াছেন, তাঁহার কবিতা যে অত্যন্ত গ্রাম্য কামানুভূতির প্রকাশ তাহাতে কোনও মতভেদ হইতে পারে না।

বাকী বাংলা কাব্যে নরনারীর সম্পর্কের যে বর্ণনা আছে তাহা সম্পূর্ণ কামাবলম্বী। দৈহিক মিলনের বর্ণনাই উহার প্রধান উপজীব্য। তাহাও একেবারে খোলাখুলি। তবে ইহাতেও স্থূলতা এবং সূক্ষ্মতা আছে। ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বর্ণনাতেও মোটের উপর বৈদগ্ধ্য আছে, অন্যত্র তাহা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, 'বিদ্যাসুন্দর' জয়দেবের ভেঙ্গান, ইহা আমি মনে করি না। জয়দেব অপেক্ষা ভারতচন্দ্র রসবোধের দিক হইতে কম মার্জিত ছিলেন না। তবে তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে লৌকিক ব্যবহার হইয়াছিল সেটা ভারতচন্দ্রের দোষ নয়। এ বিষয়ে পরে কিছু বলা হইবে। এইখানে এই কথা বলিয়া শেষ করিব যে, বাংলা কাব্যে নরনারীর সম্পর্কের যে চিত্র পাই তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে উহার যে রূপ দেখানো হইয়াছে তাহারই কম বা বেশী ইতরীকৃত (সংস্কৃত অর্থে) রূপ। ইহাতে আদিরস অনেক স্থলে স্থূল হইলেও আদিরসই ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এ ব্যাপারে মনোভাব বদলাইতে আরম্ভ হইল। তবু একথা বলা প্রয়োজন যে, প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেই নূতন মনোভাবের প্রকাশ সাহিত্যে দেখা যায় নাই। তখন পর্যন্ত যেসব বাঙালী কবি নরনারীর সম্পর্ক লইয়া বা শুধু নারী সম্বন্ধে যাহা লিখিতেন তাহা প্রাচীন ধারারই অনুযায়ী হইত। তবে ভদ্র কবিতায় কামের প্রকাশ সাক্ষাৎভাবে না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে হইত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িলে উহা স্পষ্ট দেখা যাইবে—তিনি অবশ্য এ বিষয়ে বদ রসিকতাও করিতে পটু ছিলেন। অভদ্র লেখায় যাহা বলা হইত তাহা অতি নিম্নস্তরের কামের পরিচায়ক হইত, উহার উদ্দেশ্যই ছিল রিরংসার উদ্দীপনা।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে অকস্মাৎ একটা ভাববিপ্লব দেখা দিল। ইহার জোয়ারে বাঙালী জীবনে প্রেম—অর্থাৎ রোমান্টিক প্রেম—দেখা দিল।

ইহার প্রবর্তনকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রতিভার শক্তিতে একটি দিনের মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তিগত জীবনে একটা উন্মাদনা আসিয়া গেল।

১৮৬৫ সনে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ হইতে উহার সূত্রপাত, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উহার নূতন জোয়ার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নরনারীর সম্পর্কের নূতন ধারণা ও কল্পনা কোন্ স্তরে উঠিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাস হইতে দিব। এই গল্পটির শেষ সংস্করণকে তাঁহার শেষ লেখা বলা যাইতে পারে। সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত মনের কল্পনা হিসাবেই আমি উহা উদ্ধৃত করিব।

প্রেমের এই বর্ণনাটি সম্বন্ধে আর একটা কথাও বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র উহা যে নায়িকার মুখে দিয়াছেন, সে আপাতদৃষ্টিতে পাচিকা, ধনী ব্যক্তির উপপত্নী হইতে স্বীকার করিয়াছে। বাঙালী সমাজে বা হিন্দু সমাজে পরিচারিকা-প্রীতিই ছিল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার ঘৃণ্যতম রূপ। কর্তাদের উৎপাতে কোন সচ্চরিত্রা নিম্নজাতীয়া বা দুরবস্থাপন্না ভদ্র স্ত্রীলোকের নিরাপদে থাকিবার উপায় ছিল না। 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি নিষ্ঠুর কাহিনী লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে দেখাইলেন এই স্তরেও নরনারীর সম্পর্ক কোথায় উঠিতে পারে। হয়ত বা প্রেমের মহিমা দেখাইবার জন্য উহা ইচ্ছা করিয়া করিয়াছিলেন।

এইভাবে উপপত্নী হইতে স্বীকার করিয়াও নায়িকা উপপতিকে আট দিন তাহার কাছে না আসিতে বলিল, যাহাতে তাহার প্রণয় স্থায়ী কিনা পরীক্ষা করিতে পারে। কিন্তু নায়িকা অবশেষে বলিল, "অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম।"

কিন্তু এই আট দিন ধরিয়া নায়কের মনের ভাব ও নিজের মনের ভাব নায়িকা যাহা দেখিল, তাহার বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ,—

"আমি আপনার হাসি-চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া, পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম···

"তার পর এই আগুনের ছড়াছড়ি! আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্টা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাঁহার প্রফুল্লরক্তপুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া,

পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।"

এই নবাবির্ভূত প্রেমের আর একটি দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই দিব :—

"এই প্রথম, দুইজনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা, নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্তে মুহূর্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব—কখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?"

বোধ করি নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে কাম কি এবং প্রেম কি তাহা অনুভব করিতে পাঠকের আর কোনও অসুবিধা হইবে না।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলা সাহিত্যে একটি কবিতা আছে যাহার সাহায্যে এই তুলনাটা একেবারে সাক্ষাৎ ভাবে করাইতে পারা যায়। কামিনী সেন (পরবর্তী জীবনে কামিনী রায়) ছাত্রী অবস্থায় 'কাদম্বরী' পড়িয়াছিলেন। ইহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি 'আলো ও ছায়া'-তে 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' এই দুইটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন। প্রথম কবিতাটি তিনি ১৮৮৬ সনের ২৯শে জুন তারিখে, যে সমপাঠীর সহিত কাদম্বরী পড়িয়াছিলেন তাহাকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের ছোট কবিতাটি নিম্নলিখিত রূপ :—

"সাহিত্যের সুন্দর কাননে,
এক সাথে দোঁহে,
গন্ধর্ববালিকা নেহারিয়া
মুগ্ধ তার মোহে।
"তুমি আমি দূরে দূরে আজ,
সতীর্থ আমার,
একসাথে সে কাননে মোরা
পশিব না আর।

"একলাটি বসে থাকি যবে
আধেক নিদ্রায়,
অচ্ছোদের তরুণ তাপসী
দেখা দিয়া যায়।
"হেরি তার সজল নয়ান,
শুনি মৃদু কথা,
বুঝি তার প্রণয় গভীর,
নিদারুণ ব্যথা।"
"শুনিয়াছ যে গীতলহরী
আর একবার
শুনিবে কি,—লাগিবে কি ভাল
ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি তার ?"

ইহার পিছনে যে একটা প্রত্যাখ্যাত প্রেমের করুণ কাহিনী আছে তাহা যাঁহারা সে-যুগের বাংলা সাহিত্যের নেপথ্যের খবর রাখেন তাঁহারা সকলেই জানেন।

'মহাশ্বেতা' কবিতাটিতে পুণ্ডরীককে দেখিবার পর মহাশ্বেতার মনের ভাবের যে বর্ণনা আছে তাহা 'কাদম্বরী' হইতে গৃহীত। 'কাদম্বরী'তেও মহাশ্বেতা নিজেই নিজের অনুরাগের কাহিনী বলিতেছেন। মূল সংস্কৃত ও কামিনী সেনের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দুই-এর মধ্যে সুরের কি পার্থক্য হইয়াছে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ঘটনা এক, অবস্থাও এক, কিন্তু মনোভাবের ধর্মের তারতম্য যে আছে, তাহা ধরিতে পাঠকের কোনও অসুবিধা হইবে না।

প্রথমে সংস্কৃত বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। (এখানে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি। আমি মূল 'কাদম্বরী'র বিবরণ হইতে কিছু কিছু বাদ দিব। সংস্কৃত গদ্য হিন্দু মন্দিরের মত ; ইহাতে কারুকার্যবাহুল্য থাকে ; সংক্ষেপে সারা দূরে থাকুক সংস্কৃত কাব্যকারেরা বক্তব্য যথোপযুক্তভাবে বলিয়াও ক্ষান্ত হন না, অনেক ফাউ দিতে যান। কিন্তু ইহার ফল উল্টা হয়, বর্তমান যুগের পাঠকের মন এত প্রাচুর্য সহ্য করিতে পারে না, এবং তাহার চাপে মূল বক্তব্য ও মূল রস ধরিতে পারে না। আমি এই অসুবিধাটুকু এড়াইতে চাই। তবে যে-সব কথা উদ্ধৃত করিব তাহা একেবারে মূলানুযায়ী হইবে, পরম্পরারও কোন ব্যতিক্রম হইবে না।) পুণ্ডরীককে দেখিয়া নিজের মনে কি ভাব হইল, মহাশ্বেতা তাহা বলিতেছেন :—

"উচ্ছ্বসিতৈঃ সহ বিস্মৃতনিমেষেণ, কিঞ্চিদামুকুলিতপক্ষ্মণা দক্ষিণেণ চক্ষুষা সস্পৃহমাপিবন্তীব, কিমপি যাচমানেব, ত্বদায়ত্তাস্মি ইতি বদন্তীব, অভিমুখং হৃদয়মর্প-

য়ন্তীব, তন্ময়তামিব গন্তুমীহমানা, মনোভবাভিভূতাং ত্রায়স্ব ইতি শরণমিবো-পযান্তী, দেহি মে হৃদয়েবকাশম্ ইত্যাহর্থিতামিব দর্শয়ন্তী, স্তম্ভিতেব, লিখিতেব, উৎকীর্ণেব, সংযতেব, মূর্চ্ছিতেব, কেনাপি বিধৃতেব নিষ্পন্দসকলাবয়বা, কিং তদ্রূপসম্পদা, কিং মনসা, কিং মনসিজেন, কিমভিনবযৌবনেন, কিমনুরাগেণ বা উপদিশ্যমানা অহমপি ন জানামি কথং কথমিতি তমতিচিরং ব্যলোকয়ম।"

(অনুবাদ। দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিস্মৃতনিমেষ হইয়া পক্ষ্মগুলি অল্প মুকুলিত করিয়া, দক্ষিণ চক্ষু দিয়া যেন তাঁহাকে সস্পৃহভাবে পান করিতে করিতে, কি যেন যাচ্ঞা করিতে করিতে, আমি তোমারই হইয়াছি এই কথা যেন বলিতে বলিতে, যেন তাঁহার অভিমুখে হৃদয় অর্পণ করিতে করিতে, যেন তাঁহাতেই তন্ময়তা পাইয়াছি এই চেষ্টা করিতে করিতে, মনোভাবের দ্বারা অভিভূতাকে ত্রাণ কর ইহা বলিয়া যেন শরণ ভিক্ষা করিতে করিতে, হৃদয়ে আমাকে স্থান দাও যেন এই ভাব দেখাইতে দেখাইতে, স্তম্ভিতের ন্যায়, চিত্রলিখিতের ন্যায়, প্রস্তরে উৎকীর্ণের ন্যায়, আবদ্ধের ন্যায়, মূর্ছিতের ন্যায়, কাহারও দ্বারা ধৃতের ন্যায়, সকল অঙ্গে নিষ্পন্দ হইয়া, জানি না কিসের দ্বারা চালিত হইয়া—তাঁহার রূপসম্পদের দ্বারা, আমার মনের দ্বারা, মনসিজের দ্বারা, অভিনব যৌবনের দ্বারা, না অনুরাগের দ্বারা ?—তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম।)

বর্তমান যুগের পাঠক-পাঠিকা এই উক্তিতে বাগ্‌বাহুল্যের অভাব আছে মনে করিবেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যকারের দৃষ্টিতে ইহা সংযত উক্তি। আহা! আজিকার বাঙালী মেয়েরা যদি এইভাবে অভিভূত হইয়া এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় কোমরে আঁচল আঁটা, কাঁধ হইতে ব্যাগ ঝোলানো এত শুষ্কমুখী অনূঢ়া যুবতী দেখা যাইত না।

কিন্তু মহাশ্বেতাও বুঝিয়াছিলেন এত অভিভূত হইয়া পড়া শোভন হয় নাই ; কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলিলেন, "হাহা, কিমিদমসাম্প্রতমতিত্রপণমকুল-কুমারীজনোচিতমিদং ময়া প্রস্তুতম্।" (হায়, হায়! আমি একি অনুচিত ও লজ্জা-জনক কুলকুমারীর অনুপযুক্ত ব্যবহার করিতেছি!) তবুও এই মানসিক আবেগের জন্য তাঁহার শারীরিক কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলিতেও সঙ্কোচ করিলেন না। উহা এইরূপ :—

"উৎক্ষিপ্য নীয়মানেব তৎসমীপমিন্দ্রিয়ৈঃ, পুরস্তাদাকৃষ্যমানেব হৃদয়েন, পৃষ্ঠতঃ প্রের্য্যমানেব পুষ্পধন্বনা, কথমপি মুক্তপ্রযত্নমপ্যাত্মানম অধারয়ম। অনন্তরঞ্চ

মেহন্তর্মদনেন অবকাশমিব দাতুমাহিতসন্তানা নিরীয়ুঃ শ্বাসমরুতঃ। সাভিলাষং হৃদয়মাখ্যাতুকামিব স্ফুরিতমুখমভূৎ কুচযুগলম্ স্বেদলবলেখাক্ষালিতেবা-গলল্লজ্জা মকরধ্বজনিশিতশর নিকরনিপাতত্রস্তোবাকম্পত গাত্রযষ্টিঃ। তদ্রূপাতিশয়ং দ্রষ্টুমিব কুতুহলাদালিঙ্গনলালসেভ্যোঽঙ্গেভ্যো নিরগাদ্রোমাঞ্চ জালকম্। অশেষতঃ স্বেদাম্ভসা ধৌতশ্চরণযুগলাদিব হৃদয়মবিশদ্রাগঃ।"

(অনুবাদ। ইন্দ্রিয়েরা যেন আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল, হৃদয় যেন আমাকে সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, পিছন দিক হইতে পুষ্পধনু যেন ঠেলা দিতেছিল, তবু কোনও প্রকারে উহা রোধ করিয়া নিজেকে স্থির রাখিলাম। তারপর আমার হৃদয়ে স্থান করিয়া দিবার জন্যই যেন আমার নিঃশ্বাসবায়ু আমার অন্তরস্থ মদনের দ্বারা বিস্তৃত হইয়া বাহির হইল। সাভিলাষ হৃদয়কে ডাকিবার জন্যই যেন আমার স্তনযুগল স্ফুরিতমুখ হইল। যেন স্বেদপ্রবাহের দ্বারা ক্ষালিত হইয়া লজ্জা গলিয়া গেল। মকরধ্বজের তীক্ষ্ণ শর পড়িবার ভয়ে গাত্রযষ্টি কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার রূপ ভাল করিয়া দেখিবার জন্যই যেন কুতুহলহেতু আলিঙ্গনাভিলাষী আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রোমাঞ্চজাল উদ্গত হইল। প্রচুর স্বেদজলের দ্বারা ধৌত চরণযুগল হইতে রাগ যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল।)

কথাগুলিতে লুকোচুরি একটুও নাই।

ইহার পর মহাশ্বেতা বাড়ী ফিরিয়া কি করিলেন তাহার বিবরণ দিতেছেন :—

"গত্বা চ প্রবিশ্য কন্যান্তঃপুরং ততঃ প্রভৃতি তদ্বিরহবিধুরা কিমাগতাস্মি, কিং তত্রৈব স্থিতাস্মি, কিমেকাকিন্যস্মি, কিং পরিবৃতাস্মি, কিং তূষ্ণীমস্মি, কিং প্ররূঢ়তালাপাস্মি, কিং জাগর্মি, কিং সুপ্তাস্মি, কিং রোদিমি, কিং ন রোদিমি, কিং দুঃখমিদম্, কিং সুখমিদম্, কিমুৎকণ্ঠেয়ম্, কিং ব্যাধিরয়ম্, কিং ব্যসনমিদম্, কিমুৎসবোঽয়ম্, কিং দিবস এষঃ, কিং নিশেয়ম্, কানি রম্যাণি, কান্যরম্যাণতি সর্ব্বং ন বাগচ্ছম্! অবিজ্ঞাতমদনবৃত্তান্তা চ ক্ব গচ্ছামি, কিং করোমি, কিং পশ্যামি, কিং আলপামি, কস্য কথয়ামি, কোঽস্য প্রতীকার ইতি সর্ব্বঞ্চ নাজ্ঞাসিষম্। কেবলমারুহ্য কুমারীপুর প্রাসাদং বিসর্জ্য চ সখীজনং দ্বারি নিবারিতাশেষপরিজনপ্রবেশা সর্ব্বব্যাপারানুৎসৃজ্য একাকিনী মণিজালগবাক্ষনিক্ষিপ্তমুখী, তামেব দিশং তৎসনাথতয়া প্রসাধিতামিব কুসুমিতামিব ঈক্ষমানা তস্মাদ্দি গন্তরাদগচ্ছন্তমনিলমপি, বনকুসুমপরিমলমপি, শকুনিধ্বনিমপি তদ্বার্ত্তাং প্রষ্টুমীহমানা তৎপ্রীতোব গৃহীত মৌনব্রতা [ইহার

পর অবস্থার আরও বর্ণনা আছে] নিষ্পন্দমতিষ্ঠম্।”

(অনুবাদ। ফিরিয়া গিয়া কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তখন হইতে তাঁহার বিরহে বিধুর হইয়া, আমি কি আসিয়াছি না সেখানেই আছি, একাকিনী আছি কি জনপরিবৃতা আছি, চুপ করিয়া আছি কি আলাপ করিতেছি, জাগিয়া আছি কি ঘুমাইয়া আছি, কাঁদিতেছি না কাঁদি নাই, এটা কি দুঃখ না সুখ, এটা কি উৎকণ্ঠা, না রোগ, না বিপদ, না উৎসব, এটা কি দিন না রাত্রি, রম্যই বা কি অরম্যই বা কি এ সবের কিছুই জানিলাম না।

মদনের বৃত্তান্ত জানা না থাকাতে আমি কোথায় যাইতেছি, কি করিতেছি, কি দেখিতেছি, কি বলিতেছি, কাহাকে বলিতেছি, ইহার প্রতীকার কি, এ সবেরও কিছুই বুঝিলাম না।

কুমারীপুরীর প্রাসাদের উপরে উঠিয়া সখীদের বিদায় দিয়া দ্বারে নির্বিশেষে সকল পরিজনের প্রবেশ নিষেধ করিয়া সকল কাজ ছাড়িয়া একাকিনী মণিজাল গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে দিক তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা প্রসাধিত ও কুসুমিতের মত হইয়া উঠিয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া সেই দিগন্তর হইতে যে অনল আসিতেছিল যেন তাহাকে, যেন বনকুসুমের পরিমলকে, যেন পাখীর ডাককেও তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার প্রীতি হইতে মৌনব্রতা হইয়া নিষ্পন্দ রহিলাম।)

ইহাতেও কোনও অস্পষ্টতা নাই। টীকাকারেরা মহাশ্বেতার এই অবস্থাকে তাঁহার ‘মদনাকুল অবস্থা’ বলিয়াছেন।

এইবার কামিনী সেন এই সংস্কৃত বিবরণটি পড়িয়াই পরবর্তী যুগের বাঙালী ভাবের আবেগে, সে-যুগের সাহিত্যরীতিতে এবং বাংলা ভাষাতে কি লিখিলেন দেখা যাক। পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা ‘মহাশ্বেতা’ কবিতাটিতে এইরূপ :—

“দুই পদ হ’তে অগ্রসর,
কি এক সৌরভে পূর্ণ হ’ল দিক্ দশ।
চাহিলাম চারিভিতে ; দক্ষিণে আমার
দেখিলাম দুটি দিব্য ঋষির কুমার,
শুভ্র বেশ, আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে।
যে জন তরুণতর, কর্ণোপরি তার
অপূর্ব্ব কুসুম এক, সৌরভে শোভায়

অতুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন।
একদৃষ্টে চেয়ে আছি কুসুমের পানে,
কিম্বা সে কুসুমধারি লাবণ্যের ভূমি
মুখপানে, একদৃষ্টে আপনা বিস্মৃত,—
কতক্ষণ ছিনু হেন না পারি বলিতে—”

ইহার পর শারীরিক বিকারের কোনও কথা নাই, থাকিতে পারেও না। তবু বাড়ি ফিরিবার পর মনোভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু নূতন ধরনে। উহা এই রূপ :—

“ফিরিলাম গৃহে। এক নূতন বিষাদে
সুখের জীবন মম করিল আঁধার।
জননী বিস্মিত নেত্রে চাহি মুখপানে
জিজ্ঞাসিলা,—‘কি হয়েছে বাছারে আমার ?’
নারিনু কহিতে কিছু, বরষিল আঁখি
অবিরল অশ্রুধার। জননীর কোলে
নীরবে লুকায়ে মুখ রহিনু কাঁদিতে।

*　　*　　*

শৈশব সহসা যেন যুগ-ব্যবহিত,
কল্যকার ধূলাখেলা হয়েছে স্বপন :
ভাসিছে নয়নে এক দৃশ্য অভিনব—
সরোবর তীরবন, দুঃখী মৃগশিশু,
সুরকুসুমের বাস, নয়ন-মোহন
শোভা তার, ততধিক পবিত্র উজ্জ্বল,
ঋষিতনয়ের মুখ, অপার্থিব স্বর,
স্বপ্নময় আঁখি, মৃদু কম্পিত অঙ্গুলি,
ভূশায়িনী অক্ষমালা, মুহূর্তের তরে
স্পর্শে যার শ্বেত কণ্ঠ পবিত্র আমার।”

‘কাদম্বরী’তে পূর্বরাগের যে বর্ণনা পাইলাম উহা অতি উচ্চস্তরের কামের—রোমাণ্টিক কামের ; ‘আলো ও ছায়া’তে যে পরিচয় পাইলাম উহা রোমাণ্টিক প্রেমের। দুইএর মধ্যে কি প্রভেদ তাহা ইহার চেয়ে সুস্পষ্ট করা যাইত না।

তবু এই দুইটা অনুভূতির মধ্যে যোগও আছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিব :—

"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো॥"

নরনারীর সম্পর্কের সব আলো নিবাইয়া দিয়া, উহাকে কীটে-কাটা পুষ্পের মত কালো করিয়া দিবার জন্য একটা সদুপদেশ যে আমাদের নীতিপ্রচারকেরা দেন তাহা সকলেরই জানা আছে। এই সদুপদেশের মূলে আছে কাম ও প্রেমের মধ্যে একটা মিথ্যা দ্বন্দ্বের ধারণা। এই দ্বন্দ্বের শেষ নাই বটে, কিন্তু শেষ হওয়া উচিত। আমার বক্তব্য আমি কতকগুলি সোজা প্রশ্ন করিয়া উপস্থাপিত করিব।

সত্যই কি নরনারীর ভালবাসা দেহনিরপেক্ষ, কামগন্ধহীন? প্রেমের কবি যে কামাশ্লেষবর্জিত প্রণয়ের কল্পনা করিয়াছে তাহা কি কখনও বাস্তব জীবনে দেখা গিয়াছে? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে কামের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি? আমি যে কামকে অতি উন্নত কাম বলিয়াছি, তাহারও কি স্থান প্রেমে নাই?

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালী বিদ্যাসুন্দর হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রতিক্রিয়া হিসাবে সত্যই বিশ্বাস করিত যে, নরনারীর উচ্চতম প্রেম দেহনিরপেক্ষ। ইহার দৃষ্টান্ত একজন সাধারণ বাঙালী লেখকের একটি গল্প হইতে দিতেছি। এই গল্পটি ১৩০৭ সনে (ইংরেজী ১৯০১) 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই আমার পক্ষে গল্পটি পড়া সম্ভব ছিল না, কারণ আমার বয়স ছিল চার বৎসর। কিন্তু আমার মা 'প্রদীপে'র গ্রাহিকা ছিলেন, সুতরাং বাঁধানো ভল্যুম হইতে বৎসর চার-পাঁচ পরেই উহা পড়িয়াছিলাম। অত্যন্ত ডেঁপো ও ইঁচড়ে-পাকা হওয়াতে সেই বয়সেই প্রেমের গল্পের মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিতাম। এখন সত্তরের কাছাকাছি, তবু সে রসবোধ হারাই নাই। আশা করি অতি অকরুণ সমালোচকও আমার সম্বন্ধে এই কথাটা স্বীকার করিবেন।

গল্পটি এক যুবক ও তাহার বাল্যসঙ্গিনীর মধ্যে প্রেমের গল্প। উহার পরিণাম হইয়াছিল নায়িকার আত্মহত্যা। কিন্তু আমার প্রসঙ্গ সেটা নয়, আমি দেখাইতে

চাই এই দুইজন পরস্পরের প্রেমকে কি চক্ষে দেখিত। নায়ক বলিতেছে (সে অবশ্য কবিতা লিখিত)—

"একটা নূতন কবিতা লিখিলেই, খাতা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। আমি লিখিতাম,—বিদুষী সুধা শুনিত, শুধুই শুনিত না, কখনও সংশোধন করিয়া দিত। একটা স্থান খুলিয়া দেখিলাম—হায়, সে আজ কতদিন! —আমি লিখিয়াছিলাম 'দেহের মিলন', সুধা 'দেহের' কাটিয়া 'আত্মার' করিয়াছে! তাহার সুন্দর হস্তাক্ষরটি তেমনই জ্বলন্ত মহিমায় শোভা পাইতেছিল। তখন বুঝি নাই, সুধার প্রেমের আদর্শে, কতটা উচ্চতা, কতটা আন্তরিকতা ছিল।

লেখকের নাম না করা অবিচার হইবে। ইনি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরী নহেন, ইনি সন্তোষের ছোট তরফের জমিদার, কবি ও সাহিত্য-রসিক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি তাঁহার বন্ধু ছিলেন।)

কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। প্রেম কখনই দেহনিরপেক্ষ নয়। প্রমথনাথও তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাহা হইলে গল্পটিতে এই কথাগুলি পড়িতাম না।—"আমি ডাকিলাম, সুধা! আমার স্বর কম্পিত—কিঞ্চিৎ বেদনাজড়িত। কোন উত্তর পাইলাম না, কেবল একখানি কুসুমকোমল করতল আমার করতলের মধ্যে আশ্রয় লইল। উহার মধ্যে এমন একটা নির্ভরশীলতা ছিল, যাহা আজন্মব্যাপী এবং আমরণ-সঙ্গী। সহসা তাহার অধরে আমার অধর মিশিল।" নিশ্চয়ই ইহাদের কেহই, এমন কি লেখকও সম্ভবত, ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কাব্য হইতে নিম্নলিখিত বিখ্যাত চরণগুলি পড়েন নাই।

'La bocca mi bacio tutto tremante...'

আমি ইংরেজ কবির কৃত ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি।

"One day together, for pastime, we read
Of Launcelot, and how love held him in thrall.
We were alone, and without any dread.
Sometimes our eyes, at the word's secret call,
Met, and our cheeks a changing colour wore.
But it was one page only that did all.

When we read how that smile, so thirsted for,
Was kissed by such a lover, he that may
Never from me be separated more
All trembling kissed my mouth."

এই চুম্বনের ফল পায়োলো ও ফ্রাঞ্চেস্কার ক্ষেত্রে কি হইয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু মৃত্যুই আসল ব্যাপার নয়, আসল কথাটা চুম্বন। চুম্বন-নিরপেক্ষ প্রেম নাই, সুতরাং দেহনিরপেক্ষ প্রেমও নাই ; এবং দেহনিরপেক্ষ প্রেম যখন নাই, কাম-নিরপেক্ষ প্রেমও নাই, কারণ কাম দেহধর্ম, অজেয় জীবধর্ম। মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন, "সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার !" এটা কিন্তু তিনি ভয় পাইয়া লিখিয়াছিলেন ! আমি কামকে এই চক্ষে দেখি না—মারের দ্বারা বুদ্ধের প্রলোভন ও নানা অপদেবতার দ্বারা সেণ্ট এণ্টনীর প্রলোভনের' গল্পে যে সত্য নাই তাহা বলিব না। কিন্তু উহা কামের এক রূপ সম্বন্ধে ধারণা। কামের আর এক রূপও আছে। জীবনের উৎস যে কাম, তাহাকে পাপ বলিলে কোথায় দাঁড়াইব ?

বঙ্কিমচন্দ্র কামকে যে এই চক্ষে দেখেন নাই তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধে প্রথমেই দিয়াছি। তিনি দেহ ও প্রেমের মধ্যে যে বিরোধের কথা বলিয়াছেন, তাহা কামের জনপ্রচলিত ধারণা হইতে, কামের যে ধারণা কবি ও দার্শনিকের হইতে পারে তাহা হইতে নয়।

আমি কামের সহিত প্রেমের তফাৎ বুঝাইবার জন্য, যে আলোচনার কথা বলিয়াছি উহাতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। পাঠকের কাছে উহা কাজে না দিতে পারিলেও কথায় বলিব। আগে কনিয়াক দিয়া কামের প্রকৃত রূপ কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রেমের প্রকৃত রূপ বুঝাইবার জন্য 'ওয়াইনে'র শরণাপন্ন হইলাম। ('ওয়াইন' বলিতেছি এই জন্য যে, মদ, মদ্য, সুরা, সরাব যাই প্রয়োগ করি না কেন, তখনই জিনিসটার ব্যঞ্জনা বদলাইয়া যাইবে। ক্ল্যারেট, বারগাণ্ডী, শ্যাম্পেন, হক, মোজেল্ ইত্যাদিকে 'মদ' বলিলে রূপসী ও সতী-সাধ্বী ভদ্রমহিলাকে 'মাগী' বলার মত হয়। তাই 'ওয়াইন'ই লিখিলাম।)

অবশ্য আমার শাতো ইকেম বা শ্যাম্পেন অবশিষ্ট থাকিলে উহা পান করাইয়াই ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমাদের ভণ্ড, অর্থশোষক ও ছোটলোক গভর্নমেণ্টের জ্বালায় ভদ্র জীবনযাত্রা চালানো আর সম্ভব না হওয়াতে, এই সব পানীয় ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাই সামান্য একটু ভাল ওলো-

রোজো শেরী (অবশ্য হেরেথ দেলা ফ্রন্তেরার, দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার নয়) অবশিষ্ট ছিল, তাহাই দিতে হইয়াছিল। আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আমার অতিথি-দম্পতিদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিবাহ 'ল্যাভ-ম্যারেজ'। তাই কাম হইতে প্রেমের প্রভেদ আলোচনার প্রসঙ্গে আমি বলিলাম—

"আমার ধারণা হয়েছে এখানে আপনাদের কারুর কারুর বিয়ে লাভ-ম্যারেজ। তাঁদের মধ্যে এক দম্পতিকে একটা জিনিস খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করব—এটা খাবার পর তাঁদের পূর্বরাগের কথা মনে পড়ে কিনা।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন, কাহার উপর রসিকতা গড়ায়। যখন এক দম্পতিকে দিলাম, সকলেই হাসিলেন। কিন্তু আমার অনুমান সত্য কিনা তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।

ইহার দ্বারা যে তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই—কনিয়াক অতি উচ্চাঙ্গের পানীয়, এবং সেই শেরীও উচ্চাঙ্গের পানীয়, উহাদের মধ্যে স্বাদ ও ধর্মের প্রভেদ আছে, অথচ দুইএর মধ্যেই 'অ্যাল্‌কহল' আছে, একটাতে কম, একটাতে বেশী। দুইএর পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, যোগও তেমনই নিবিড়।

আঁদ্রে সিমোঁ এ বিষয়ে একটা অতি খাঁটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়াইন-এ অ্যাল্‌কহল নিশ্চয়ই আছে, নহিলে ওয়াইনই হইবে না। কিন্তু কেহ অ্যাল্‌কহলের জন্য ওয়াইন পান করে না, করে অন্য কারণে। তিনি আরও বলিয়াছেন, ওয়াইনের পিছনে 'অ্যাল্‌কহল' চিত্রের পিছনে ক্যানভাসের মত, কেহই চিত্র দেখিতে গিয়া ক্যানভাস দেখিতে চায় না।

কাম এবং প্রেমের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহাকেও এইভাবেই দেখিতে হইবে। বিশুদ্ধতম, পবিত্রতম প্রেমেও কাম আছে। কামবর্জিত প্রেম নাই। প্রেমের চরম আত্মসমর্পণ দৈহিক মিলনে, এই কথাটা মূর্খ বা ভণ্ড ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবে না। বিবাহের পূর্বে যাঁহাদের সঙ্গমের কোনও অভিজ্ঞতা হয় না, তাঁহাদের অনেকেরই মনে এই বিষয়ে একটা আশঙ্কা থাকে। নিতান্ত অসভ্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই শুধু দৈহিক তাড়না তৃপ্ত করিবার জন্য বিবাহ করে না। তাহারা প্রধানত যাহা প্রত্যাশা করে তাহা প্রণয়ের মানসিক সুখ। সুতরাং সঙ্গম সম্বন্ধে জনপ্রচলিত যে ধারণা আছে তাহা মনে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে চিন্তা করে উহার সহিত প্রেমের আদর্শের কোনও সংঘাত দেখা দিবে কিনা; একদিকে আকর্ষণ, আর একদিকে জুগুপ্সা—এই দুইটার সমন্বয় কি করিয়া হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, কোনও জুগুপ্সা

উদ্রিক্ত না হইয়াই কাম ও প্রেমের সমন্বয় হইয়া যায়। সকলের ক্ষেত্রে সমন্বয় অবশ্য একই পর্যায়ের হয় না, তবু সমন্বয় যে হয়, এবং কোথাও কোথাও সমন্বয় যে অত্যন্ত উচ্চস্তরে হয় তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাই বলিয়া কিন্তু কাম ও প্রেম এক নয়; দুইয়ের পরিধিও সমান নয়। নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক মনুষ্যজাতির দিক হইতে জৈব হইলেও ব্যক্তির দিক হইতে আরও অনেক কিছু। সুতরাং দৈহিক ব্যাপারটা আনুষঙ্গিক, মনের দিক হইতে মুখ্য নয়।

আজকাল অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র নরনারীর সম্পর্ককে দৈহিক স্তরে আবদ্ধ রাখিবার একটা ঝোঁক আসিয়াছে। তাই উহার গা হইতে প্রেম চাঁচিয়া ফেলিয়া উহাকে শুধু কামের বন্ধনে পরিণত করারও একটা ফ্যাশন দেখা দিয়াছে। এই জিনিসটার প্রকাশ আমি চাক্ষুষ বিলাতে কিছু কিছু দেখিয়াছি। তবে ফ্যাশ-নটা দৃষ্টিকটু তাহা বলিতে দ্বিধা করিব না; যেমন নাকি মানুষের শরীর হইতে মাংস ও চামড়া কাটিয়া ফেলিয়া কঙ্কাল বাহির করাকে দৃষ্টিকটু বলিব।

এই ঢং শুধু যে প্রেমের সৌন্দর্যের বিরোধী তাহাই নয়, মানুষের বিবর্তনেরও বিরোধী; আবার শুধু যে মনুষ্যজাতির বিবর্তনের বিরোধী তাহাই নয়, প্রাণীজগ-তের বিবর্তনেরও বিরোধী। প্রাণীদের মধ্যেও সঙ্গম কেবলমাত্র দৈহিক ব্যাপার নয়। নহিলে 'অ্যানিম্যাল কোর্টশিপ' সম্বন্ধে জীবতত্ত্বের এত গ্রন্থ লিখিত হইত না। বিশেষ করিয়া পাখীদের মধ্যে এই জীবধর্মের প্রকাশে যে সৌন্দর্য দেখা দিয়াছে তাহা অপরূপ। যদি পক্ষীবংশ বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে গান বা পক্ষ-সৌন্দর্যের কোনও প্রয়োজন ছিল না; কেঁচোও সঙ্গত হইতে পারে; প্রজাপতির প্রয়োজন ছিল না, কৃমি হইলেই চলিত। এমন কি উদ্ভিদ-জগতেও জৈব প্রয়োজন নিরাভরণ জৈবস্তরে থাকে না, তাহা হইলে আমরা ফুল দেখিতাম না। যাঁহারা প্রেমকে শুধু কাম বলেন, তাঁহাদের কাছে প্রেমের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য একটা চালাকি খেলিতে ইচ্ছা হয়—তাঁহারা আম খাইতে চাহিলে ফলটা না দিয়া শুধু চাঁচা-ছোলা আঁটি দিলে কেমন হয়?

এ বিষয়ে সত্য ও আসল কথাটা খুবই সহজগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য। বিশ্বের কোনও জিনিসই মৌলিক নয়। তাহা হইলে জড়পদার্থ ইলেকট্রন এবং ইলেক্-ট্রনের সহচারীবর্গের বেশী অগ্রসর হইত না, অর্থাৎ আমরা জড়পদার্থই দেখিতাম না। ক্রমাগত অভিব্যক্ত হইয়া নূতন নূতন রূপ ধরিতে ধরিতে বাহুল্যের দিকে যাওয়াই সৃষ্টিধর্ম। ইহার মধ্যে কোনও জায়গায় ছেদ টানিয়া বলিবার উপায় নাই

যে এই পর্যন্তই আসল, আর বাকীটা বাহুল্য। সবই একত্রসম্বদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য।

মানুষের বেলাতেও এই কথা খাটে। যুগে যুগে অভিব্যক্ত হইয়া মানুষ মানুষে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু অভিব্যক্তির কোনও অংশই ত্যাগ করিতে পারে নাই —অর্থাৎ মানুষ একই সঙ্গে জড়পদার্থ, জীব, মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ উচ্চতম অনুভূতিসম্পন্ন ভাবুক ও আদর্শবাদী। ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও নাই, নীতিবাদের নামে অনেকে দেহ ও আত্মার মধ্যে যে বিরোধ বাধাইয়াছে আসলে সেই বিরোধ কোথাও নাই।

নরনারীর সম্পর্কেরও তেমনই কালে কালে অভিব্যক্তি হইয়াছে। কাম উহার আদিম রূপ হইলেও উহার পূর্ণাভিব্যক্ত রূপ নয়। এককালে কামকে হেয় বলিয়া শুধু প্রেমকেই গ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করা হইত; উহার ফলে মানবজীবনে ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছু দেখা দেয় নাই, দেয় না। আবার আজ প্রেমকে বর্জন করিয়া শুধু কামই গ্রাহ্য এই কথা বলিবার যে ফ্যাশন হইয়াছে, উহাও মূঢ়তা— উহার ফলে নরনারীর সম্পর্ক দৈন্যগ্রস্ত ও নীচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দুইটা অত্যুক্তিই ছাড়িয়া দিয়া কাম ও প্রেমকে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া মানা উচিত। আদিমতম কাম হইতে নবতম প্রেম পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা। সৃষ্টি যদি বন্ধ না হয়, তাহা হইলে এই সম্পর্কের নূতন অভিব্যক্তি, আরও বাহুল্য দেখা যাইবে এই আশা করা যাইতে পারে। কাম ও প্রেম সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশাচার

কাম হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রেমমুখীন হইতে হইবে—ইহাই যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জীবনে নরনারীর সম্পর্কঘটিত ভাববিপ্লবের মূল সূত্র, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই বিবর্তনের কাহিনী লিখিতে হইবে। কিন্তু যে-কাম হইতে নূতন ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগের স্রোত বহিল উহা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাম নয়। তাই যদি হইত তবে এই বিপ্লবকে শুধু আদর্শান্তর, অর্থাৎ এক আদর্শ ছাড়িয়া অন্য আদর্শকে গ্রহণ করা বলিতাম। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে পুরাতন ধারা হইতে নূতন ধারা আরম্ভ হইল উহা কোনও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। উহা প্রাচীন ভারতের কামের প্রকাশ তো নয়ই, এমন কি প্রাচীন

বাংলা কাব্যের কামও নয়। উহাতে যাহা দেখা যাইত তাহা কামের ইতরীকৃত লৌকিক রূপও নয়, কারণ উহাও স্থূল হইলেও ঘৃণ্য নয়। ভাববিপ্লবের প্রারম্ভে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কামের যে রূপ বাংলাদেশে দেখা যাইত উহা অতিশয় জুগুপ্সাজনক।

এই অধঃপতন কখন এবং কেন হইল তাহার আলোচনা এই বই-এ সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া এ বিষয়ে পুরাপুরি তথ্য বা ঐতিহাসিক প্রমাণও নাই। কিন্তু এই অবনতির ফলে—অবনতি যে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে আদিরস আছে তাহাকেও ভদ্রভাবে গ্রহণ করা সে-যুগের বাঙালীর পক্ষে সম্ভব রহিল না। প্রাচীন হিন্দুর তীব্র অথচ রসভোর মদিরা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও আর আমরা ওষ্ঠের কাছে তুলিতে পারিলাম না। উহা পণ্ডিত ব্যক্তির কামজ উত্তেজনার ঔষধ, মানসিক মদনানন্দ মোদক হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং সংস্কৃত কবিতা পড়া ও পড়াইবার সময়ে পণ্ডিতেরা আদি-রসের যে আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেন তাহার ফলে আদিরসের পিণ্ড চটকাইবার সাধ্যও রহিল না।

এই পণ্ডিতেরা দুই উদ্দেশ্যে আদিরসাত্মক কাব্যের ব্যাখ্যা করিতেন। প্রথমত, প্রৌঢ় বয়সে যুবতী স্ত্রীর অনুগ্রহ পাইবার জন্য। ভুঁড়ি, উর্ধ্বগামী ও অধোগামী নানাপ্রকার দুর্গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা পত্নীকে প্রতিকূল করিয়া কাম-প্রবৃত্তির সাহায্যে অনুকূল করিবার জন্য আদিরসাত্মক কবিতার সহায়তা লইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা জানিতেন। তাই তিনি শান্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পণ্ডিত "শান্তির অভিনব যৌবন বিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্য সকল পড়াইতে লাগিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি শিখে নাই ; এখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল।"

পণ্ডিতদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, প্রকাশ্যে ছাত্রদের সঙ্গে বদরসিকতা করা—কোনও সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে, কোনও সময়ে খোলাখুলি। ছাত্রেরা অধ্যাপকের উক্তি মাথা নীচু করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শুনিত। কিন্তু পরে নিজেদের কথাবার্তায় উহার উপর বেশ করিয়া নিজস্ব রং চড়াইত। একটু চাপা ভাবে এই উৎপাত আমাদের ছাত্রাবস্থাতেও কিছু কিছু ছিল। আশ্চর্যের কথা এই, রাগিলেও পণ্ডিত মহাশয়েরা এই অধঃপতিত কাম হইতেই ভর্ৎসনার পারিপাট্য সাধন

করিতেন। কলিকাতার এক পণ্ডিত মহাশয় রাগিলেই বলিতেন, "তো ছোঁড়াদের যা অবস্থা তাতে তো বিছানার চাদর কেচে জল খাইয়ে দিলে ছুঁড়ীদের পেট হয়ে যাবে।" ছাত্রেরাও অবশ্য যতটুকু পারে টেক্কা দিতে চেষ্টা করিত। একদিন এক পণ্ডিত মহাশয় গরমে অস্থির হইয়া পাঙ্খাটানাওয়ালাকে বলিয়াছিলেন, "খেঁচো!" ক্লাসসুদ্ধ ছাত্র উহা হিন্দী অর্থে না লইয়া কলিকাতার বালক সমাজে প্রচলিত বাংলা অর্থে নিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিল।

অন্যদিকে প্রাচীন বাংলা কবিতার আদিরসও হইয়া দাঁড়াইল বাঙালী প্রাকৃতজনের কামপরিতৃপ্তি বা কামজ রসিকতার অবলম্বন। ফলে 'বিদ্যাসুন্দর' সাহিত্য হিসাবে অপাংক্তেয় হইয়া গেল। আমি অল্পবয়সে আনাতোল ফ্রাঁসের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলাম। ইহা দেখিয়া আমার এক গুরুজন—যাঁহাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম—আমাকে বলিয়াছিলেন, "আনাতোল ফ্রাঁসে কি আছে? তাঁর 'রেড লিলি' তো 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত।" পরে নবারব্ধ 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রসঙ্গক্রমে রসিকতাচ্ছলে 'বিদ্যাসুন্দরে'র উল্লেখ করিয়া নিজেও বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলাম। তখন দিলীপকুমার রায়ের খুবই নাম, বিশেষ করিয়া গানের জন্য। এই কারণে বহু লোকে তাঁহার নামের পূর্বে 'গীতসুন্দর' বা 'সুরসুন্দর' বিশেষণ বসাইত। আমি এই ঢং-কে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলাম, "আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে 'বিদ্যাসুন্দর' উপাধি দিলাম।" পরে শুনিলাম, উহা 'শনিবারের দলে'র অপরিসীম ও অশ্লীল বেয়াদবির প্রমাণ বলিয়া বিচার করা হইয়াছিল।

এই অবনতির ফল ভাষাতেও দেখা দিয়াছিল। আমি বাঙাল, কলিকাতায় বড় হওয়ার দরুন নরনারীঘটিত বহু খানদানী শব্দ শুনিতাম, কিন্তু গুহ্যসাধনায় দীক্ষা না লওয়াতে কথাগুলির ব্যঞ্জনা জানিতাম না। তাই একদিন মোহিতবাবুর কাছে স্ত্রীলোকের হাস্যলাস্য ও 'কোকেট্রি'-র কথা বলিতে গিয়া 'ছেনালী' শব্দ, ও আর একদিন স্ত্রীকে সন্দেহ করার বায়ু সম্বন্ধে 'নেয়ো-বাই' শব্দ ব্যবহার করিয়া-ছিলাম। তিনি একেবারে 'না-না' করিয়া উঠিলেন। আমার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া রাগ করিলেন না বটে, কিন্তু এই শব্দগুলি ভবিষ্যতে প্রয়োগ করিতে একে-বারে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ফলে সংস্কৃত আদিরসাত্মক কবিতা দূরে থাকুক, আধুনিক প্রেমের উপন্যাস পড়াও নিন্দার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। আমার মনে আছে, একদিন আমার স্কুলের বন্ধু গঙ্গাধর 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল—"বইটা খারাপ নয়, তবে

জায়গায় জায়গায় আদিরস একেবারে ঢেলে দিয়েছে!" তাহার নাক-সিট্‌কানো মুখ আমার চোখে ভাসিতেছে। আদিরস অবশ্য কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের চুম্বন।

এইভাবে প্রায় জোর করিয়া কামকে ঘরের বাহির করিয়া কুলটা করার পর, এবং সকল কুলটার যে-স্থানে গতি হয় সেই বেশ্যাবাড়ীতে পাঠাইবার পর, কাম লইয়া সাহিত্য-রচনার সাধ্য আর আমাদের রহিল না। বহুকাল কাম সম্বন্ধে কোন কথা বলাই সম্ভব হইল না। তবে কাম চাপা থাকিবার জিনিস নয়। তাই যৌন-বিজ্ঞান হইয়া আবার দেখা দিয়াছে। হায়! সংস্কৃত কবিতার পর এও আমাদের কপালে ছিল।

নরনারীর সম্পর্ক লইয়া সেকালের কর্মকাণ্ড ও দেশাচারের কথা যখন ভাবি, তখন আমার নিজের জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার পিতামাতা ব্রাহ্মপন্থী ছিলেন। সুতরাং কোনও নিন্দনীয় বা কুৎসিত ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ অন্য বালকের যাহা ছিল, অল্পবয়সে আমার তাহা ছিল না। আমাদিগকে সেই ধরনের জীবনের সকল সংস্পর্শ হইতে অতি সাবধানে রক্ষা করা হইত। সেই শিক্ষার ফলে এইসব ব্যাপারে আমার নিজেরও একটা সংযম গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ছাত্রজীবনে বা প্রথম কর্মজীবনে কেহ কখনও আমার সহিত স্ত্রীঘটিত ব্যাপার লইয়া কথা বলিত না—তুলিলেও আমি হয়ত চালাইতে দিতাম না, কিন্তু আমার ধরন-ধারন দেখিয়া অন্যেরা আমার কাছে এইসব প্রসঙ্গের উত্থাপনই করিত না। এখনও আমার অনেক বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি বলেন—নিন্দার ভাবেই বলেন যে, আমি 'সেক্স' লইয়া কথা বলি না।

তবু স্ত্রীঘটিত আকার-ইঙ্গিত, ফিস্‌ফাস্ এত পরিব্যাপ্ত ছিল যে, আমার দেখিবার বা শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বহু জিনিস চোখে পড়িত, কানে পৌঁছিত। অতি সামান্য অংশের সহিত পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেই আমার মনে একটা পীড়া হইত। এইখানে জীবনের বিভিন্ন বয়স হইতে চারিটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিব।

প্রথমটি ১৯০৬ অথবা ১৯০৭ সনে ঘটিয়াছিল, তখন আমার বয়স আট-নয়। আমাদের পাশের বাড়ীর মোক্তার মহাশয়ের কয়েকটি মেয়ে ছিল। উহারা মাঘমণ্ডল ব্রত করিত। বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী, মাঘের শীত সম্বন্ধে এই প্রবাদবাক্য সকলেরই জানা। সেই শীত ময়মনসিংহ জেলাতে আবার খুবই প্রখর হইত। উহা সত্ত্বেও মেয়েরা খুব ভোরে সূর্যোদয়ের আগে উঠিয়া নদীতে

স্নান করিবার পর গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিত। আমরা ছেলেরা সেই গানে জাগিয়া উঠিয়া তখনই ছুটিয়া গিয়া মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতাম।

অবশ্য ব্রতের অনুষ্ঠানে যোগ দিবার উপায় আমাদের ছিল না। প্রথমত, ব্রত মেয়েদের, তারপর আমরা অস্নাত। প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া নিকানো ব্রতের জায়গার মধ্যেও আমাদিগকে যাইতে দেওয়া হইত না। আমরা খড়কুটা যোগাড় করিয়া মেয়েদের আগুন পোহাইবার জন্য আগুন জ্বালিয়া দিতাম, আর কাছে বসিয়া থাকিতাম।

মেয়েরা ব্রতস্থানে চালের গুঁড়া, কাঠ-কয়লার গুঁড়া ও সুরকির গুঁড়া দিয়া আলপনার ছাঁদে খুব বড় করিয়া চিত্র করিত, উহার মাঝখানে লাল গুঁড়া দিয়া সূর্যের মুখ ও সাদা গুঁড়া দিয়া চাঁদের মুখ আঁকিত। আঁকা হইয়া গেলে ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রতের নানারকম ক্রিয়াকর্ম করিত। আমরা বালকেরা দূর হইতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতাম, মেয়েগুলি ব্রতের পুণ্যের ফলে স্বর্গে চলিয়া যাইবে, আর আমরা পুণ্যহীন অকর্মণ্য এঁড়ে বাছুরের দল মর্ত্যে পড়িয়া থাকিব।

একদিন এইভাবে মেয়েরা চিত্র করিতেছে। আমি কাছে বসিয়া দেখিতেছি। হঠাৎ একটা অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি শুনিয়া পিছনের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, কাতরোক্তি মোক্তার-মহাশয়ের মুহুরী, আমাদের অমুক-দাদার মুখ হইতে আসিতেছে। দাদা একটি জলচৌকিতে বসিয়া আছেন, কোমর পর্যন্ত ধুতি তোলা, একটা কি তীব্রগন্ধ ঔষধ দিয়া উন্মুক্ত উপস্থ ধুইতেছেন, তাহার অগ্রভাগ হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নীচে একটা পিতলের বাটিতে পড়িতেছে।

এতগুলি বালক-বালিকা যে আছে তাহাতে তিনি কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—অবশ্য আমরা বালক-বালিকারাও দৃশ্যটা দেখিয়া উহাতে মনোযোগ দেওয়া বা কথা বলার কোনও আবশ্যক দেখি নাই। আমাদের অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল যে, শহরের উপকণ্ঠে বেশ্যাপাড়া বলিয়া যে একটা বেড়া-দেওয়া দোচালা-চারচালার বসতি আছে সেখানে যাওয়ার জন্যই এই ধরনের রোগ হয়; উহা লইয়া চেঁচামেচি বা মাতামাতি একেবারে অহেতুক।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯১৩ সনের—তখন আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমার পিতার কলিকাতায় একটা ব্যবসা ছিল, তিনি কিশোরগঞ্জে থাকিতেন বলিয়া একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উহা চালাইতেন। তিনি অতিশয় ফিট্‌ফাট্‌ পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধন করিতেন। আমরা তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকিতাম ও তাঁহার কাছে খরচের টাকার জন্য মাঝে মাঝে যাইতাম।

একদিন আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ টাকা আনিতে গিয়া দেখি, তাঁহার কুড়ি-বাইশ বৎসরের যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র জ্বরে শয্যাশায়ী। জ্বরটা বেশী, তাই কাকা-মহাশয় চিন্তিত। এই অবস্থায় দুই-তিনদিন পরে আমরা আবার খবর লইতে গেলাম। তখন কাকা-মহাশয় গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বলিলেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম ম্যালেরিয়াঘটিত জ্বর, এখন বের হয়েছে প্রমেহঘটিত জ্বর।" দাদাও আমার মুখের দিকে চাহিলেন না, আমিও দাদার মুখের দিকে চাহিলাম না—চোখ চাওয়া-চায়ির তো কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

তৃতীয় ঘটনা ১৯২১ সনের, তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছি। একবার কলিকাতা হইতে কিশোরগঞ্জ যাইবার সময়ে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে বসিয়া আছি। সামনের বেঞ্চিতে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি রেলের কর্মচারী, ছুটি লইয়া বাড়ীতে যাইতেছেন।

রেললাইনের ধারে কয়েকটি খড়ের ছোট ঘর, দরমার 'টাট্টি' দিয়া ঘেরা। বেড়ার দরজার কাছে একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বয়স অল্প, রং শ্যাম হইলেও দেহ সুঠাম, মুখখানা কমনীয়। পাশে একটি রুলধারী রেলওয়ে কনস্টেবল ত্রিভঙ্গমুরারি ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া হাসি-হাসি মুখে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিতেছে, সৃক্ক বাহিয়া পানের রস পড়িতেছে।

ঘরগুলি কি, মেয়েটি কি, বোধ করি বলিয়া দিতে হইবে না। রেলস্টেশনে এবং অন্যান্য ছোট জায়গায় যে-সব কর্মচারী সামান্য বেতনে কাজ করিত তাহাদের পক্ষে সপরিবারে থাকা সম্ভব হইত না। তাই তাহাদের সুবিধার জন্য এই ধরনের ঘর এবং ঘরের অধিবাসিনীও থাকিত, নহিলে রাত্রিযাপনে কষ্ট হইত। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের চরার ধারেও এই ব্যবস্থা স্বতঃই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ একটি যুবক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া লাফ দিয়া কামরায় উঠিয়া পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই জান্?" ভদ্রলোক বলিলেন যে, ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। কতদিনের ছুটি ইত্যাদির কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে দেখি যুবকের চোখ মেয়েটির দিকে পড়িয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ গলা বাড়াইয়া খুব ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, এ কবে আইছে? এরে ত আগে দেখি নাই!"

ভাষাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কোন্ অঞ্চলের লোক। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোমার লজ্জা করে না? এতজন ভদ্রলোকের সামনে এই ধরনের কথা বল!" ক্রমাগত ভৎর্সনা চলিল, বেচারা

যুবক বুঝিতেই পারিল না কেন এত ভর্ৎসিত হইতেছে। চোখের সম্মুখে লোভনীয় বারবনিতা, ইহার সম্বন্ধে কথা বলিব, না নীরস কথা বলিব?

চতুর্থ ঘটনা ১৯২৭ সনের। তখন আমি বেলেঘাটার কাছে শুঁড়োতে থাকি। ফাঁড়িপথে কলিকাতা আসিবার জন্য একটা পায়ে চলার রাস্তা নারিকেলডাঙ্গার রেলপুল পর্যন্ত ছিল। সেটা ধরিয়া হ্যারিসন রোডের দিকে আসিতেছি। জায়গাটা ফাঁকা, কিন্তু মাঝে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একতলা কতকগুলি বাড়ী ছিল। পাড়াটার সামনে একটা মাঠের ধারে আসিয়াই দেখি ওপারে একটা ছোট রকমের ভিড়, উহাতে পুরুষ-স্ত্রীলোক দুই আছে। কাছে গিয়া দেখিলাম একটি বাড়ীর সদরের কাছে একটি কিশোরী কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সামনে একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক হেঁটো ধুতি পরিয়া খালি গায়ে চীৎকার করিতেছেন। পাশে একদিকে কয়েকটি প্রৌঢ়া গৃহিণী। এক গৃহিণীর মুখে শুনিতে পাইলাম, "ও মাগো, কি ঘেন্নার কথা! সোমত্ত মেয়ের বুকে হাত দেয়া!"

ভদ্রলোকটির সামনে একটি যুবক অসহায়ভাবে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সে গঞ্জনার উত্তরে অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি নিজের বোন ভেবে শুধু বোঁটাতে একটু কুরকুরুনী দিয়েছিলাম।"

ভদ্রলোকটি একেবারে বোমার মত ফাটিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "শালা! তুমি বোন ভেবে কুরকুরুনী দিয়েছিলে? কুরকুরুনী ঢুকিয়ে দেবো তোমার পোঁদে!"

আমি তখন মূল ফরাসীতে কাসানোভার আত্মজীবনী পড়িতেছি। ভাবিলাম ইহা কি কাসানোভার অনুসন্ধান, না অন্য কিছু? যথেষ্ট আদিরসাত্মক বই পড়িয়াছিলাম, তাই প্রশ্ন করিলাম—ইহাও কি আদিরস?

এই ধরনের ঘটনা হইতে আলোচনা শুরু করিতে গেলে তখনই দুইটি প্রশ্ন উঠিবে। প্রথম, এরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কি সমগ্র একটা সমাজের আচরণ সম্বন্ধে রায় দেওয়া চলে? একজন ব্যক্তি কত দেখিতে পারে? সব সমাজেই অনাচার থাকে, ভুল ধারণা থাকে, খোঁজ লইলে ইহার অল্পবিস্তর সংবাদ মেলে। এই সব সত্ত্বেও মোটের উপর সমাজের আদর্শ এবং আচরণ দুই-ই দূষিত না হইতে পারে। এই যুক্তি মানিয়া লইতে আমার একটুও আপত্তি হইবে না। যে ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়াছি, উহার সহায়তায় আমি বক্তব্য প্রমাণ করিতেও বসি নাই। প্রশ্নটার সম্বন্ধেও বলিব উহা যুক্তিযুক্ত। আমার অভিজ্ঞতায় এরূপ পঞ্চাশটা ঘটনা আসিলেও বলিতাম, উহার উপর নির্ভর

করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না—যদি না…

এই 'যদি-না'টা গুরুতর, ইহাই ভাবিবার বিষয়। অর্থাৎ এই চারিটি ঘটনা যদি বিচ্ছিন্ন না হয়, যদি এগুলির সহিত অন্য তথ্য-প্রমাণ হইতে একটা সমাজ সম্বন্ধে যে ধারণা করা যায় তাহার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে, তবে প্রতীক বা উদাহরণ হিসাবে এগুলিকে নিশ্চয়ই উপস্থাপিত করা যায়। আমিও তাহাই মাত্র করিলাম। আপাতত এর বেশী কিছু নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে নরনারীর সম্পর্কের যে নূতন ধারা দেখা দিয়াছিল তাহার আবির্ভাবের পর যাহা দেখা যাইত বা আজ পর্যন্ত যাহা দেখা যায়, সেই সব ঘটনা বা ব্যাপারকে পূর্ববর্তী যুগের অবস্থার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা। সাধারণত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে পূর্ববর্তী যুগের অবস্থার প্রমাণ হিসাবে পরবর্তী যুগের কোনও আচরণকে সাক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য করা হয় না। প্রতিটি যুগের তথ্য-প্রমাণকে আলাদা রাখা হয়।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেও অন্যায় হইবে না। কেন হইবে না, বলিতেছি। বাংলা দেশে নরনারীর সম্পর্কঘটিত ব্যাপারে সকল দিক হইতে নূতন ধ্যান-ধারণা ও আচরণ দেখা দিবার পরও পূর্ব যুগের আচরণ মোটেই লোপ পায় নাই। বাঙালী সমাজের সর্বত্র নূতন ধারার পাশে পাশে পুরাতন ধারা দেখা যাইত। এই কথা কলিকাতা সম্বন্ধেও খাটে, পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই। গ্রাম অঞ্চলে ও গ্রাম্যসমাজে—যেখানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বা আচার-ব্যবহার পৌছিতে পারে নাই, সেখানে পুরাতন ধারা প্রায় অক্ষুণ্ণ ভাবেই ছিল।

তবে নরনারীর সম্পর্কিত পুরাতন দেশাচারের বিবরণ দিবার আগে আমার বিবরণ কি ধরনের তথ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার একটু আলোচনা করিতে চাই, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন যে, আমি শুধু সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই এই বিষয়ে বর্ণনা দিতে অগ্রসর হই নাই।

নরনারী-সম্পর্কিত ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ববর্তীকালে, অর্থাৎ মোটামুটি ১৮০০ সন হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত যে যুগ তাহা হইতে যে সাক্ষ্য পাওয়া উহারই কথা আগে বলিব। ছাপার অক্ষরে সাক্ষ্য প্রধানত চার ধরনের রচনায় আছে—(১) সংবাদপত্রের বিবরণ; (২) গদ্যসাহিত্য; (৩) কবিতা; (৪) গান। গানের মধ্যে টপ্পা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কবির গান তরজা পর্যন্ত ছিল। তবে উহার বেশীর ভাগ ছাপা হয় নাই।

এই সব রচনাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিবার আগে কয়েকটা আপত্তি মনে রাখিতে হইবে। সংবাদপত্রে, নরনারী সম্পর্কিত যে আলোচনা প্রকাশিত হইত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হয় সমাজ সংস্কার, নয় ব্যক্তিগত নিন্দা ও আক্রমণ। উহাতে অতিরঞ্জন থাকাই সম্ভব, একেবারে নির্জলা মিথ্যা থাকাও অসম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়া সমস্যাটা কি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ১৮৩১ সনের ৫ই নভেম্বর তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকাতে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"কস্যচিৎ 'চেতো পরগণা নিবাসিনঃ বিপ্রসন্তানস্য' ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশিত করিয়াছি।

"চেতো পরগণা নিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন যে, ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন। দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধ কর্ত্তা, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও, ইহারা একে একে তাবতেই বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন কোন চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইস্থানে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল, আর ঐ বিপ্রসন্তানের সহিত ও বাটির খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাবশ্যক নহে। যদিও উপরিউক্ত বৃত্তান্ত পাঠ-করণান্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে মনে হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না, তথাচ ঐ রূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না ;"

এই কাহিনীর কতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণীয়? সম্পাদক যে বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য পরের মন্তব্যে সুস্পষ্ট। তিনি বলিতেছেন;—

"নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এই রূপ অনেকে কহিয়া থাকেন), তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা

তাহারদিগকে বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্ব্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণতা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহার বাধা কি? আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারাই বা অসম্ভাবনা কি আছে?...

"কিন্তু ইহাও জানিয়া যদি পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া উপপত্নীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত হন তবে স্ব-স্ব পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা ঐ অবোধ পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অর্শিতে পারে? বাস্তবিক এই যে তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার, অতএব তাঁহাদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি।...

"স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে, উপরি-উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে, কি তাহার আর কোন কারণ আছে? তাঁহাদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে, বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত?"

সম্পাদক সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী হওয়াতে একটা উড়ো ঘটনাতে বেশী আস্থাশীল হইয়া মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে এই ধরনের অনাচার ব্যাপক। সুতরাং সংবাদ বাদসাদ দিয়া নিতে হইবে। তবে ইহার পিছনে যে একটা-না-একটা অনাচার ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় প্রচলিত মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুরাতন ও নূতন মনোভাবের মধ্যে কি প্রভেদ তাহাও এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণের কথা বলিব। আমি এই ধরনের আক্রমণ কিছু পড়িয়াছি। উহা যে অতি জঘন্য স্তরের হইত সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। ইহার আভাস দিতেছি। একটি পত্রিকায় পাঁচী-নাম্নী ঝির স্বাক্ষরিত একটি পত্র ছাপা দেখিয়াছি। উহাতে বাড়ীর গৃহিণীর সহিত চাকরের দুপুরবেলাকার ব্যাপারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল, এবং বলা হইয়াছিল যে, উহা এই পরিচারিকার চাক্ষুষ দেখা। এই ঘটনাটা কলিকাতার একজন ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, ইহাও নাম করিয়া বলা হইয়াছিল।

কবিদের ঈর্ষাপ্রসূত আড়া-আড়িতে এই ধরনের নিন্দা আরও কুৎসিত ভাবে করা হইত। আমি পড়িয়াছি এরূপ একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক কবি অন্য কবির মাতা সম্বন্ধে বলিতেছেন যে মাতা পুত্রবধূর সহিত (অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী কবির স্ত্রীর সহিত) অস্বাভাবিক ভাবে কাম পরিতৃপ্ত করিতেছে। ইহার খোলসা বর্ণনা আছে। পুত্রবধূ হতভম্ব হইয়া, "শাশুড়ী কি কর, কি কর," বলিয়া চেঁচাইতেছে, কিন্তু শ্বশ্রূমাতা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া কাজ সমাধা করিতেছে, ও এই কাজের কি সুখ তাহা পুত্রবধূকে বুঝাইতেছে। ইংরেজী ভাষায় ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এই কাজের সূচক যে শব্দ আছে, তাহার অন্তত ভাষাগত ভদ্রতা আছে। কিন্তু এই বিবরণ হইতে প্রথম জানিলাম, ইহার জন্য বাংলা ভাষায় অতি ইতর একটা কথা প্রচলিত ছিল। এই সব কাহিনী প্রমাণ হিসাবে নিলে বহু ছাঁটিয়া নিতে হইবে।

গদ্যসাহিত্যে নরনারীর সম্পর্ক লইয়া দুই রকমের রচনা আছে—প্রথম অশ্লীল রসিকতাপূর্ণ গল্প; দ্বিতীয়, বাংলা কামসূত্র। দুই-ই রিরংসার কাল্পনিক খোরাক যোগাইয়া পয়সা করিবার উদ্দেশ্যে লেখা। এইরূপ একখানি চিত্র সম্বলিত বইও আমি দেখিয়াছি। উহাতে 'উড-কাটে' অতি খোলাখুলি রকমের ছবি ছিল, কতকগুলি আবার অস্বাভাবিক কাম চরিতার্থ করিবার। এগুলিকে আচরণের সাক্ষ্য হিসাবে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। কিন্তু মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া কতকগুলি বই ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল। এইগুলিতে অতিরঞ্জন ও তামাশা আছে। তবু এগুলির সাক্ষ্য অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। কারণ সামাজিক আচরণের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার বাস্তব ভিত্তি না থাকিলে লোকে উহা মোটেই গ্রহণ করে না। তাই যতই তামাশা থাকুক না কেন, মোটামুটি ভাবে এইসব লেখাতে সত্য কথাই থাকে। তখনকার-দিনে লেখা এই ধরনের বাংলা বই-এর যেসব জায়গা আমার কাছে সমসাময়িক অবস্থা বা আচরণের যথার্থ বিবরণ বলিয়া মনে হইয়াছে, সেগুলি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিতে আমি দ্বিধা করি নাই।

তার পর কবিতা ও গান। এগুলি অংশত তামাশা, অংশত আদিরস পরিবেশন। ইহাদের সবই যে অশ্লীল তাহা নয়—কতকগুলি গৌণ ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ, কতকগুলি একেবারে সোজা কথা। আগেই বলিয়াছি কবির গান ও তরজার বেশীর ভাগই কখনও ছাপা হয় নাই। সুতরাং এগুলির ধারণা করিতে

হয় পরবর্তী যুগের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া। সেই যুগে কবির গানকে কুরুচির পরিচায়ক বলিয়াই ধরা হইত।

কবিতা এবং গানে, বিশেষ করিয়া গানে, লপেটি ভাব না থাকিলে উহা সমাদর পাইত না। কীর্তন, শ্যামা বিষয়, ও অন্যান্য ধর্মমূলক সঙ্গীত ছাড়া অন্যত্র আদিরস না থাকিলেও চলিত না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে যে একটা কথা আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া লৌকিক গানের কি ধর্ম ছিল তাহার পরিচয় দিব। এক সাধু বেদগান করেন, তাই আধুনিক শচীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,

"কোন্ কথাগুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?"

একটি গান 'বিষবৃক্ষ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিদাসী বৈষ্ণবী-বেশধারিণী দেবেন্দ্র দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে আসিয়া গান ধরিল,—

"কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল
গো সখি, কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পরলেম দুল।
সখি, কলঙ্কেরি ফুল।
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে
নবীন মুকুল।"

ইহাতে যে একটা মাধুর্য আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবু নবীনা মেয়ের কাছে শিক্ষিতা কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—

"বৈষ্ণবী দিদি, তোমার মুখে ছাই পড়ুক, আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

সূর্যমুখী যখন বলিলেন যে, ওসব গান তাঁহাদের ভাল লাগে না, "গৃহস্থবাড়ীতে ভাল গান গাও," তখন হরিদাসী গান ধরিল—

"স্মৃতিশাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধ'রে,
ধর্মাধর্ম্ম শিখে নেব, কোন্ বেটি বা নিন্দে করে।"

তখন কমল প্রস্থান করিলেন।

এই সব রকমের সাক্ষ্যের পিছনেই নরনারীর সম্পর্ককে দৈহিক তাড়নার দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—এই উদ্দেশ্য কখনও ভাল কখনও মন্দ। সেইজন্যই ইহা হইতে এই বিষয়ে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহাকে সেই যুগের সমাজের যথাযথ বাস্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। তবে দুইটা কথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।—

প্রথমত বলা যাইতে পারে—এই চিত্রের পিছনে একটা বাস্তব আছে, এবং সেটা এত কামাত্মক না হইলেও মূলত কামাবলম্বী।

দ্বিতীয়, এইসব কাহিনী ও আলোচনাকে সে-যুগের জনমত, মনোভাব ও রুচির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। নরনারীর সম্পর্ক লইয়া সে-যুগে যে-সব ধারণা ব্যাপকভাবে লোকের মনে ছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে এই সাক্ষ্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। আমি উহাকে এইভাবেই নিব।

সেই সাক্ষ্যকে একটা বাস্তব অবস্থার অতিরঞ্জিত ও অংশত বিকৃত কাহিনী বলিয়া মনে করিবার আরও একটা কারণ আছে। পরবর্তী যুগে হিন্দু সতীত্ব ও পাতিব্রত্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছিল, উহার বড়াইও কম হয় নাই। কিন্তু পুরাতন রচনায় ইহার কোন আলোচনা নাই, উল্লেখও অত্যন্ত কম। গার্হস্থ্য-জীবনে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য এ-রকম একটা মামুলী আচরণ বলিয়া ধরা হইত যে, উহা নরনারীর-সম্পর্কিত 'আইডিওলজি'র অন্তর্ভুক্তই হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আসিবার পর এই প্রাচীন হিন্দু ধারণাকে পাশ্চাত্ত্য প্রেমের 'অ্যান্টিথিসিস্' হিসাবে দাঁড় করানো হইয়াছিল। কামই যে নরনারীর সম্পর্কের মূল কথা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা পূর্বযুগে আবশ্যক মনে হয় নাই। বরঞ্চ স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া শুধু একটু মশলাদার করিয়া পরিবেশন করা হইত।

এখন পরবর্তী যুগের সাক্ষ্যের কথা। পূর্ববর্তী যুগের আচরণ ও ধ্যান-ধারণার বিবরণ দিবার জন্য ১৮৫০ সনের পরেকার সাক্ষ্যও কেন গ্রাহ্য তাহার কারণ আমি ইতিপূর্বে দিয়াছি। সাক্ষ্য কি ধরনের তাহার পরিচয় দিব।

আমার জ্ঞানবুদ্ধি হইবার আগেকার কালের তথ্যপ্রমাণ সম্পূর্ণ সাহিত্য হইতে গৃহীত, পরেকার সাক্ষ্য অংশত মুদ্রিত বর্ণনা বা আলোচনা হইতে নেওয়া, অংশত নিজের দেখা এবং শোনা ব্যাপার হইতে।

নূতন যুগের সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্কের যে চিত্র আছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য

হইতে পাওয়া প্রেমের চিত্র। উহাতে কামমূলক বর্ণনা একেবারেই নাই, পুরাতনের প্রসঙ্গেও নাই। তবে পুরাতন যুগের আচার-ব্যবহার ও ধ্যান-ধারণা গৌণভাবে এই সাহিত্যে বর্ণিত আছে। এই বর্ণনা খোলাখুলিও নয়, অভব্যও নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেভাবে আছে তাহাতেও পুরাতন ধারা নিন্দার বিষয় বলিয়াই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা অন্যান্য গল্পকারেরা কেহই পুরাতন দেশাচারকে ভাল বলিয়া দেখান নাই। তাঁহাদের বিবরণকে সেই যুগের আচরণ সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তাহা ছাড়া আমি নিজে বহু জিনিস দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যাহা হইতে পূর্বযুগের ধারণা করা যায়। সেই যুগ হইতে যেসব আচরণ আমাদের যুগেও চলিতেছিল সেগুলি আমার চোখ এবং কান এড়ায় নাই। অবশ্য আমার যখন অল্প বয়স তখন কেহই আমার সম্মুখে অশ্লীল আলোচনা বা রসিকতা করিতে আসিত না, তবু শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত প্রখর হওয়াতে বহু চাপা কথাবার্তা কানে আসিয়া পৌছিত, অশ্লীল ধরণ-ধারনও চোখে পড়িত। প্রৌঢ়ত্বের আরম্ভ হইবার পর পরিচিত ব্যক্তিদের আর বেশী সঙ্কোচ না থাকায় তখন সাক্ষাৎভাবেও অনেক কথা শুনিয়াছি। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা লেখক তাঁহারা আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন, মতও প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুহৃদ্বর বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করিব। তাঁহার কোনও লেখায় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কঘটিত কোন কামাত্মক বিবরণ নাই। কিন্তু তিনি আমাকে এই বিষয়ে গ্রাম্য জীবনের ধারা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাচীন ধারা আমাদের কালেও অল্পবিস্তর অব্যাহত ছিল। এই সব রকমের সাক্ষ্য হইতে যাহা জানিয়াছি এখন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

প্রথমে দেহ-সৌন্দর্যের অনুভূতির কথাই ধরা যাক। প্রাচীন সমাজে উহার কি ধর্ম ছিল? যখন বাঙালী রূপ দেখিয়া বলিতে পারিত—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারল, নয়ন না তিরপিত ভেল"—তা সে পুরুষেরই হউক বা নারীরই হউক —সে যুগ অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছিল। ইহা দেহ-সৌন্দর্যানুভূতির রোমান্টিক দেশীয় রূপ। ইহার পাশে একটা নাগরিক বৈশিক অনুভূতিও ছিল। পুরুষের দিক হইতে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেখানে পাঠককে কবির নাম না বলা সত্ত্বেও তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছেন এই কবি

ভারতচন্দ্র। এই ভারতচন্দ্রেই নারীদের সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিক রূপও দেখিতে পাই।

"দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী-ভূষণ কাঁচলি কষণ
কটির বসন খসে অমনি॥"

—ইত্যাদি।

কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজে বিদগ্ধ হইলেও একটা গ্রাম্য সমাজেই বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যের মধ্যে সে-যুগে প্রচলিত লৌকিক আচরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও সুন্দর রাজকুমারকে দেখিয়া পুরনারীদের মুগ্ধ অবস্থা ও নানা রকমের বক্রোক্তি সংস্কৃত কাব্যেও আছে। যেমন, চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া নাগরীগণ পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল—"দর্শনোন্মত্তে! উত্তরীয়টা তুলিয়া লও," "চন্দ্রাপীড়-দর্শনাসক্তে! কাঞ্চীদাম তুলিয়া রাখ;" "অয়ি যৌবনমত্তে! লোকে যে দেখিতেছে, স্তন আবৃত কর;" "অপগতলজ্জে! শিথিল দুকূল বাঁধো" —ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের উপরের কবিতাটি উহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু নারীগণের পতিনিন্দা অন্য ধরনের, একেবারে স্থূলভাবে গ্রাম্য।

সাধারণ বাঙালী জীবনে রূপের আকর্ষণ এর চেয়েও নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে ধারণাটা একেবারে স্বাভাবিক বলিয়া মানা হইত তাহা এই—রূপ কামের উদ্দীপক মাত্র। সকলেই ধরিয়া লইত রূপবতী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার পর একমাত্র ভাবনাই হইবে কি করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হওয়া যায়।

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি—অন্তত এতটুকু ভদ্রস্থতা রাখিয়া রূপ দেখিবার দেশাচারসম্মত জায়গা ছিল নদী বা দীঘির ঘাট। গ্রামেই হউক, আর শহরেই হউক, এটাই ছিল রূপের হাট। "শুন হে পরাণ সুবল সাঙাতি, কে ধনী মাজিছে গা, যমুনার তীরে বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা"—ইহারই ইতরীকৃত কোরাস সর্বত্র শোনা যাইত। তাই শরৎচন্দ্র "পণ্ডিতমশাই" গল্পে কুঞ্জের শাশুড়ীকে দিয়া কুসুমকে এই কথা বলাইয়াছিলেন—"তুমি যে এলো চুলে ভিজে কাপড়ে ঘাট থেকে এলে তাতে বল দেখি মুনির মন টলে কিনা!"

ব্যঙ্গ, বিশেষ করিয়া রং চড়ানো ব্যঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের বিশেষ রস ছিল। তাই তাহাতে স্নানের ঘাট লইয়া বহু রসিকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিত কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।"

ঘাটে বা ঘাটের পথে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যুবাবয়সে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গল্প "রাজমোহনের স্ত্রী"তে এই ব্যাপারটার যে বিবরণ দিয়াছেন, রূপ সম্বন্ধে বাংলাদেশের জনপ্রচলিত মনোভাব বুঝাইতে হইলে উহার অপেক্ষা ভাল দৃষ্টান্ত পাইব না। তাই অনেকটা তুলিয়া দিতেছি।

দুইটি যুবক (সম্পর্কে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই হয় ; একটি গ্রাম্য বড়লোক, নাম মথুর ; অপরটি কলিকাতায় শিক্ষিত, নাম মাধব) দুইটি অল্পবয়স্কা মেয়েকে ঘাট হইতে জল লইয়া ফিরিতে দেখিল। বয়সে বড় মেয়েটি গ্রামের কন্যা, অপরটি বধূ—অপরূপ সুন্দরী। বড়টি ছোটটিকে এই বলিয়াই ঘাটে লইয়া গিয়াছিল—"এখন এস দেখি, মোর গৌরবিনী, হাঁ-করা লোকগুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।"

হঠাৎ হাওয়াতে বধূটির ঘোমটা সরিয়া যাওয়ায় মাধব ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকায়, স্থূলদেহ, গলায় হার পরা গ্রাম্য দাদাটি বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ, তুমি ওকে চেন।" ইহার পরে যে কথাবার্তা হইল সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

মাধব—"চিনি।"

মথুর—"চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এইখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয় দিন! চেন যদি, তবে কে এটি?"

মাধব—"আমার শ্যালী।"

মথুর—"তোমার শ্যালী? রাজমোহনের স্ত্রী? রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখনও দেখি নাই?"

মাধব—"দেখিবে কিরূপে? উনি কখনও বাটীর বাহির হয়েন না।"

মথুর—"হয়েন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন?"

মাধব—"কি জানি!"

মথুর—"মানুষ কেমন?"

মাধব—"দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর।"

মথুর—"ভবিষ্যদ্‌বক্তা গণকঠাকুর এলেন আর কি! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল?"

মাধব—"ভাল মানুষ কাহাকে বল?"

মথুর—"আঃ কলেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা বলা ভাল। বলি ওর কি—"

মাধবের বিকট ভ্রূভঙ্গি দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মাধব গর্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে এত বক্তৃতার আবশ্যক কি?"

মথুর—"বলিয়াছি তো দু'পাতা ইংরাজী উল্টাইলে ভায়ারা সব অগ্নিঅবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না তো কাহার কথা কব? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব? যাক, চুলায় যাক; মুখখানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহনে গোবর্ধন এমন পদ্মের মধু খায়।"

এই তো গেল বনিয়াদী বাংলায় স্ত্রীলোকের রূপ সম্বন্ধে পরপুরুষের আগ্রহ। তারপর স্বামীদের ভাবটা কি রকম দেখা যাক। রাজমোহনের স্ত্রী ঘরের কাছে গিয়াই দেখিল স্বামী কালমূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কথাবার্তা এইরূপ হইল—

রাজমোহন—"তবে রাজরানীর কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

স্ত্রী—"জল আনিতে গিয়াছিলাম।"

রাজ—"জল আনিতে গিয়েছিলে! কাকে বলে গিছলে, ঠাকুরাণি?"

স্ত্রী—"কাহাকেও বলে যাই নাই।"

রাজ—"কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?"

স্ত্রী—"করেছ।"

রাজ—"তবে গেলি কেন, হারামজাদি!"

স্ত্রী—"আমি তোমার স্ত্রী। গেলে কোনো দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন রাজমোহন স্ত্রীকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিল। অবলা বালা

কিছু বুঝিলেন না ; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রীঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্বমত বজ্রনিনাদে কহিল, "তোরে লাথিয়ে খুন করব।"

এই ছিল পুরাতন বাংলায় ঘরে-বাহিরে রমণীর রূপের সম্মান।

রূপ সম্বন্ধে এই মনোভাবের জন্যই যাঁহারা ধার্মিক, তাঁহারা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ তো করিতেনই না, এমন কি রূপ কিছু নয় গুণই সব, এই সদুপদেশও দিতেন। রূপ সম্বন্ধে মুগ্ধতা পরের যুগে পাপ বলিয়াই মনে হইত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই নীতিকথা আরও উগ্রভাবে প্রচার করা হইয়াছিল। আমার অভিজ্ঞতা হইতে উহার পরিচয় দিতেছি।

তখন বাঙালীকে বীর করিবার জন্য আখড়ায়-সমিতিতে ডন-বৈঠক, কুস্তি, লাঠি খেলা ইত্যাদি ব্যায়াম করানো হইত, অন্যদিকে মানসিক ব্যায়ামও কম হইত না। আমাদের সকলকেই ব্রহ্মচর্য লইয়া দাদাদের শাসনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিতে হইত।

এই ব্রহ্মচর্যের একটি অঙ্গ ছিল একখানি "পাপের খাতা" রাখা। দিনে কতবার কত রকম কুচিন্তা মনে হইতে পারে, আর কতবার কোন্ দুর্বলতার বশে কি কুকর্ম করা যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা উহাতে থাকিত। অপরাধ হইয়া থাকিলে সেই সব পাপের ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতীকে দিনের শেষে ঢ্যাঁরা কাটিতে হইত। সেই সবের সংখ্যা ও গুরুত্ব দেখিয়া শোধনের জন্য উচিত-ব্যবস্থা হয় নিজেদের কিংবা দাদাদের করিতে হইত। অন্য পাপের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একটা শারীরিক পদস্খলনের পরই যে পাপটির দ্বিতীয় স্থান ছিল সেটি—"রূপমোহ"।

আমিও এই পাপের খাতা কিছুদিন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই বয়সেও একটু রসবোধ থাকায় চালাইতে পারি নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আরও উগ্র স্বদেশী ছিল, হাসি-তামাশা বা এই ধরনের দুর্বলতাও তাহার কম ছিল। গম্ভীর প্রকৃতির প্রমাণ হিসাবে তাহার দেরাজে কখনও ছোরা পাওয়া যাইত। একদিন মা তাহার দেরাজ খুলিয়া তাহার পাপের খাতাটি পাইলেন, এবং খুলিয়া দেখিলেন, "রূপমোহে"র ঘরে অসংখ্য ঢ্যাঁরা। বারো-তেরো বৎসরের পুত্রের এত রূপমোহ তাঁহার সহ্য হইল না, ডেঁপো. জ্যাঠা ইত্যাদি বকাবকি করিয়া খাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

কিন্তু বলিব, এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফল খারাপ হয় নাই। যখন যুবা বয়সে কলিকাতায় পড়ি, তখন কখনও কখনও মা আসিয়া আমাদের লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। এক সময়ে আমরা উত্তর কলিকাতার অতি-রক্ষণশীল পল্লীতে থাকি। পাশের বাড়ির গৃহিণী আসিয়া মাকে বলিলেন, "দিদি, তোমার ছেলেরা কি ভালো! একদিনও জানলায় দেখতে পাই নে!" তিনি ঝি-বউ লইয়া ঘর করিতেন, সুতরাং প্রাণে ভয় ছিল।

তখনকার দিনে ছাতে উঠা, দুরবীন বা ক্যামেরা রাখা যুবকদের চরিত্রহীনতার লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাস কলিকাতার বহু বাঁদর এই দুইটি জিনিস খারাপ অভিসন্ধি ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যেই রাখিত না। আমাদের নারীদেহ সম্বন্ধে কৌতূহলের অভাব মফঃস্বলের, বিশেষ করিয়া—বাঙাল ছেলের লক্ষণ বলিয়াই ধরা হইত।

কিন্তু পরজীবনে ক্যামেরা লইয়া আমাকেও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। আগেই উল্লেখ করিয়াছি, ১৯১৭ সনে আমি শুঁড়োতে থাকিতাম। কলিকাতার উপকণ্ঠে যে-সব পল্লী ছিল সেগুলিতে নূতন যুগের ধাক্কা প্রায় লাগে নাই বলিলেই চলে, এগুলি অত্যন্ত রক্ষণশীল ও গোঁড়া ছিল। এই পাড়ায় আধুনিকত্ব দেখাইতে গিয়া বিব্রত হইয়াছিলাম।

আমার এক ভাই একদিন কোথা হইতে একটা ক্যামেরা লইয়া আসিয়াছিল। শুধু ক্যামেরাটাই ছিল, ফিলম্ ছিল না। আমরা বারান্দায় গিয়া দোতলা হইতে সামনের একতলা বাড়ীর ছাতের দিকে ক্যামেরা ধরিয়া ফোকাস্ ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেছিলাম। বাড়ীটা এক ধোপা পরিবারের, উহাতে থাকিত বিধবা ধোপানী কর্ত্রী, বড় ছেলে ও তাহার স্ত্রী, আর এক ছেলে যুবাবয়সী, চুয়াড়ে চেহারা, অবিবাহিত। বাড়ীটা তাহাদের নিজেদের। আমি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিতাম।

ক্যামেরা ধরিবার সময়ে লক্ষ্য করি নাই যে, ছাতে যুবতী ধোপাবধূ কাপড় শুকাইতে দিতেছে। হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনিয়া চাহিয়া দেখি, গলির ওপারে ছাত হইতে তাহার দেবর আমাদিগকে গালাগালি করিতেছে ও শাসাইতেছে। তাহার কথা হইতে বুঝিতে পারিলাম তাহারা ধরিয়া লইয়াছে, আমরা ধোপাবধূর ছবি তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

আমরা যতই বলি, আমাদের এরকম কোন অভিসন্ধি ছিল না, এমন কি ক্যামেরায় ফিল্ম্ পর্যন্ত নাই, ততই সে আরও চেঁচাইতে লাগল। ততক্ষণে নীচে লোক জমিয়া গিয়াছে। আমার এক ভাই একটু মারামারিপ্রিয় ছিল।

সে তখন রাস্তায় নামিয়া গেল, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ধোপা-দেবরও হাত উঠাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, মারামারি লাগে আর কি! হাতাহাতির ব্যাপারে ভাই-ই উৎসাহী। আমি শুধু পিছনে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। নূতন পাণ্ডিত্যের ফোঁটা তখন কপালে চড়চড় করিত, তাই ধোপা-যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বৌদিদি কি ভেনাস ডি মিলো যে আমরা তার ফটোগ্রাফ তুলব?" রামী রজকিনীর কথা তুলিলাম না, তাহা হইলে উল্টা উৎপত্তি হইত। বারান্দায় অন্য ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বন্দুকটা দাও তো! ওদের গুলি করে মারব।" কোথায় বন্দুক? তবে একটু ভালভাবে থাকিতাম বলিয়া হয়ত কথাটা ধোপারা একেবারে অবিশ্বাস করে নাই। বিধবা ধোপানী ছাত হইতে চেঁচাইতে লাগিল, "ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে দেমাক দেখ না! বন্দুক দিয়ে মারবে!"

পাড়ার প্রবীণজনেরা আসিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ইন্দোফরাসী বন্ধুত্ব-সভার অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য গরদের পাঞ্জাবি পরিয়া প্যাসনে-চশমা আঁটিয়া উহার চওড়া ফিতা গলায় ঝুলাইয়া, মিহি ধুতি ও সেলিম-জুতা পরিহিত হইয়া চন্দননগর যাত্রা করিলাম। সেখানে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়, কালিদাস নাগ, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রভৃতি ফরাসীভাষাবিদ্ বাঙালীরা উপস্থিত ছিলেন। চন্দননগরের গভর্নরের বাড়ীতে অতিথি। কালচারাল জাঁকজমক খুবই হইল, কিন্তু সমস্তক্ষণ সকালের ঝগড়ার গ্লানিটাও জামাতে তেলের দাগের মত লাগিয়া রহিল।

রূপের যথার্থ আদর কি, তখনকার বিবরণ হইতে তাহার আভাস দিয়া রূপের প্রসঙ্গ শেষ করিব। একটি পুরাতন বই-এ পাই—

> "যখন চন্দ্রবদনা কন্যার যৌবন ষোড়শ কলা পূর্ণ হওয়াতে ষোড়শী পূর্ণ যৌবনবতী হয় তখন গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহু গ্রহণের শঙ্কা তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী চণ্ডালিনী দূতীর আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ যৌবনাগতে ঐ বিধুমুখীর রূপের সৌন্দর্য্য ও মনের অধৈর্য্য দেখিয়া কদর্য্য বৃত্তিজীবিনী কুটনী, তাহারাই গ্রহণ দ্বারা গ্রহণ করিতে উপস্থিতা হয়। তন্মধ্যে বিশেষত নাপিতিনী যিনি সহজেই ধূর্ত্তা।"

একেবারে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যে, বিশেষ করিয়া আমেরিকাতে মিস্ ইউনিভার্সদের রূপ প্রচার করিবার জন্য 'ইম্প্রেসেরিও' রাখার রেওয়াজ হইয়াছে। ইহারা কি করে তাহার স্পষ্ট ধারণা আমার নাই। তবে সে-যুগের কুটনীরূপিণী

'ইম্প্রেসেরিও'রা কি করিত তাহার একটু পরিচয় দিব। তাহারা নাগরের নিকট গিয়া বলিত :—

"কুলকামিনীর অঙ্গে কর নিরীক্ষণ।
সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ ॥
ভালে ভালে চন্দননগর শোভা পায়।
চুঁচুড়ার সং দেখ চুলের চূড়ায় ॥
সিঁতীর বাগানে বাবু যাপ নিতি নিতি।
কপাল জুড়িয়া আছে দেখ সেই সিঁতী ॥
ভুরুষুট পরগণা ভুরুতে নির্যাস।
তার গুণ কহিব কি ভারতে প্রকাশ ॥
কানপুর শুনেছ কেবল মাত্র কানে।
স্বচক্ষে দেখহ বাবু যুবতীর স্থানে ॥
শোনা আছে দানাপুর দেখা নাই তায়।
সোনাদানাপুর পাবে নারীর গলায় ॥
নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার।
প্রতি পথে কতশত মজার বাজার ॥
কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহকার।
বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার ॥
এ কলিকাতায় সব দেয় রাজকর।
সেই স্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর ॥
কটি আভরণছলে দেখ কাঞ্চিপুর।
চন্দ্রকণা চন্দ্রহারে দেখিবে প্রচুর ॥
অপূর্ব্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা।
শিল্পবিদ্যা সেখানে কত আঁকাবাঁকা ॥
কি দেখেছ রসরাজ এ কোন্ নগর।
রমণীর অঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর ॥

—ইত্যাদি।

এই দালালি স্থূল, কিন্তু একেবারে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দালালি কি ইহার চেয়ে সূক্ষ্ম? যাঁহারা ফিরিঙ্গি বানিয়া প্রাচীন বাংলাকে অতি নূতন বাংলার তুলনায় হেয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। আমার

কাছে দুই-ই সমান।

এইবার সেই যুগে নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি ছিল, তাহার আলোচনা করিব। উহার অবলম্বন ছিল তিন শ্রেণীর নারী—অর্থাৎ এই সম্পর্ক স্বীয়া, পরকীয়া, সামান্যবনিতা, ইহাদের যে-কোনটির সহিত, বা একই সঙ্গে সকলেরই সহিত স্থাপিত হওয়া সকলেই স্বাভাবিক মনে করিত।

প্রথমে স্বীয়ার কথা বলিব। পুরাতন বাঙালী সমাজে দাম্পত্যজীবন প্রাচীন হিন্দু ধারারই অনুবর্তী ছিল। তাহাতে প্রাচীন কালের বৈদগ্ধ্য ও শক্তি অবশ্য ছিল না। কিন্তু একটা যে আর একটা হইতে উদ্ভূত এবং দুইটাই যে মূলত এক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুরাতন ধারাতে (কি প্রাচীন হিন্দুসমাজে, কি পরবর্তী বাঙালী সমাজে) স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের সব দিক মিলাইয়া, সমন্বয় করিয়া একীভূত একটা সম্পর্ক কখনই গড়িয়া উঠে নাই। উহার মধ্যে সম্পর্কটার বিভিন্ন দিক আলাদা আলাদা কোঠায় থাকিত। খড় কোঠাগুলির উল্লেখ সংক্ষেপে করিতেছি।

প্রথম কোঠা বিবাহের সামাজিক কর্তব্যের জন্য রিজার্ভ করা, অর্থাৎ উহা সন্তানোৎপাদন ও গৃহস্থালির ক্ষেত্র। ইহাতে অল্পবয়স্ক দম্পতির কোনও হাতই থাকিত না—উহা সমগ্র পরিবারের অধীনস্থ ছিল, কর্তা ও কর্ত্রীদের নির্দেশে চলিত। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সত্যকার কোনও পারিবারিক জীবন প্রাচীন সমাজে দেখা যাইত না।

দ্বিতীয় কোঠা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর স্নেহের, প্রেমের নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু দম্পতির বেলাতে এই স্নেহ কখনও জন্মিত না। স্বামী ও স্ত্রী, পরস্পরের সহিত অল্পবিস্তর মনোমালিন্য ও একজন অন্যের প্রতি কমবেশী উদাসীনতা লইয়া সারাজীবন কাটাইত। কিন্তু ইহাতে সন্তানোৎপাদনের কোনও ব্যাঘাত হইত না। ইহার কারণ তৃতীয় কোঠা।

এই তৃতীয় কোঠা, স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। উহা কাম পরিতৃপ্তি ছাড়া অন্য স্তরে উঠিত না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে ভদ্র-মনোবৃত্তিসম্পন্ন নরনারীরও কোনও সঙ্কোচ ছিল না। এটা প্রাকৃত কর্মকাণ্ড বলিয়া সকলেই মানিয়া লইত। সে-যুগে স্বামী স্ত্রীর দেখা ও মিলন রাত্রিতে ভিন্ন হইত না বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্ক কামাবলম্বী হইবার আরও একটা কারণ ছিল।

তবে যেখানে কামেও স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা পুরাপুরি হইত না, সেখানে কাম আরও নীচ রূপ ধরিত। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী গরজ বুঝিয়া দাম্পত্যজীবনে থাকিয়া

গহনা-কাপড়-পয়সা আদায়কারিণী গণিকার বৃত্তি চালাইত, এবং স্বামীও ধর্মভ্রষ্ট না হইয়া এবং নিজে ব্যাধি না আনিয়া থাকিলে ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ভয় না রাখিয়া বারবনিতা ভোগ করিতেছে মনে করিয়া খুশী হইত। কেহ কেহ ষোল আনা খুশী না হইলেও 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এই কথা স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত।

বহুবিবাহ যতদিন প্রচলিত ছিল, ততদিন স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কাম ছাড়া প্রেম দেখা দিবার কোনও উপায় ছিল না। সত্যকার ভালবাসা থাকিলে কেহ এক রাত্রির পর আর এক রাত্রিতে বিভিন্ন পত্নীতে উপগত হইতে পারে না। অথচ বহুবিবাহ করিয়া থাকিলে বিভিন্ন রাত্রির কথা দূরে থাকুক, এক রাত্রিরই বিভিন্ন প্রহরে পত্নীদের উপরোধে বা ব্যগ্রতায় একাধিক পত্নীতে উপগত হইতে হইত—বিশেষত প্রবাস হইতে বাড়ী ফিরিলে।

ভারতচন্দ্রে ইহার বেশ একটা রসিকোচিত বর্ণনা আছে। ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী হইতে বাড়ী আসিয়া পদ্মমুখী চন্দ্রমুখী দুই পত্নী লইয়া বিশেষ বিপদে পড়িলেন,—

"শুনি মজুমদার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিল॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড়জনে চায়॥"

দুই পত্নীই সাধী-মাধী দাসী সহ দেউড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ইশারাতে ছোট পত্নীর সহিত একটা ফয়সালা করিয়া মজুমদার দাসীদের বলিলেন,—

"দুজনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক্।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥"

অবশ্য বড় রাণীই ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং মর্যাদার খাতিরে মজুমদারও তাহাই উচিত মনে করিলেন। কিন্তু সেখানে মন অবিকল রাখিয়া কর্তব্য সাধন করিতে পারিলেন না।

"ছেলেপিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।

যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর ॥"

বেশী দেরি করিলে পদ্মমুখী কি বলিবে তাহা ভাবিয়া মজুমদার চিন্তিত,—

"রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥"

এই ধরনের দাম্পত্যজীবনে কাম ভিন্ন প্রেম কি করিয়া আসিতে পারে? বহুবিবাহের সুখ যেমন, দায়িত্বও তেমনই। তাই 'দেবীচৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীকে দিয়া বলাইয়াছিলেন—

"বুড়ীর কথাটাই শোন্ না; কি জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার মালা জপা হলো না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক, আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাকলে ত কখনও 'না' বলিত না।"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল,—

"ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হোক—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?"

এর পর পরকীয়া-চর্চা সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া অত্যন্ত দরকার। যে-কোনও দেশের ভদ্র সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যভিচার বা স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত অন্য নীতিবিরুদ্ধ আচরণ কতটা পরিব্যাপ্ত, তাহা নিরূপণ করা সব সময়েই দুরূহ। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজে আবার একটা বাহ্যিক কড়াকড়ি বা বজ্র-আঁটুনি আছে, যাহার জন্য অনাচার গোপন রাখাই যথেষ্ট বলিয়া ধরা হয় এবং ভদ্রব্যক্তির জানি-না জানি-না ভাব ধরিয়া থাকাই রেওয়াজ। তাই এই সব ব্যাপারে 'স্ট্যাটিস্টিক্স্' পাওয়া দূরে থাকুক, কানাঘুষা ভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়াও কঠিন। এই কানাঘুষাও খানিকটা নিন্দা বা তামাশার জন্য কেচ্ছা বা কেলেঙ্কারি পরিবেশন। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

পক্ষান্তরে সমাজ-সংস্কারকেরা একটু বাড়াইয়া বলিতেন। যেমন, প্রথম যুগের ব্রাহ্মরা পুরাতন হিন্দুসমাজকে অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। তবুও তাঁহাদের মত খানিকটা বাদসাদ দিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, কারণ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া সামাজিক অনাচার নানাদিকে অসহ্য হওয়ার দরুনও তাঁহারা

হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মত ও সাক্ষ্যকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আরও মনে রাখা উচিত ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা সব সময়েই সীমাবদ্ধ। একজন অবস্থাচক্রে বহু খারাপ জিনিস দেখিয়া থাকিতে পারে যাহা অন্যের গোচরে আসে নাই, এবং যাহাকে সাধারণভাবে বহুপ্রচলিত বলা চলে না। পুলিসের দারোগা বা বিচারকের চোখ দিয়া দেখিলে সমাজের যে চিত্র দেখা যায়, তাহাকে যথাযথ চিত্র বলা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চণ্ডীচরণ সেন ব্রাহ্ম এবং মুন্সেফ ছিলেন। তিনি তাঁহার একটি রায়ে বলেন যে, হিন্দু বিধবাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন অসতী। ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটু ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করিয়াছিলেন। একটা হাসির গল্প বলিয়া তিনি এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরাও চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করিব—যদি নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়ে উটিকেও টানিয়া লউন।" ইহা ১৮৮৮ সনে লেখা।

এখন মুখ্য প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক। উপরে নীতিবিরুদ্ধ আচরণের কথা বলিয়াছি, সমাজবিরুদ্ধ আচরণের কথা বলি নাই। দুইটার মধ্যে প্রভেদ আছে। নীতিবিরুদ্ধ আচরণ সমাজবিরুদ্ধ না হইলে, অর্থাৎ প্রকাশ্য না হইলে, সেকালের সমাজ ইহা লইয়া বেশী গোল করিত না। বরঞ্চ নীতির ব্যাপারে তখনকার দিনে একটু শৈথিল্যই ছিল। এই ফস্কা গেরো বজ্র-আঁটুনিরই উল্টা দিক। দুশ্চরিত্র লোকে বেলেল্লাপনা না করিলে, ভদ্র ব্যবহার হইতে এমন কি সামাজিক মর্যাদা হইতেও বঞ্চিত হইত না। কিন্তু কোনও অনাচার শুধু নীতিবিরুদ্ধ না হইয়া যদি সমাজবিরুদ্ধ হইত তখন সেখানে কঠিন শাস্তি হইত। তাই শহরের সমাজে থাকিয়া সমাজবিরুদ্ধ কুকাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, গ্রামের তো কথাই নাই। তবে সমাজের বাহিরে চলিয়া গেলে সমাজ কিছুই বলিত না।

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের জন্য ভদ্রসমাজ ও বেশ্যাসমাজের মধ্যে 'দোমি-মঁদ' বলিয়া কোনও জায়গা ছিল না। এখন ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষাতেও 'দোমি-মঁদ' প্রায় বারাঙ্গনা সমাজ বলিয়া প্রচলিত, অন্ততপক্ষে রক্ষিতা সমাজ ত বটেই। আসলে কথাটা যখন প্রথমে ১৮৫৫ সনে আলেকসাঁদর দ্যুমা ফিজ্ ব্যবহার করেন তখন উহার অন্য অর্থ দিয়াছিলেন। উহার আদি অর্থ ওয়েবস্টার অভিধান হইতে দিতেছি,—

"The class of society…of women in good circumstances

but cut off from virtuous women by public scandal."

এই 'পাবলিক স্ক্যাণ্ডালে'র জন্য 'দোমি-মঁদে'ও না গিয়া একেবারে অভিজাত সমাজে মর্যাদা রাখিয়া মেলামেশা ইউরোপে সম্ভব ছিল। মাদাম দ্য স্টায়েলের একাধিক প্রণয়ী ছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার মান-মর্যাদার কোনও হানি হয় নাই, তাঁহার কন্যার সহিত ফ্রান্সের বিশিষ্ট অভিজাত সন্তানের বিবাহ হইতেও কোন বাধা জন্মে নাই। এই বংশ বিখ্যাত দ্য ব্রয় বংশ। একদিন ডিউক মরিস দ্য ব্রয় ও প্রিন্স লুই দ্য ব্রয়ের ভগিনীর সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল। (ইনি নিজে একজন কাউন্টেস্, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা, তাঁহার দুই ভ্রাতা পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।) তিনি আমাকে বলিলেন, মাতার দিকে তিনি মাদাম দ্য স্টায়েলের সন্তান। মাদাম দ্য স্টায়েলের সহিত যে ব্রয় বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ, তখন প্রথম শুনিলাম। একটু আশ্চর্য হইয়াছিলাম বই কি!

এইরূপ প্রণয়সম্ভূত পুত্রদেরও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে যে বাধা জন্মিত তা নয়। কাউন্টেস ভালেভ্স্কার গর্ভপ্রসূত নেপোলিয়নের পুত্র ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব হইয়াছিলেন, রানী অরতাঁসের প্রণয়ী-সম্ভূত পুত্রমণি ফরাসী সমাজে এবং রাজনৈতিক জীবনে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। নিজের মাতার প্রণয়ী-সম্ভূত বলিয়া, তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার প্রতি বিরাগ দেখান নাই।

সেদিন লণ্ডনে একটি কৌতূহলজনক সংবাদ শুনিলাম। এক বাড়িতে খাইতে গিয়াছি। সেখানে অতি সুশ্রী, সুশিক্ষিত এবং অতি সুবেশও বটে—একটি ভারতীয় যুবকও ছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলিলেন যে, মায়ের দিক হইতে তিনি চতুর্দশ লুই-এর বংশধর। আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ তরফ, সিধা না বাঁকা?" যুবকও হাসিয়া উত্তর দিল, জারজ তরফেই বটে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ উপপত্নীটি?" যুবক বলিলেন, "মাদাম দ্য মঁতেস্প।" এইটির উপর আমার বিশেষ বিরাগ, তাই মন্তব্য করিলাম, "লা মঁতেস্প? লা ম্যাঁতেনোঁ হইলেও কথা ছিল না।" সকলেই অবশ্য হাসিলেন।

এ-রকম একটা মাঝেকার সমাজ আধুনিক হিন্দু সমাজে কখনই ছিল না। সুতরাং সমাজবিরুদ্ধ কাজের ফলে চিরকালের জন্য সমাজের বাহিরে যাইতে হইত।

কিন্তু এ ব্যাপারে হিন্দু সমাজ পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য করিত, তাহা ঘোরতর অবিচারের মত। পুরুষ সমাজের বাহিরে গিয়া অনাচার করিলেও সমাজে তাহার স্থান অব্যাহত থাকিত, সমাজ তাহাকে বাহির করিয়া দিত না।

কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাতে অন্য বিচার। এই অবিচারের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,

"স্ত্রীলোকদিগের উপর যে-রূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সে-রূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবিদাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।"

অবশ্য এই বৈষম্য কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল, এবং আছে। তবে পুরাতন বাঙালী সমাজে খুবই বেশী ছিল।

সুতরাং কুলনারী—কুমারী, সধবা বা বিধবা যাহাই হউক না—প্রবৃত্তির বশে, বা অনেক সময়ে অর্থের প্রলোভনে কিংবা পারিবারিক অত্যাচারে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইলে তাহাকে কুলত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। চলিত ভাষায় ইহাকে বলা হইত 'বাহির হইয়া যাওয়া'। ইহাদের শেষ গতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই হইত বেশ্যালয়ে। এই বিষয়ে বহু কথা পুরাতন বাংলা বই-এ আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই ব্যাপার লইয়া গল্প লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটির উল্লেখ করিব। এই ধরনের কুলত্যাগ প্রায়শই না ঘটিলেও সামাজিক জীবনের একটা 'এণ্ডেমিক' ব্যাপার ছিল। আমাদের বাড়ীতে আমার অল্প বয়সে একটি ব্রাহ্মণী পাচিকা ছিল। উহার চেহারা, চরিত্র ও ব্যবহারে কোনদিন ভদ্রস্থতা বা সচ্চরিত্রতার ত্রুটি দেখি নাই। কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল যে, সে কুলত্যাগিনী। আমরা জানিয়াছি উহা টের পাওয়া মাত্র সে যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। যে-বাড়ীতে সে ভদ্রকন্যা হিসাবে রাঁধুনী হইয়াও সম্মানিত ছিল, সে বাড়ীতে কলঙ্কিনীর খ্যাতি লইয়া থাকা তাহার প্রাণে সহিল না।

এই ব্যাপারের অতি করুণ একটি সত্য ঘটনার বিবরণ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মজীবনীতে দিয়াছেন। সেটি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

শিবনাথ তখন চাঁপাতলার দীঘির পুবদিকে থাকেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে এক ছুতোর-জাতীয়া বিধবা থাকিত, তাহার ছয়-সাত বৎসরের একটি মেয়ে, সেও বিধবা। শিবনাথ একটি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি নিজের মেয়েরও বিবাহ দিতে চাহিল। শিবনাথ লিখিতেছেন,—

"মেয়েটি সকাল বিকাল আমাদের বাড়ীতে আসিত ও আমাদের সঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিল। আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটিকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই, আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ও মেয়েটি কে হে? বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো।'

"আমি বলিলাম, 'ওটি পাশের বাড়ীর একটি ছুতোরের মেয়ে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বস্‌তে ভালবাসে। ওটি বিধবা, ওর মা বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।'

"এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চমকাইয়া উঠিলেন, 'বল কি। এইটুকু মেয়ে বিধবা?' তাহার পর তাহাকে ডাকিলেন, 'আয় মা, আমার কোলে আয়।'

"সে তো লজ্জাতে যাইতে চায় না, আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বুকে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন। শেষে যাইবার সময় মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পাল্‌কী করিয়া তৎপর দিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন, 'মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।' "

একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটির মার সহিত শিবনাথের পরে আর দেখা হয় নাই। ইহার বহু বৎসর পরে তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সমাজের লাইব্রেরী ঘরে থাকেন, তখন তিনি একটি চিঠি পাইলেন,—

"বহু বৎসর পূর্ব্বে চাঁপাতলার দীঘির কোণের এক বাড়ীতে পাড়ার একটি সাত-আট বৎসরের বালিকা আপনাকে দাদা বলিত ও কোলেপিঠে উঠিত, আপনার হয়ত মনে আছে। আমি সেই হতভাগিনী। আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি। একবার দয়া করিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।"

শিবনাথ কর্তব্য মনে করিয়া তখনই গেলেন, এবং সাক্ষাতের পর মেয়েটির পরবর্তী ইতিহাস শুনিলেন। চাঁপাতলা ছাড়িয়া যাইবার পর তাহার মা আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যায় নাই, ও মেয়েটি বড় হইলে তাহাকে পাপপথে লইয়া যায়। সে এক ব্যক্তির রক্ষিতা হিসাবে আর্থিক দিক হইতে সুখেই ছিল, দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি পরে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার শুধু একখানা বাড়ী ছাড়া আর কিছু না থাকাতে বিপদসমুদ্রে পড়িয়া শিবনাথকে স্মরণ করিয়াছে। তিনি সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, মেয়েটি অন্য পথ ধরিতেছে। আবার শিবনাথের নিজের বিবরণ উদ্ধৃত করিব—

> "একদিন গিয়া দেখি, একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের মেয়ে কোথা হইতে জুটিয়াছে, তাহার একটা ইতিবৃত্ত আমাকে বলিল, তাহা এখন স্মরণ নাই। কিন্তু ঐ মেয়ের ঘরে ফরাস বিছানা তাকিয়া বাঁধা হুঁকা প্রভৃতি দেখিলাম। তখন মনে হইল, নিজের রূপযৌবন গত হওয়াতে অর্থোপার্জনের আশায় আনিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, 'এই আমার তোমার ভবনে শেষ আসা।'
>
> "আমার এই ভগিনীকে অনেকদিন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহার বিষয় স্মরণ করিয়া এখনও দুঃখ হয়। সে এতদিন পরে 'দাদা' বলিয়া স্মরণ করিল, তাহাকে যে হাতে ধরিয়া বিপথ হইতে সুপথে আনিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ রহিয়া গেল।"

কিন্তু আপাতত আমার আলোচ্য বিষয় সমাজের ভিতরে অনাচার। এ বিষয়ে কানাঘুষা ছাড়া অন্য খবর পাওয়া যে কঠিন, তাহা আগেই বলিয়াছি। তবে কানাঘুষার পরিমাণ যাহা ছিল তাহা ভাবিবার বিষয়। নিন্দা ইত্যাদি ছাড়িয়া দিলেও বাকী খানিকটা থাকিত, যাহা অগ্রাহ্য করা যায় না। আমি অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, চার আনা বা ছয় আনা কেচ্ছা সত্য বলিয়া ধরিলে পুরাতন বাঙালী সমাজের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

সেই সমাজে পারিবারিক জীবনের কাঠামোর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কঘটিত অনাচার যে ছিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। ইহা সাধারণত চলিত আত্মীয়তায় আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে। একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দিব। সেকালে মেয়েদের বিবাহ এত অল্প বয়সে হইত যে, কুমারী সংক্রান্ত অনাচার বেশী হইবার কোন সুযোগই ঘটিত না। অনাচার দেখা যাইত বিবাহিত ও বিধবা নারীদের

সম্পর্কে। প্রথমে বিবাহিত সধবা নারীদের কথা ধরা যাক।

সেকালে বাঙালীদের মধ্যে 'শাশুড়ে' এবং 'বৌও' বলিয়া দুটি গালি শোনা যাইত, উহার প্রথমটির অর্থ শাশুড়ীরত, ও দ্বিতীয়টির অর্থ পুত্রবধূরত। শ্বশুর-পুত্রবধূর ব্যাপার সম্ভবত খুবই কম দেখা যাইত, কিন্তু শাশুড়ী-জামাই ঘটিত ব্যাপার বিরল ছিল না। আমার অল্পবয়সেও দুই একটি অবিসম্বাদিত ঘটনা দেখিয়াছি। ইহার কারণ অবশ্য বালিকা কন্যার বিবাহ। পুরুষের বিবাহ অপ্রাপ্ত বয়সে না হইলে অনেক সময়ে শাশুড়ী ও জামাতার মধ্যে বয়সের তারতম্য শাশুড়ী ও শ্বশুরের বয়সের তারতম্য হইতে কম হইত। তখন দুই-এর মধ্যে একটা নীতি ও রীতি-বিরুদ্ধ প্রণয় হওয়া একেবারেই বিচিত্র বলা চলে না।

এই জন্য সে-যুগে শাশুড়ী প্রায়ই জামাতার সহিত আলাপ করিতেন না, এবং সম্মুখে আসিলেও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতেন। আমার দিদিমা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও আমার পিতার সহিত আলাপ করেন নাই। পরে যখন দুই একটা কথা বলিতে শুনিতাম, তখনও দেখিয়াছি তিনি জামাতাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এই অনাচার ছাড়া দেবর-ভ্রাতৃবধূ এমন কি ভাসুর-ভাদ্রবৌএর মধ্যেও অনাচার দেখা যাইত। দেবর-ভ্রাতৃবধূর 'ফ্লার্টেশ্যন' সামাজিক আচার-ব্যবহারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহা কোনও কোনও সময়ে দৃষ্টিকটু বা শ্রুতিকটু হইলেও কেহ দোষ ধরিত না। কিন্তু ব্যাপার যে সময়ে সময়ে আরও দূর পর্যন্ত গড়াইত তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

কিন্তু সমাজের মধ্যে এই ধরনের অনাচার বেশী হইত অল্পবয়স্কা বিধবার সম্পর্কে। তাহাদের পদস্খলন যখন হইত, তাহা যে নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত বাঙালী সমাজ জুড়িয়া একটা বিরাট ভণ্ডামি ছিল। ব্যাপকভাবে ভ্রূণহত্যা চলিলেও এই সামাজিক পাপ সম্বন্ধে সম্ভব হইলে সকলেই চুপ করিয়া থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের দুঃখ এবং এই অনাচার, দুই দেখিয়াই বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এর পর সামান্য বনিতার কথা। এ বিষয়ে এত সাবধানতার কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে 'স্ট্যাটিস্টিক্‌স্' না থাকিলেও প্রমাণ সুপ্রচুর। বাঙালী সমাজে বেশ্যাসক্তির পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশই নাই। ব্রাহ্ম-ধর্মের নৈতিক শিক্ষা প্রচার হইবার আগে বেশ্যালয়ে যাওয়া পুরুষের পক্ষে

স্বাভাবিক বলিয়াই ধরা হইত। অবশ্য সেখানে গেলে ধার্মিক বলিয়া খ্যাত হওয়া যাইত না, কিন্তু নিন্দার বিষয়ও ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ লোকে বিষয়ী সচ্চরিত্র ব্যক্তির অপেক্ষা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেই বেশী ভালবাসিত কারণ একদিকে তাহাদের কুটিলতা, অর্থগৃধ্নুতা, ষড়যন্ত্রপরায়ণতা ইত্যাদি দোষ কম হইত, অন্যদিকে তাহারা উদারপ্রকৃতির ক্ষমাশীল মানুষ হইত। তাই একটি পুরাতন পুস্তকে এইভাবে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছিল,—

"লোকে যারে বলে লুচ্চ, সে কেবল জানিবা কুচ্ছ
লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই।
মারে মণ্ডা আদা ছেনা, সাদা থাকে বাবুয়ানা,
সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই॥
মাতা পিতা দাদা ভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই,
দুঃখী নাহি হয় কার দুখে।
কেহ যদি কটু বলে সে কথা গায়ে না তোলে
সর্ব্বদা সরল কথা মুখে॥
বুদ্ধির নাহিক ওর, নরমেতে করে জোর
গরম নরম তার কাছে।
যার সঙ্গে কোন ঠাঁই, কোন কালে দেখা নাই,
যেন কত আলাপন আছে॥
লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারো না করে ভয়,
কেবল প্রেমের বশ রয়।
যে জন পিরিতে রাখে, তার প্রেমে বন্দী থাকে,
তার জন্য বহু দুঃখ পায়॥"

ইহাতে অবশ্য খানিকটা শ্লেষ আছে। তবু ইহাকে সাধারণভাবে বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জনমতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অপর পক্ষে শহরে বেশ্যাদের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রসার-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করা চলে না। নাম করিতে হইলে স্ত্রীলোককে হয় জমিদারের স্ত্রী অথবা বারাঙ্গনা হইতে হইত। রাণী ভবানী হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী জাহ্নবী চৌধুরাণী পর্যন্ত রাণীরা যতই নামজাদা হোন না কেন, অন্য দিক হইতে আর এক রকমের নামের জোরও কম ছিল না।

ইহাদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রসিক মহলে একটা সংস্কৃত বুকনিও প্রচলিত ছিল,—

"স্বনাম্নশ্চ স্ত্রীয়োধন্যা মাতৃনাম্নশ্চ মধ্যমাঃ
অধমাশ্ছুকৃরীনাম্ন্যঃ, কুলরতাশ্চাধমাধমাঃ ॥

ইহার তৎকালীন্তন ব্যাখ্যা দিতেছি, "সেই স্ত্রীলোক স্বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণে জানিতে পারেন; মধ্যমা মাতৃনামে যাহারা খ্যাত, তাহারদিগেরও বাবুরা জানেন; অধমা তাহারা, ছুকৃরীদের নামে যাহাদের পরিচয়; কিন্তু কুলবধূ সকলকে কোন বাবু জানেন না, এ কারণ তাহারা অধমের অধম।"

কিন্তু এই বারাঙ্গনা জগৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের বারাঙ্গনা জগৎ নয়, প্রাচীন গ্রীস বা রোমের জগৎ নয়, রিনেসেন্সের জগৎও নয়। ইহাদের বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্তা চালানো পেরিক্লিস এবং আস্পাসিয়ার কথোপকথনের মত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। স্বনামধন্যা হইলেও ইহাদের নাম 'থাইস্' বা 'ফ্রাইনি' হইত না। সেকালের বাংলার স্বনামধন্যাদের নামের নমুনা দিতেছি,—বকনাপিয়ারী, কোঁকড়াপিয়ারী, দামড়াগোপী, ছাড়ুথাগী, ওমদা খানুম, পেয়ারা খানুম, বেলাতি খানুম, নান্নিজান, মুন্নিজান, স্বপনজান ইত্যাদি।

সকল যুগেই বেশ্যাদের যত্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত—পেশা তো পেশা, তা উকীলেরই হউক, ডাক্তারেরই হউক, আর বেশ্যারই হউক। প্রাচীন ভারতে বেশ্যার শিক্ষার একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। সম্ভবত উহা সপ্তম শতাব্দী হইতে। বেশ্যামাতা বলিতেছে,—

> প্রত্যেক বেশ্যামাতাই জন্ম হইতে কন্যাকে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রথমে মিতাহার ইত্যাদির দ্বারা শরীরের তেজবল বাড়ায়। পাঁচ বৎসর বয়সের পর পিতার সহিতও বেশী মিশিতে না দিয়া বড় করে। জন্মদিনে, পুণ্যদিনে উৎসব ও মঙ্গলবিধি করিয়া থাকে। পুরাপুরি কামশাস্ত্র পড়ায়; নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সকল কলা শিখায়; লিপিজ্ঞান ও বচনকৌশল আয়ত্ত করায়; ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষও কিছু কিছু শিখায়; নানারকম ক্রীড়াকৌশল, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদিতে দক্ষ করে—ইত্যাদি।

এই রূপ আরও বহু জিনিস শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে পর্বদিনে সাজাইয়া গুজাইয়া মেলা ও লোকসমাগমের স্থানে পাঠানো হইত, যাহাতে ধনী প্রণয়ী

আনিতে পারে।

পুরাতন বাংলায়ও বেশ্যার সর্বতোমুখীন শিক্ষা দেওয়া হইত। কলিকাতার বেশ্যাদের সব রকম শিক্ষার পরিচয় দিব না। তবে একটা দিকে শিক্ষা আমার কাছে কৌতুহলজনক মনে হইয়াছে বলিয়া একটু বিবরণ দিতেছি। বৃদ্ধা বেশ্যা বলিতেছে যে, কেবল 'বিহারে'র রীতি জানিলেই বেশ্যা হওয়া যায় না, তাহাদিগকে 'প্রেমের ধারা'ও জানিতে হইবে। সে প্রেম কি? বৃদ্ধা বেশ্যা বলিতেছে—

> "প্রেম, যাহাকে প্রীতি বলে তাহা ঈশ্বরের সঙ্গেই ভাল, ইহা কেবল যোগীরাই পারেন। নচেৎ অন্য প্রেম কপট প্রেম, অর্থাৎ স্বকার্য্যোদ্ধার হেতু যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিতে হয়—তাহা মনুষ্য সকলের আন্তরিক নহে, প্রায় বাচনিকই।"

এই স্পষ্টোক্তির জন্যে শিক্ষয়িত্রী বেশ্যাকে 'বেলফুল বাহার' দিতে হয়। তাহার পর সে বলিতেছে,—

> "অতএব, বাছা, আমারদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায়, তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়, সেই কপট প্রেম জানিবা।"

বেশ্যা সত্যকার প্রেমে পড়িলে কলিকাতার খানদানী সমাজে প্রেমপাত্রকে ইংরেজী অক্ষরে সংক্ষিপ্তভাবে পি-এন্ বলা হইত। এই দুর্বলতার কথা ধরিবার নয়। আসল বেশ্যার প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত—

> "তুমি এই প্রকার প্রেম করিবা, কাহারও দমে ভুলিবা না। বাবুকে আপনার কাবুতে আনিবা। ইহার পন্থা এই ছয় ছ [পঞ্চ মকারের মত] শিখিলে হয়, যথা—ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি।"

অন্যগুলির অর্থ পাঠক অল্পস্বল্প অনুমান করিতে পারিবেন। তাই শুধু 'ছেমো' সম্বন্ধীয় শিক্ষা উদ্ধৃত করিতেছি। রক্ষিতা অবস্থায় থাকার সময়ে বাবু সন্দেহ করিয়া রাগ করিলে তাহাকে জব্দ করিবার উপায়কে 'ছেমো' বলা হইত। বাবু সন্দেহ করিলেই ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিতে হইবে, অনেক সাধ্য-সাধনার পরও এক-আধটা কথা কহিয়া নীরব থাকিতে হইবে।

> "এইরূপ হক্-নাহক্ ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিলে তাহাকেই ছেমো বলে। যদ্যপি প্রবঞ্চনা করিয়া কিঞ্চিৎ কপট রোদন করিতে পার তবে বড়ই ভাল এবং তোমার মাথা খাই এই একটি মাত্র কথা মুখ হইতে

অর্দ্ধেক নির্গত করিয়া দুইচক্ষে এক এক ফোঁটা জল বাহির করিয়া নীরব থাকিলেই বাবুর ক্রোধ মার্গে ঢুকিবেক, উল্টিয়া তোমাকে সাধ্যসাধনা করিবেন, এবং তোমাকে যত সাধিবেন তুমি ততই আপনার ছেমো প্রকাশ করিবা।"

প্রাচীন ভারত ও অর্বাচীন ভারতের মধ্যে বেশ্যার শিক্ষার সম্বন্ধে যে বেশ পার্থক্য ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার জন্য বেশ্যার আকর্ষণ ও প্রতিপত্তি কমে নাই, কারণ বেশ্যার উৎকর্ষের সহিত বেশ্যাসক্তের রুচিও নামিয়া গিয়াছিল। বেশ্যালয়কে চলিত বাংলায় যে 'মাগীবাড়ি' বলা হইত তাহাই ওই অবনতির সূচক।

ধনী বা সচ্ছল লোকের বাড়িতে বেশ্যাসক্তি এতই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত যে খাজাঞ্চিখানাতে এই বাবদ খরচপত্রের জন্য 'স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার' কর্তার কাছ হইতে থাকিত, অবশ্য অনুচ্চারিত ভাবে। সুতরাং খাজাঞ্চি খতিয়ানে লিখিতে পারিত, 'ছোট বাবুর হিসাবে লাল পেড়ে শান্তিপুরে শাড়ীর বাবদে দশ বা পনের টাকা।'

ফলে ধনী পরিবারে বেশ্যাসক্তির ক্লেদাক্ত দিক ছাড়া আর একটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুর দিকও দেখা যাইত। উহা পত্নীদের উপেক্ষিত, বঞ্চিত, বিড়ম্বিত জীবন। এ-বিষয়ে উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, প্রায় সকল সমাজসংস্কারক ও ঔপন্যাসিকও করিয়াছেন। তাঁহাদের আগেও বাংলা বইএ ইহার উল্লেখ আছে। একটি পুরাতন পুস্তক হইতে একজন সতী নারীর বিলাপ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমার সমান নারী, ত্রিজগতে নাহি হেরি,
আমি নারী অতি অভাগিনী।
ধনে মানে কুলে শীলে, বর দেখি বিয়ে দিলে,
সমাদরে জনক জননী॥
বিবাহের পর আসি, শ্বশুর-ঘরেতে বসি,
দিবানিশি থাকি একাকিনী।
নবীন যৌবন ভরে, চিরকাল কামজ্বরে,
পুড়ে মরি দিবস রজনী॥"

টাকার অভাব হইলে স্ত্রীর অলঙ্কারের উপর যে টান পড়িত তাহার বিবরণও আছে,—

"কি করেন শেষে নিজ পত্নীর গাত্রের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনঃস্থ

> করিয়া এক দিবস শয়নছলে বাটীর মধ্যে যাইবেন সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়া গুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন, কারণ নববধ্বাগমনের পর স্বামীর মুখ সন্দর্শন করেন নাই। রাত্রিতে বাটির মধ্যে বাবু শয়নার্থ গমন করিলেন। তাহাকে অনেক বিনয়বাক্যেতে সন্তুষ্ট করিয়া দুই চারি খানি স্বর্ণ গহনা তাহার স্থানে লইলেন, কহিলেন উত্তম গড়াইয়া দিব।"

এই জনপ্রচলিত আচার হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানভঞ্জন' গল্পের উপকরণ লইয়াছিলেন। কিন্তু পরযুগের অনুভূতির দ্বারা উহাকে তিনি যে-জগতে নিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন গহনাচুরির জগৎ নয়।

ইহার পর আর একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। সেটা এই—গ্রাম্য সমাজ পাপবর্জিত ছিল না; স্ত্রী-পুরুষ-সংক্রান্ত এক ধরনের অনাচার শহরে বেশী হইলেও আর এক ধরনের অনাচার পল্লীগ্রামে কম ছিল না। আমার গ্রাম্যজীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যতটুকু তাহাতে পঙ্কিলতা দেখি নাই। তাই আমার ধারণা ছিল, স্ত্রী-পুরুষ সংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ আচরণ হইতে গ্রাম্য সমাজ মোটামুটি মুক্ত। কিন্তু ক্রমশ জানিতে আরম্ভ করিলাম যে, আমার ধারণা ঠিক নয়, গ্রামেও যথেষ্ট অনাচার ছিল এবং আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র গ্রাম্য সমাজের বাস্তব বর্ণনা যেখানেই দিয়াছেন, সেখানেই উহাকে বড় বা মহৎ বলিয়া দেখান নাই। তাঁহারা অবশ্য বিশেষ করিয়া উহার ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' যে চিত্র পাই, তাহা যেমন বাস্তব তেমনই নীচ। রমেশের চরিত্র উহাতে কল্পিত আদর্শ মাত্র। তবে উঁহাদের গল্পে নরনারীঘটিত অনাচারের বহুল বিবরণ নাই, ইঙ্গিত অবশ্য যথেষ্ট আছে।

আমি বাংলার পল্লীসমাজের এই দিকটার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিলাম প্রাপ্তবয়সে লেখক বন্ধুদের সহিত আলাপে। তাঁহাদের কথাবার্তা হইতে যাহা জানিতে লাগিলাম তাহা আমার পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়াইল। অথচ ইঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু পাই নাই। সম্প্রতি দুইজনের লেখা পড়িয়াছি, তাহাতেও একটা পীড়াদায়ক কলুষিত চিত্র পাইয়াছি। ইঁহাদের একজন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও আর একজন শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র। জিতেনবাবু বন্ধু না হইলে তাঁহার বইটা সম্ভবত নজরে আসিত না। কিন্তু গজেনবাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার বইও সুপরিচিত। জিতেনবাবুর বইটির নাম "পিছু ডাকে"; গজেনবাবুর বই সুপরিচিত উপন্যাসত্রয়ী—'কলকাতার

কাছেই', 'উপকণ্ঠে' ও 'পৌষ-ফাগুনের পালা'।

জিতেনবাবুর সহিত কলিকাতায় আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার বইখানাকে সাহিত্য হিসাবে খুবই উচ্চস্তরের বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু উহাতে গ্রামের জীবনের যে বর্ণনা আছে, তাহা আমার গায়ে অ্যাসিডের জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। তাই তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তিনি এ-রকম 'করোসিভ্' বই কি করিয়া লিখিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি তাঁহাকে অসত্যভাষী বলিতেছি, অর্থাৎ সাজানো কাহিনী লিখিবার জন্য দোষী করিতেছি। সেজন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া উত্তর দিলেন, বইটি গল্প হইলেও উহা গ্রাম্য জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতে লেখা। এমন কি এও বলিলেন যে ইঁচড়ে-পাকা হওয়াতে বহু জিনিস তাঁহার নজরে আসিয়াছিল। আমি অবশ্য তিনি মিথ্যা বলিয়াছেন তাহা কখনও মনে করি নাই, শুধু লিখিয়াছিলাম তাঁহার বর্ণনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

গজেনবাবুর বইগুলিতেও পল্লীসমাজের উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হয় নাই। উপন্যাস-গুলি আমার আগে আমার স্ত্রী পড়েন। পীড়াদায়ক বোধ হওয়াতে তিনি গজেনবাবুকে চিঠি লিখিয়া বর্ণনার সত্যাসত্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। গজেন-বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কাহিনী বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই দুই লেখক-বন্ধুর সাক্ষ্য আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। অন্য কেহও আন্তরিক আলাপে গ্রাম্যজীবনের নীচতা ও কলুষতা অস্বীকার করেন নাই। তবে যাহা জানিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, শহরের অনাচার এক রকম, গ্রামের অনাচার অন্য রকম। গ্রামে দুই একজন দুষ্টা বোষ্টমী ও ও নিম্নজাতীয়া কুলটা স্ত্রীলোক ছাড়া পতিতাঘটিত অনাচার কম ছিল। কিন্তু বিবাহিত নারী ও বিধবা সংক্রান্ত অনাচারের প্রাবল্য ছিল।

পুরুষ-নারী সম্পর্কিত কার্যকলাপের কলুষতার এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এই 'কর্মকাণ্ড'কে আমি গুরুতর মনে করিতাম না, যদি 'জ্ঞানমার্গে' ইহার বিপরীত কিছু পাইতাম। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে 'সাংখ্য' অর্থাৎ জ্ঞানের কথা আছে, পরে 'যোগ' বা কর্মের কথা আছে। আমি প্রথমে 'যোগে'র কথা বলিলাম, এইবার 'সাংখ্যে'র কথা বলিব।

বাঙালী সমাজে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আসিবার আগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক লইয়া যে-সব ধ্যান-ধারণা জনপ্রচলিত ছিল, যে-সব কথাবার্তা চলিত তাহার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব, মাধুর্য, বা সৌন্দর্যের অনুভূতি ছিল না। সবটাই যেমন রূঢ়, তেমনই

অশালীন। পাশ্চাত্ত্য ভাব আসিবার পরও যাহারা নূতন ধারণা গ্রহণ করে নাই, তাহাদের মুখে পুরাতন ভাষাই শোনা যাইত, তাহাদের মনে পুরাতন ভাবই আসিত। এই অনুবর্তন হইতেই আমি সেকালের হাবভাব ও কথাবার্তার স্বরূপ কি ছিল তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছি।

আলাপের কথাই বিবেচনা করা যাক্। প্রথমত, বয়স্ক ভদ্র প্রাচীনেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না, বলা রুচি ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। এই নীরব থাকার কারণ কি? আমার মনে হয়, তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় অথবা ধারণায় এই সম্বন্ধের যে-রূপ তাঁহারা দেখিতেন তাহা অভব্য ছিল, তাই এ-বিষয়ে কথা বলা গর্হিত মনে করিতেন।

কিন্তু নারী সম্বন্ধে কথাবার্তায় ও আচরণে তাঁহারা যে মনোভাব প্রকাশ করিতেন তাহা একান্তই অবজ্ঞাসূচক হইত। স্ত্রীলোককে 'মাগী' বা স্ত্রীজাতিকে 'মাগী-ছাগী' বলিয়া তুচ্ছ করা একটা প্রচলিত ধারা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত ব্রজেশ্বরের মুখে এই অবজ্ঞাসূচক উক্তি দিয়াছিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।"

তবে ভদ্র যুবকেরাও ইয়ারমহলে নিজের পত্নীকে লইয়াও যেভাবে আলাপ করিত, তাহাতে শালীনতার কোনও গন্ধই থাকিত না। শুধু স্ত্রীর স্তন-নিতম্বের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাতেই আলাপ আবদ্ধ থাকিত না, আরও অনেক গোপনীয় স্থান পর্যন্ত যাইত। কোনদিন নাপিতের ক্ষুরে কাটা গাল লইয়া বন্ধুসমাজে যাইবার উপায় ছিল না। তখনই অশ্লীল ইঙ্গিত আরম্ভ হইত। কোনও কেরানীর স্ত্রী পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পরের দিন সহকর্মীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত, পূর্বরাত্রে কয়বার হইয়াছে এই সংবাদ জানিবার জন্য। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কেরানীগিরি করিবার সময়ে এই ধরনের চাপা কথা আমার কানে পৌঁছিত।

ইহার উপর রসিকতা চাগিলে ত কথাই নাই। তখন যে-কোনও বস্তুর উল্লেখ নরনারীর সঙ্গমের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইত। প্রেসে কাজ করিলে 'লেড' ও 'স্পেস্' বলিবার উপায় ছিল না, কেরানীগিরি করিলে দোয়াত-কলমের উল্লেখ করিলে সকলে হাসিত। এ-রকম কত বলিব!

তাহারও উপর আবার অসূয়া বা দ্বেষপ্রসূত নিন্দা আরম্ভ হইলে ষোল আনা বত্রিশ আনায় চড়িত। এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি একদিন আমাকে-

কলিকাতায় একজন বিশেষ গণ্যমান্য, বিদ্বান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিলেন, "ও তো মাসতুতো বোনের পেট করেছিল!" আমি কথাটা উড়াইয়া দেওয়াতে বলিলেন, "আমি 'আই-উইট্‌নেস্' এনে দেব।" তখন আমি না বলিয়া পারিলাম না, "কেউ যে কারো পেট 'আই-উইট্‌নেস্' রেখে করে তা তো আমার জানা ছিল না।" তখন তিনি আমাকে বলিলেন, যে দাই গর্ভপাত করাইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্যের কথা তিনি বলিতেছেন।

আর একজন আমাকে একদিন কলিকাতার আর একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সম্বন্ধে বলিলেন, "ও তো ভাইঝির সঙ্গে শোয়।" ইহাও আমি অবিশ্বাস করাতে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন, তবে ভাইঝির সাফাই হিসাবে বলিলেন, "ওর স্বামীর অমুক স্থানে গোদ। তা বলে কি মেয়ে খালি পেটে বসে থাকবে?"

ইহাদের পরস্পরের কথামত কলিকাতার প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হয় জারজ, নয় পরস্ত্রীরত, নয় অন্যরকম অপরাধে অপরাধী। এই সমস্ত আলাপের পিছনে ছিল স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে একটা অবিচ্ছিন্ন কামজ উত্তেজনা ও কলুষিত চিন্তা ও কল্পনা। ইহাদের পক্ষে এই একভাবে ছাড়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অন্যভাবে ভাবাও অসম্ভব ছিল।

ইহার পরও আর এক রকমের কুকথার উল্লেখ করিতে হয়। শহরে ও পল্লীগ্রামে অনেক সময়েই এমন ধনী বয়স্ক ব্যক্তি দেখা যাইত যাঁহাদের যৌবনের চরিত্রদোষ প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই শ্রেণীর বাবুরা বিকাল বা সন্ধ্যায় ফুলবাবু সাজিয়া বেশ্যালয়ে বা রক্ষিতার ঘরে গিয়া আলাপ-সালাপ করিয়া আসিতেন। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার সকলেই মামুলী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং ইঁহাদিগকে ধর্মের ষাঁড়ের মত ধর্মের লোচ্চা বলিতে পারা যাইত।

ইঁহাদের এক কাজ ছিল, অল্পবয়স্ক বালকদের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় দীক্ষিত করা। আমার এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক কাকা ছিলেন, তিনি তাঁহার যখন দশ বৎসর তখন হইতেই তাঁহাকে বারাঙ্গনাজগতের সংবাদ দিতে আরম্ভ করেন। একদিন তাঁহাকে বলেন, "যাবি আজ সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে এক জায়গায়? বড় জবর মেয়েমানুষ! ঘরে ঢুকতে হলেই পাঁচ টাকা দিতে হয়, আর মাই-এ হাত দিতে দশ টাকা।" দশ-বারো বৎসরের বালকের সঙ্গে এই আলাপ! এই ক্লেদ পুরাতন বাঙালী সমাজের সবটুকু ব্যাপিয়া ছিল। এইসব লোকের মন গরম জল ও সোডা দিয়া

ধুইয়াও নির্মল করিবার উপায় ছিল না।

এই পরিচ্ছেদে যাহা লিখিলাম তাহা অনেকে রুচিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল বলিয়া মনে করিবেন তাহা জানি। জানিয়াও ইহা ইচ্ছা করিয়াই লিখিয়াছি। পুরাতন সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ, এই কথাটা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সে দুর্নীতি কি তাহার স্পষ্ট কোনও পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই নূতন যুগে বাঙালী কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছিল তাহার যথাযথ ধারণা হয় না। আমি পুরাতন ধারা ও নূতন ধারার মধ্যে পার্থক্য গভীরভাবে অনুভব করাইতে চাই। এই অনুভূতি তীব্রভাবে আনিবার জন্য পুরাতন ও নূতন দুই-এরই পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। এ-বিষয়ে সঙ্কোচ করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে।

এই অপ্রীতিকর বিষয়ের উপসংহারে বলিব, নারী সম্বন্ধে নূতন ভাব আসার আগে বাঙালী জীবনে নরনারীর সম্পর্কের যে-যুগ ছিল, তাহা সেই সম্পর্কের ঘোর অমানিশা। তখন মুখেও সতী-সাবিত্রীর বড়াই ছিল না। আর লোক-কটাক্ষের পিছনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে জিনিসটা ছিল উহা রিরংসা, নির্জলা রিরংসা ছাড়া কিছুই নয়।

এই ঘনান্ধকার রাত্রি বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টার দিবা-নিশা দুই ভগিনীর এক ভগিনী নয়, ফ্লোরেন্সের মেদিচি চ্যাপেলে মিকেল এঞ্জেলোর 'নত্তে'-র রাত্রিও নয়। সেই সব রাত্রি মানুষের মনের অপরিসীম, তলহীন প্রশান্তির আশ্রয়। যে-রাত্রি বাংলা দেশে ছিল তাহার রূপ অন্য প্রকার—Walpurgis Nacht, তবে আরও ক্লেদাক্ত, আরও পঙ্কিল। উহা বেশ্যালয়ের শেষ রাত্রি—যখন অপরিমিত মদ্যপানের আবেশে ও অবিরত সম্ভোগের অবসাদে বিস্রস্তবসন যুবক-যুবতী বমির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিত, আর বন্ধুদের পরদিন সকালে মেস হইতে আসিয়া বন্ধুকে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইত।

কিন্তু এই রাত্রির পর সহসা ঊষার রক্তিম বিভা আসিয়া পড়িল। কোথা হইতে আসিল? সেই ইতিহাসই বলিতে চাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার দৃশ্য ও বাঙালীর ভালবাসা

কোথা হইতে আসিল, কে আনিল, কিভাবে প্রকাশিত হইল, তাহার সবই জানা, শুধু বলার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ইহা ইতিহাসের ব্যাপার, ইহার বিবরণ তথ্যগত হইলে, আলোচনাও অংশত তত্ত্বগত হইতে বাধ্য। শুধু তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণের একটা উষরতা আছে, যথেষ্ট কচ্‌কচি এ পর্যন্ত হইয়াছে, আরও বিচারের অবতারণা করিতে চাই না। তাহার বদলে নূতন প্রেম যে কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা অনুভব করাইতে চাই। হৃদয়ে অনুভূত হইলে বিষয়টার তথ্য সহজে মনে থাকিবে, তত্ত্বও সহজবোধ্য হইবে।

তাহা ছাড়া পূর্ব পরিচ্ছেদের ক্লেদাক্ত মালিন্যও মুছিয়া ফেলা দরকার। নূতন জীবনে যাহা দেখা দিয়াছিল তাহা পুরাতন জীবনের আবিলতাকে ধুইয়া নির্মল করিয়া দিয়াছিল। দেশাচারের বিবরণ দিতে গিয়া উহার গ্লানি আমি নিজে যেভাবে অনুভব করিয়াছি, পাঠক-পাঠিকাও তেমনই করিয়া থাকিবেন। তাই আপাতত খানিকটা স্ফটিকস্বচ্ছ ও হিমশীতল বৃষ্টিধারার প্রয়োজন।

নূতন ভালবাসা যখন বাঙালী জীবনে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিল তখন দেখা গেল যে, উহা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া আছে। এই সৌন্দর্যের অনুভূতিও প্রেমের অনুভূতির মতই নূতন ব্যাপার। কিন্তু এই অনুভূতি আসিবার পরও বহু বাঙালী এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন কখনই হয় নাই, অনেক সময়ে অসাড়ই ছিল। দুটটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অনেক দিন আগেকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়া জন্মস্থানে যাইতেছি। বিরাট নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়াছে। সকালবেলাকার প্রবল বাতাস ঘুরিয়া ফিরিয়া মুখে ও কপালে যেন ছোট ছোট চাপড় মারিয়া যাইতেছে, চুল উড়াইতেছে। কান না পাতিয়াও নীচে ইঞ্জিন-ঘরের মৃদু-গম্ভীর দ্রুততালের শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অভ্যাসমত একটা বই হাতে ছিল, কিন্তু পড়াতে মন লাগিতেছিল না। তাই চারিদিকের দৃশ্য দেখিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

পাটাতনের উপর পা দিতেই ইঞ্জিনের সহিত একতালে সমস্ত শরীরটা স্পন্দিত হইতে লাগিল। রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দেখি, জলের মধ্যে ইহার চেয়েও অনেক বড় একটা আলোড়ন—চাকার আঘাতে জল ফেনায় আবর্তে তরঙ্গে,

তীরবেগে পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। শহর হইতে অনেক দিন পর প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া গেলে অনুভূতির একটা তীব্রতা আসে, পল্লীদৃশ্যের বর্ণ, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ যেন তীক্ষ্ণধার হইয়া চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। আমিও এই অনুভূতির মধ্যে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছিলাম যে, মনের মধ্যে চিন্তার জন্য আর এতটুকু মাত্র ফাঁক ছিল না।

তবু কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য না করিয়া পারি নাই। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটি মানুষ—সম্মুখের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট কোট-পরিহিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ইহার মুখে ক্রূরতা, পৈশাচিকতা, দিব্যভাব, বা এমন কোনও বিশেষত্ব ছিল না যাহার জন্য দশজনের মধ্যে তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কলিকাতার ট্রামে চলিবার সময়ে এই ধরনের মুখ যাহাতে না দেখিতে হয় সেজন্য চোখ বুজিয়া থাকিতাম। এ মুখ একেবারে তাহাদের যাহারা শহরে ছোট সাংসারিকতায় জীবনের ছোট লাভ-ক্ষতির নির্ভুল হিসাব করিয়া, খতিয়ানে কোনও লোকসান না লিখিয়া নিঃসংশয়ে দীর্ঘজীবন কাটাইয়া যায়। সুতরাং যে দৃশ্যের ভিতর দিয়া আমরা যাইতেছিলাম তাহার দিকে মুখ ফিরানো দূরে থাকুক, তীব্র বাতাস লাগিবার ভয়ে তিনি বিমুখ হইয়াই ছিলেন।

কিন্তু সর্ব-অসামান্যতা-বর্জিত বলিয়াই সেই আকাশ বাতাস নদীর সহিত মুখখানার অপরিসীম অসামঞ্জস্য অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ভদ্রলোকের দিকে একবার, দুইবার, তিনবার চাহিলাম। একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত অবজ্ঞা ভিতর হইতে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল—এত ক্ষুদ্র, এত সাধারণ!

হঠাৎ অবহিত হইয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকও আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন। একটু ইতস্তত করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন?" আমি পরবর্তী স্টেশনের নাম করিলাম। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমার ধরন-ধারণ দিয়া আমাকে বিচার করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বি-এ এম-এ বুঝি?" আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ। তিনি অতি ধীরস্বরে বলিলেন, "আজকাল বি-এ এম-এ'র কোনও মান নাই।"

আমি একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেলাম। মনে করিতেছিলাম যে, বাঙালা বুর্জোয়া সমাজের উপর খুব চাল মারিতেছি। আমার ভুল ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির জ্বালাহীন, ধীর, সাবলীল, ও সহজ লগুড়াঘাতের তুলনায় আমার অবজ্ঞা পিপীলিকা-দংশনও নয়। এই ধরনের অনুভূতির ক্ষমতাও নমস্য।

আর একবার কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতা আসিতেছিলাম। তারিখ ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৭ সন। পূর্ববঙ্গ যে চিরকালের মত ছাড়িয়া আসিতেছি সেদিন তাহা জানিতাম না। তবু ময়মনসিংহ-জগন্নাথগঞ্জ লাইনের একটা জায়গা আমার বড় প্রিয় ছিল, সেটা দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম।

সেখানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত একেবারে রেল লাইনের ধারে আসিয়া পড়িয়াছিল। শীতের প্রারম্ভে নদী শীর্ণ, কিন্তু পারার মত শুভ্র ও প্রবহমাণ, তাহার উপর সাদা বালির চড়া খুবই বিস্তৃত। ওপারে দূরে গ্রামের সবুজ রেখা শাড়ীর পাড়ের মত। তাহারও উপরে ধূসরায়মাণ নীল আকাশে ধূসরতর গারো পাহাড়ের ছাপ।

যেই ট্রেন জায়গাটার কাছে আসিল আমি উঠিয়া গিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইলাম, মুখ বাহির করিয়া। মাইল খানেক জায়গা পার হইয়া গেলে আবার আসিয়া বেঞ্চে বসিলাম। এবারেও একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কেন উঠিয়া গিয়াছিলাম। শৌচাগারে যাই নাই, সুতরাং এত টানাপোড়েনের উদ্দেশ্যটা তাঁহার কাছে প্রতিভাত হয় নাই। আমি বলিলাম যে নদীটা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি শুধু বলিলেন, "ওতে দেখবার কি আছে?" আমি একটু বিরক্তির সুরেই উত্তর দিয়াছিলাম, "আপনি উহা বুঝিবেন না।" ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া পরে স্টীমারে উঠিয়া আমার সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিলেন। পরিচয়ে জানিলাম তিনি পুলিসের দারোগা।

কিন্তু বাংলাদেশের এমন কোনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে কি, যাহা মনকে অভিভূত করিবার মত? আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা বিলাতের কল্পনায় করিতাম, একমাত্র সেখানকার দৃশ্যকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলিয়া ধরিতাম, আমারও সেই মনোভাব ছিল। তাই ডি নদী ও মাল্ভার্ন পাহাড়ের কথা মনে করিয়া যত আনন্দ পাইতাম, দেশের কথা মনে করিয়া তত আনন্দ পাইতাম না—অন্তত মনকে বলিতাম না যে আনন্দ পাইতেছি। এই মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া "Banks and braes o' bonie Doon," "O Brignal banks are wild and fair," "My heart is in the Highlands, my heart is not here", এই সব উচ্ছ্বাসের সহিত আবৃত্তি করিতাম। তখন আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি এবং বেলেঘাটা-বালিগঞ্জ লাইনে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি। পাঠ্য বইটা খুলিয়া শেষোক্ত কবিতাটি দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না, উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া

উঠিলাম। সামনে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া একেবারে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "য্যা য্যা, অত চাড় দেখাতে হবে না! ছেলে বাঁচলে হয়!"

বিদেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই মনোবৃত্তির বশেই ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা ভাবিলেও আমরা সুদূর কাশ্মীর, হিমালয়, পুরী বা ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীরের কথা স্মরণ করিতাম। বাংলাদেশের কথা মনেই পড়িত না।

তবু আমার মনের গভীরতম তলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটা তীব্র অনুভূতি ছিল। বিরাট নদী, ঢেউখেলানো ধানের ক্ষেত, দিক্‌চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ দেখিলে মনে কোন ভাব বা ধারণা আসিত না, শুধু শরীর-মন দিয়া উহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতাম। কিন্তু এই দৈহিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির পিছনে কোন বিচার ছিল না। তাই আমার এই তন্ময়তাকে কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুভূতি বলি নাই—অবশ্য অল্পবয়সে।

বড় হইয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম, সত্যই কি বাংলাদেশের কোন নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে? একদিন বিকালে বেড়াইবার সময়ে কিশোরগঞ্জ শহর হইতে রেল লাইন ধরিয়া মাইল কয়েক উত্তর দিকে যাইবার পর একটা জলে ডোবা ধানক্ষেতের ওধারে একটি বাস্তুভিটা দেখিতে পাইলাম। মাঝখানে একটা পুকুর। তাহার উঁচু পাড়ের উপর ছয়-সাতটা আটচালা। উল্টাদিকে বাঁশের ঝাড়। স্থির নিস্তরঙ্গ জলে আটচালার স্পষ্ট ছায়ার সম্মুখে নীল আকাশ ও সন্ধ্যার রক্তিম মেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সমস্তটা কন্‌স্টেবলের ছবির মত। তখনই বুঝিলাম, বাংলাদেশেরও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। উহার দিকেও মুখ ফিরাইয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হইবে। এই নূতন দৃষ্টি ফিল্‌ম-স্টারের রূপ হইতে চোখ ফিরাইয়া ঘরের মেয়ের রূপ দেখিবার মত।

কিন্তু বাংলার মুখশ্রী শুধু গৃহস্থঘরের বাঙালী মেয়ের মুখশ্রীর মতই নয়, ইহাতে বিশালত্ব, গরিমা ও মহিমা আছে। সে বিশালত্ব, গরিমা ও মহিমা বাংলার জলরাশির। তাহার কত রূপ! এই জলরাশির সহিত ক্ষেতের সবুজ, আকাশের নীল, বনের শ্যামলতা মিলিয়া বাংলার শ্রী গঠিত হইয়াছে।

এই শ্রী বিশেষ করিয়া জলের বিচিত্র রূপ, চল্লিশ বৎসর দেখি নাই, আর যে দেখিব তাহারও আশা নাই। বাঙালী বুদ্ধির দোষে, অন্ধ উত্তেজনার বশে, ভয়াবহ দ্বেষের তাড়নায় বাংলাকে ভাগ করিয়াছে। সেদিন হইতে যে মানসিক ও বৈষয়িক যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, উহার অবসান হয় নাই, কখনও হইবে না। আমি বৈষয়িক সর্বনাশকে গুরুতর বলিয়া মনেই করিতাম না, যদি তাহার মূলে

মানসিক বিকলতা না থাকিত। অথচ বঙ্গবিভাগের অন্য সব দিক লইয়াই হাহাকার ও ঝগড়ার বিরাম নাই। শুধু একটিও কথা শোনা যায় না সব চেয়ে বড় ক্ষতি সম্বন্ধে। বাঙালী তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য হারাইয়াছে। ইহার তুলনায় অন্য অভাব কিছুই নয়। সম্পত্তি গেলেও প্রাণ থাকিলে আবার সব ফিরিয়া আনা যায়। প্রাণ গেলে দীনতা হইতে ত্রাণ নাই।

নদী, জল, উন্মুক্ত উদার নীল আকাশ, কাজলকালো বা মরালশুভ্র মেঘ, দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও ঘনশ্যাম বনানী বাঙালীজীবনে প্রাণের অবলম্বন। ইহাদের ছাড়িয়া জীবন্ত বাঙালী কল্পনা করা যায় না। বাঙালী যে আজ এই প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া জলের কথা স্মরণও করে না তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি, তাহাদেরকে কেন আমার কাছে চলন্ত মমীর মত মনে হয়। আমি যে সত্তর বৎসর বয়সেও সজীব আছি, তাহারও কারণ এই, আমি বাংলার জলরাশিকে ভুলি নাই। বারো বৎসর বয়সে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সারাজীবনেও আমি আর কোথাও আমার দেহমনের জন্য ঘর খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রবাসে —তা সে দিল্লীতেই হউক বা কলিকাতাতেই হউক—পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য বালকই আছি, আর কিছু হইতে পারিলাম না।

সেজন্য যখনই জলের দেখা পাই চাহিয়া থাকি ও বাংলার জলের কথা মনে করি। প্রায় রোজই দিল্লীতে যমুনার ধারে যাই। দিল্লীতে যমুনা কলিকাতার ভাগীরথীর মত শহরের কারাগারে আবদ্ধ নয়। যমুনার ধারে গেলে ভারতবর্ষের রাজধানী উহার পারে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। উহা এখনও উদ্দাম, এখনও বন্য, এখনও গ্রাম্য।

কিন্তু উহা কালিন্দী নয়, উহা উত্তরাপথের নদী, ব্রহ্মর্ষি দেশের শুষ্কতার মধ্যে একটু নীরের সরসতা বজায় রাখিয়াছে। তাই প্রতিদিন ভোরবেলা এই অঞ্চলের নরনারীকে স্নান করিবার জন্য 'যমুনাজী'র পারে দ্রুতপদে যাইতে দেখি। 'যমুনাজী'কে এখনও ফুল বা ফুলের মালা অর্ঘ্য দিতে হয়, সেজন্য পথে পথে ফুলের পসারীরা বসিয়া থাকে।

শুধু বর্ষায় বন্যা আসিলে যখন অক্ষম দিল্লী 'নগর-নিগমে'র তুচ্ছ চেঁচামেচি শুনিতে পাই, ভারত গভর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার-বাহিনীর উপর টান পড়ে, দিল্লীর পার্ক ও রাস্তা গ্রামের গরু-মহিষে ভরিয়া যায়, তখন যমুনার যে রূপ দেখি তাহাতে আমার বাল্যকালে দেখা পূর্ববঙ্গের নদীতীরের কথা মনে পড়ে। একবার ভোরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, যমুনার ঢেউ পাড়ের বালির উপর

আছড়াইয়া পড়িতেছে, ওপারে শ্বেতশীর্ষ কাশ। তখন ১৯০৭ সনে ভৈরববাজারের কাছে মেঘনার যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে যেন শিউলির গন্ধ পাইলাম।

তেমনই ইংলণ্ডের নদী দেখিয়াও দেশের নদীর কথা মনে হইয়াছে। কিন্তু সে-সব নদী আমাদের নদী হইতে এত বিভিন্ন যে, তাহার সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যানুভূতি অন্যরকমের। লণ্ডনের বাহিরে টেম্‌স্‌-ই হউক, আইসিস্‌, কেম্‌ বা এভনই হউক, সে-সব নদী দেশের দিকে মন ফিরাইলেও ঠিক দেশের স্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

কিন্তু সুদূর আর এক দেশে জলের ধারে বসিয়া দেশের মত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। কোনো কোনো দিকে দৃশ্য অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকমের, তবু বাংলার জল ও সেই জলের মধ্যে একটা একাত্মতা ছিল। সে কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইস্রায়েলে, সী-অফ-গ্যালিলির পারে। একটি রাত্রে বাইবেলে বর্ণিত গেনেসারেটের সমতলভূমির প্রান্তে সী-অফ-গ্যালিলির একেবারে ধারে কাটাইয়াছিলাম। সে দৃশ্য ভুলিব না।

সী-অফ্‌-গ্যালিলি একটা হ্রদ—মাইল পনেরো লম্বা ও মাইল পাঁচেক চওড়া। সুতরাং মেঘনা বা পদ্মার একটা অংশের মত। ওপারে সিরিয়ার সবুজ পাহাড়, এপারেও পিছনে পাহাড়। হোটেলের জানালার ভিতর দিয়া হ্রদের নীল জল দেখিতে পাইতেছিলাম। একদিকে আসল হ্রদ ও হোটেলের মধ্যে একটা বিলের মত জায়গা; উহা হ্রদ হইতে নলখাগড়ার সারি দিয়া স্বতন্ত্র করা। আগের দিনের সন্ধ্যায় বীচিভঙ্গ হইলেও হ্রদটার চেহারাতে মাধুর্য ভিন্ন কিছু ছিল না। তাই আমি ইস্রায়েলি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যীশু যে ঝড়কে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহা কি এই হ্রদে সম্ভব?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মিস্টার চৌধুরী, কখনও কখনও এই হ্রদও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে পারে।"

পরদিন ভোরে জাগিয়া একটা জলের গর্জন শুনিতে পাইলাম, পুরীতে সমুদ্রের গর্জনের মত। বাহির হইয়া দেখি, হ্রদ হইতে ঢেউ ও ফেনিল জল নলখাগড়ার সারিকে আন্দোলিত করিয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিতেছে। দূরে সী-অফ্‌-গ্যালিলি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ, ঢেউ-এর চূড়ায় চূড়ায় সাদা ফেনা। উচ্চচূড় ইউকালিপ্টাস গাছগুলির মাথার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বাতাসের চিহ্নও নাই, উহারা নিশ্চল নিষ্কম্প। ছুটিয়া ইউকালিপ্টাস বন পার হইয়া একেবারে হ্রদের ধারে পাথরের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে জল গর্জন করিয়া আছড়াইতেছে, তবু গাছে

গাছে আন্দোলন নাই। পরে জানিয়াছিলাম, জেরুজালেমে প্রবল ঝড় বহিতেছিল সে-ঝড় জর্ডান নদীর অতি-নিম্ন উপত্যকা বাহিয়া উত্তর দিকে আসিতেছিল। সেই ঝড়ই বেলা নয়টা নাগাদ যখন কাপেরনম্-এ গেলাম তখন একেবারে প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখি, সী-অফ্-গ্যালিলির নীল জল কালো হইয়া গিয়াছে—ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মেঘনার কথা স্মরণ হইল।

এইসব স্মৃতিই এখন আমার পূর্ববঙ্গের সৌন্দর্যের অনুভূতি ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়। চোখ বুজিলেই সেই দৃশ্য ভাসিয়া উঠে।

প্রথমে বড় নদীর কথাই বলি। আমি ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, এই তিনটি নদীতেই বহুবার স্টীমারে বা নৌকায় যাতায়াত করিয়াছি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সকল ঋতুতেই দেখিয়াছি। ইহাদের বর্ষব্যাপী রূপ আমার খুবই পরিচিত। শুধু পদ্মার কথাই বলিব।

বর্ষায় উহা উন্মাদিনী মূর্তি ধরে। মনে হয় যেন যোগিনী-বেশধারিণী পার্বতী সাগর-মাতার কাছে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তীব্র স্রোত চাক্ষুষ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া স্টীমারকে পিছনে ফেলিয়া নদী চলিয়াছে—তাহার রং উজ্জ্বল গৈরিক, কখনও বা হেমন্তের নূতন খড়ের মত, জলের বিস্তার ফেনার আবর্তে উচ্ছ্বসিত।

আবার শীতকালেও উহাকে দেখিয়াছি—তখন নদীর খাত আয়তনে বিস্তৃতই থাকে, এক পার হইতে আর এক পারে গ্রামের সার সঙ্কীর্ণ কালো পাড়ের মতই দেখা যায়, কিন্তু প্রবহমাণ জলের খাত চড়ায় চড়ায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বিসর্পিত হইয়া যায়। দেখিলে মনে হয়, যেন নিশ্চল সাদা বালি ও প্রবহমাণ কলধৌতের মত নদীর স্রোত সখীর মত মিলিতেছে। এই দৃশ্যে একটা উদাস ও করুণ নির্বেদ থাকে; তেমনই আবার একটা উদার, বিক্ষোভবিহীন, অপার শান্তিও থাকে।

একটা নদীর কথা বলিব। তখন এপ্রিল মাস, ১৯১৩ সনের এপ্রিল মাস। 'কণ্ডর'-জাহাজে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইতেছি। ('কণ্ডর' ১৯৩০ সনে কালবৈশাখীতে ব্রহ্মপুত্রে ডুবিয়া গিয়াছিল।) সেদিন পদ্মা ও পদ্মার চরের যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে আর কখনও দেখি নাই।

জাহাজে যাত্রী বিশেষ ছিল না, ডেক ফাঁকা ছিল, তাই এপাশ-ওপাশ করিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। তবুও আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দোতলার ডেক হইতে সারেং-এর ব্রীজে উঠিয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম ভুলি নাই। দিনের আলো প্রখর হয় নাই, বাংলার বড় নদীর

উপরে রৌদ্র কখনই প্রখর মনে হয় না, উহাতে শুধু একটা উজ্জ্বলতা আসে। সেই আলোতে চরের বালি একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেন জানি না, সমস্ত বালি সেবার সোনালী রং-এর ছিল, সাদা নয়। পদ্মাকে সেদিন শোণের মত হিরণ্যবাহু বলা যাইত, বিশালতার হিরণ্যবাহু। দিগন্ত-প্রসারিত সোনার বালু যেন জলিতেছিল। টার্নারের চিত্রের কথা সবেমাত্র পড়িয়াছিলাম, বইটা নীচের ডেকের উপর পড়িয়া ছিল। মনে হইল টার্নারের ছবিই দেখিতেছি। অবশ্য তখনও টার্নারের মূল ছবি দেখি নাই, শুধু উহার একটা ধারণা কল্পনায় ছিল।

তারপাশা বা লৌহজঙ্গ স্টেশনের অল্প পুব হইতে পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গম পর্যন্ত একটা বহুবিস্তৃত চড়া ছিল। বহরের খাড়ি বর্ষাকাল ভিন্ন চলে না, সেই জন্য জাহাজ সেই চড়ার দক্ষিণ দিক দিয়া চাঁদপুরের দিকে যাইতেছিল। কতক্ষণ পরে দেখিলাম দূরে পদ্মা-মেঘনার সঙ্গম প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত দেখা যাইতেছে। দুই-এর ভেদরেখা সূক্ষ্ম, একদিকে পিঙ্গল জল, আর একদিকে গভীর কালো জল। রেখাটা মাইলের পর মাইল জুড়িয়া স্পষ্ট।

সুখানী চাকা ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, মাঝে মাঝে শুধু চাকাটাকে এক-আধটু ঘুরাইতেছিল। সঙ্গম-রেখার উপর পৌঁছিবামাত্র তাহার হাতে হালের চাকা চরকির মত ঘুরিতে লাগিল; দেখিলাম, বিন্যাকলে কম্পাস ঘুরিতেছে, হালের চাকার স্তম্ভের উপরের কাঁটা প্রায় চব্বিশ পয়েণ্ট ঘুরিয়া গিয়াছে। জাহাজ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিতেছিল, ঘুরিয়া একেবারে উত্তরমুখী হইয়া চাকার আবর্তনে গর্জন ও আলোড়ন তুলিয়া পদ্মার বুক হইতে মেঘনার বুকে আসিল। অল্পক্ষণ পরে রাজবাড়িতে কেদার রায়ের মাতার চিতার উপরের মঠ বাঁদিকে রাখিয়া ধক্‌ধক্ করিয়া নারায়ণগঞ্জের দিকে চলিল।

আমি অতি শৈশব হইতে জাহাজে চড়িয়াছি। ইহার ফলে বরাবরই মনে হইয়াছে, বাংলার পল্লীজীবনে স্টীমারের আনাগোনা একটা বড় রোমান্স। একবার বাল্যকালে নিজেদের দেবোত্তর সম্পত্তির কালী ও কাছারী বাড়ী হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাইতেছিলাম। মাইল বারো পথ ও শেষরাত্রি। একটা মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই পূবদিগন্তে—সেখানে তখন ভোরের অস্ফুট আলোও ফুটে নাই—একটা উজ্জ্বল বিভা দেখা দিল, সেটা আবার সচল। এটা কি জিজ্ঞাসা করাতে সঙ্গে যে মুসলমানটি ট্রাঙ্ক বহিয়া ও রক্ষী হিসাবে যাইতেছিল সে বলিল উহা জাহাজের আলো। বুঝিলাম, মেঘনার উপর দিয়া সার্চলাইট

ঘুরাইয়া জাহাজ যাইতেছে। কিন্তু সে কতদূরে, অন্ততঃ বিশ মাইল!

আবার মাতুলালয়ে গেলে রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া স্টীমারের ভোঁ শুনিতে পাইতাম। মনে হইত তিন মাইল দূর হইতে মেঘনা ডাকিতেছে। কিন্তু সে কি ভীষণ গম্ভীর ডাক। মোটেই বিলাতী স্রোতস্বিনীর সমুদ্রে যাইবার জন্য কুলকুল করিয়া নিমন্ত্রণ নয়। এ অন্য ব্যাপার—'বরিশাল-গানস্'-এর কথা শুনিয়াছিলাম। সাগরের অতলতলে যে গুহা আছে, তাহাতে জল আছড়াইয়া পড়িবার সময়ে বোধ করি গ্রুম্ গ্রুম্ করিয়া ঘোর গর্জন হয়, সেই গর্জনের সহিত স্বর মিলাইয়া যেন মেঘনা স্টীমারের ভোঁর স্বরে কোন চির-অন্ধকারময় পাতালে বন্দী হইবার জন্য ডাকিতেছে। শুনিয়া ভয় হইত বলাই বাহুল্য।

কিন্তু স্টীমারে চড়িলে মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদল হইয়া যাইত। মনে হইত লোকালয়েই আছি। ইহার কারণ ছিল—স্টীমার একটি ছোট ভবের হাট। একটা জনসমাজ উহাতে থাকিত; কেহ কাহারও চেনা, অন্যেরা অপরিচিত, তবু শুধু মানুষ বলিয়াই আপন। তাই স্টীমারের উপর হইতে তীরকে, এমন কি স্টেশন-কেও অজানা পরলোক বলিয়া মনে হইত, বুঝিতে পারিতাম না কেন লোক সেখান হইতে স্টীমারে আসিতেছে, কেনই বা স্টীমার হইতে নামিয়া সেখানে যাইতেছে। যাহারা নামিত উঠিত, তাহাদের কাছে, নিজেদের ঘরবাড়ী অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সত্য; তাহারা জানিত সেখানে মা আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা, ভাইবোন সকলেই আছে। কিন্তু অন্য লোকের তাহা মনে হইত না। তাহারা ভাবিত পরিচিত স্টীমারের ইহলোক হইতে উদাস চড়াতে নামিয়া লোকগুলি যেন কোন অপরিচিত ছায়াময় লোকে উধাও হইয়া যাইতেছে। দু-চারটা যে পালকি, ডুলি এমন কি ছ্যাকরা গাড়ি থাকিত সেগুলিকেও পরলোকের রথ বলিয়াই মনে হইত। স্টীমার ছাড়িবার পর, যে যাত্রীরা নামিয়া গিয়াছে তাহাদের একে একে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়া মনে যে নির্বেদ আসিত, তাহা আমি আরও তীব্রভাবে বাহরেইন-এ একটি এরোপ্লেনকে যাত্রী লইয়া ধূসর মরুবালু হইতে উঠিয়া ধূসরতর আকাশে বিলীন হইয়া যাইতে দেখিয়া অনুভব করিয়াছিলাম।

কিন্তু জাহাজ যতক্ষণ সিঁড়ি ফেলিয়া ঘাটে বাঁধা থাকিত ততক্ষণ আবার একটা অত্যন্ত সামাজিক ব্যাপার মনে হইত। রবীন্দ্রনাথ স্টীমারঘাট সম্বন্ধে শিশুদের জন্য অতি সুন্দর একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, উহা বয়স্কের ভাল লাগিবে। খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"............ঘন ঘন ডাক ছাড়ে
স্টীমারের বাঁশী ; কে পড়ে কাহার ঘাড়ে,
সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে,—
ঠেলাঠেলি বকাবকি। শিশু মার কোলে
চীৎকার-স্বরে কাঁদে। গড় গড় ক'রে
নোঙর ডুবিল জলে ; শিকলের ডোরে
জাহাজ পড়িল বাঁধা ; সিঁড়ি গেল নেমে।
এঞ্জিনের ধকধকি সব গেল থেমে।"

এর পর যাত্রীদের ডাঙায় নামার পালা।—

"কুলি, কুলি ডাক পাড়ে, ডাঙা হতে মুটে
হুড়দাড় ক'রে এল দলে দলে ছুটে।
তীরে বাজাইয়া হাঁড়ি গাহিছে ভজন
অন্ধ বেণী।"

যাত্রীরা যে যার পথে চলিয়া গেল, তার পর—

"শূন্য হয়ে গেল তীর। আকাশের কোণে
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দূরে বাঁশবনে
শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদির দোকানে
টিম্ টিম্ ক'রে দীপ জ্বলে একখানে।"

ইহার পর বাংলার জলের অন্য রূপের কথা বলিতে হয়। তাহারও বিচিত্রতা কম নয়। মাঝারি নদীর চেহারা প্রায় বড় নদীরই মত, শুধু স্বল্পপরিসর। আমি উহাদের দেখিলে, 'জাতসাপের বাচ্চা' এই কথাটার অনুকরণে, 'জাতনদীর বাচ্চা' বলিতাম। কিন্তু ছোট নদীর মূর্তি ও প্রকৃতি একেবারে অন্য রকমের ছিল। সেগুলির এত জল বা স্রোত কখনই হইত না যে পাড় কাটিয়া সোজা পথে যাইতে পারে। তাই সেগুলি বনবাদাড়ের মাঝখান দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঁকের পর বাঁকে চলিত। দুই বাঁকের মধ্যে সোজা খাত দেখা যাইত যেন জলের ফিতা, কিন্তু এই অংশটুকুর দৈর্ঘ্য বেশী হইত না, পানকৌড়ি একডুবে উহার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে পারিত। প্রায়ই দেখিতাম, পানকৌড়ি টুপ্ করিয়া ডুব দিয়া জলের উপরে লাঙ্গলের রেখার মত দাগ তুলিয়া দূরে গিয়া আবার উঠিতেছে। কাছে না যাওয়া পর্যন্ত মনে হইত নদী বাঁকের কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে—তাহার পর শুধু জঙ্গল। এই সব বাঁকের জন্য কোনও জায়গায়

পৌঁছিতে আরও কতদূর যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেই মাঝিরা বলিত, "চার বা ছয় বাঁক, বাবু।"

এই সব নদীতে জল এত বেশী হইত না যে দাঁড় বাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই দ্রুত চলিবার জন্য এক বা এক দুই লগি ব্যবহৃত হইত। আমরা কখনও কখনও মাঝির হাত হইতে লগি লইয়া তাহাদের কাজের বিঘ্ন করিতাম। তবে একটু হুঁকা টানিয়া লইবার অবকাশ পাইত বলিয়া তাহারা বেশী আপত্তি করিত না। যে মাঝি হাল ধরিত তাহার অবশ্য খুবই উৎপাত হইত। সে হাসিয়া মাঝে মাঝে হালে এমন টান দিত যে, নৌকার মুখ হঠাৎ ঘুরিয়া আমাদের পড়িয়া যাইবার মত হইত। আবার হঠাৎ দেখিতাম উঁচু পাড়ের জঙ্গল হইতে কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, উহা স্বর্ণ গোধিকা।

এই সব নদী খোলা জায়গায় পড়িলে দেখিতাম, ক্ষেত ডুবিয়া দুই ধারে বিলের মত হইয়া গিয়াছে। নদীর জলে ও এই সব জায়গার জলে বেশ পার্থক্য থাকিত। নদীর জল বহমান, চঞ্চল, কম্পিত, উহা রোদে ও আলোতে এত চিক্‌মিক্ করিত যে, জলের নীচে কিছুই দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু ডোবা মাঠের জল স্বচ্ছ ও নির্মল হইত। তাহার ভিতর দিয়া নীচে রাশি রাশি লতার মত ঝিরঝিরে পাতার উদ্ভিজ্জ দেখিতাম। উপরে কোথাও কোথাও সারাটা জায়গা জুড়িয়া থাকিত অগণিত শামুকের পাতা, সাদা ও লাল ফুল। উহার মৃণাল ছিঁড়িয়া টানিয়া তুলিতাম। অন্য জায়গা দেখিলে মনে হইত, একখানা বিরাট কাঁচের শার্সি বা আরশী।

ইহার পরও বড় বিল বা 'হাওর' ছিল। আমাদের কাছে এগুলিকে সমুদ্রের মত মনে হইত। ময়মনসিংহ জেলায় 'হাওরে' গিয়াছি, কিন্তু শ্রীহট্ট জেলায় যাই নাই। শুনিয়াছি সেখানকার 'হাওর' পার হইতে দিনমান লাগিত, জোর হাওয়া থাকিলেও।

বাংলার সৌন্দর্যের চরম রূপ যাতে দেখা গিয়াছে, বাঙালীর জীবনে প্রাণরস যেখান হইতে আসিয়াছে, সেই জলরাশিকে বাদ দিয়া নূতন ভালবাসা বাঁচিতে পারিত না। বাংলার পুরাতন পীরিতিও জলকে বাদ দেয় নাই। দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। প্রথমটি জ্ঞানদাস হইতে,—

"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
ঝন্‌ঝন্-শবদে বরিষে।

পালঙ্কে শয়নে-রঙ্গে বিগলিত-চীর-অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥"

দ্বিতীয়টি ভারতচন্দ্র হইতে, বিদ্যা সুন্দরকে বলিতেছে,—

"ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর থরথরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগালি করি ॥"

বিদ্যাপতির "ই ভর বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর,"—ইহা ত সকলেরই জানা।

ইহাদের সকলের পরে আবির্ভূত হইয়া নূতন বাঙালী কবি বাংলার জলের কথা ভুলিয়া যাইবে, তাহা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই প্রথম হইতে দেখিতে পাই, আবির্ভাবের পর হইতেই বাংলার নূতন ভালবাসা বাংলার সনাতন জলের সঙ্গে মিশিয়া আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব।

'ইন্দিরা', 'রজনী', ও 'দেবী চৌধুরাণী', বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনটি উপন্যাসই উচ্ছলিত প্রেমের গল্প। তিনটিই বাংলার জলের সহিত অঙ্গাঙ্গীভূত। ইন্দিরা বলিতেছে,

"আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত-জন্যে সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে।"

নৌকা গ্রামের ঘাটে বাধা ছিল। সে-সময়ে ইন্দিরা দুইটি মেয়েকে গান গাহিতে শুনিয়াছিল,—

"মেয়ে দুইটির বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কানে দুল, হাতে আর গলায় একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ করা শিউলি-ফুলে ছোবানো, দুইখানি কালোপেড়ে শাড়ী পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একট গান গাহিতে গাহিতে নামিল। গানটি মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়।"

এর পর গানটি, আমি উহার কয়েকটি কলি উদ্ধৃত করিব।

"ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে,
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

* * *

"বিনোদবেশে মুচকি হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধরে গরব ক'রে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

* * *

"যত ছেলে খেলা ফেলে
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী জুজু বুড়ী
ধরবে কত জল,
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল
সই, বাজিয়ে যাব মল॥"
(দুইজনে)
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল্॥"

ইন্দিরা বলিতেছে, "বালিকাসিঞ্চিতরসে এ জীবন কিছু শীতল হইল।"

এর পর অন্ধ রজনীর উক্তি,

"দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব! গঙ্গার তরঙ্গ-রব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম!"

রজনীর সেই মূর্তি শচীন্দ্রনাথ স্বপ্নে দেখিলেন,

"অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচি-বিক্ষেপ-চপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথায় ঊষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

এইবার দেবীচৌধুরাণী! প্রথমে ত্রিস্রোতার দৃশ্য—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে, সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত-স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"

এই নদীরই উপর একটা "বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!"

"ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল

পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপরে বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যা-ই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পুরিয়াছে। তাহার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবনবর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পুরিয়া টল-টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।"

এই প্রসঙ্গে প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গায় সাঁতারের কথাও সকলেরই মনে পড়িবে, তাই উদ্ধৃত করিলাম না।

বাংলার প্রাকৃতিক রূপের সহিত নূতন প্রেমের অঙ্গাঙ্গীকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যেমন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তেমনই। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথে এই সম্পর্কের আরও নিবিড়তা দেখা যায়। তাঁহার গল্প-উপন্যাসে প্রেমের নানা রূপের সহিত বাংলার জলের নানা রূপের যে সঙ্গতি দেখা যায় তাহা অপূর্ব। কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত দিবার আগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা প্রয়োজন। তাঁহার কবি-প্রতিভাও বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাংলার জলের মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার গল্পের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট উহাদের ঘটনাস্থলও তাঁহারই যৌবনকালের আবেষ্টনী।

আবেষ্টনীটা এই। কুষ্টিয়া বা শিলাইদহকে কেন্দ্র করিয়া মাইল পঁচিশেক ব্যাসার্ধ ধরিয়া একটি বৃত্তাংশ টানিলে তাহার মধ্যে পদ্মা, গোড়াই, পাবনার ইছামতী ও আত্রাই, বাংলার যমুনা (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের নূতন খাত)—এই সব লইয়া একটা নদীমাতৃক অঞ্চল পড়িবে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বহু বৎসর কাটাইয়া ছিলেন, আবার তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলির আবেষ্টনীও এই অঞ্চল। এই অঞ্চল ছাড়া গল্পগুলি কল্পনা করা যায় না। আমি দেশে যাতায়াত

সূত্রে এই সমস্তটা অঞ্চল বহুবার দেখিয়াছি। একটা দিন এখনও আমার জীবনে চিরস্থায়ী উষার মত রহিয়া গিয়াছে। সেদিন আমি একটা মন্থরগামী ট্রেনে সিরাজগঞ্জ হইতে পোড়াদহ পর্যন্ত আসিয়াছিলাম। হায়! কয়জন কলিকাতার আজিকার বাঙালী এই দৃশ্য দেখিতে পায়!

কিন্তু গল্প, আবেষ্টনী ও জীবনের এই সংযোগ রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে করেন নাই। এই অঞ্চলে থাকার সময়ে তিনি ইহার সহিত পাঠ্য বিষয়ের ও লেখার বিষয়ের যে একটা নিবিড় যোগ হওয়া উচিত তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য চূড়ান্ত। ১৮৯২ সনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে সেখানে কি উপন্যাস পড়া বা লেখা যায় সে সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিলেন,—

"ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরেজী নাম, ইংরেজী সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম; বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে।"

রবীন্দ্রনাথ যতদিন সত্যকার গল্প-লেখক বা ঔপন্যাসিক ছিলেন, যতদিন গল্প ও উপন্যাসের নামে সমাজতন্ত্রের বই লেখেন নাই, ততদিন গল্প-উপন্যাসে তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার একটা দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। তাই এর পরই লিখিলেন,—

"কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে।"

ইহার আগেও রবীন্দ্রনাথ এই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছিলেন—পৃথিবীর একটি বিখ্যাত উপন্যাস সম্বন্ধে। 'আনা কারেনিনা' সম্বন্ধে আটাশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"আনা কারেনিনা পড়তে গেলুম, এমন বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এরকম সব sickly বই পড়ে কি সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশীক্ষণ পোষায় না।"

তবে এখানে কি পড়া, কি লেখা যাইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভাল ভাল মেয়েলী রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হ'ত। বেশ ছোট নদীর কলরবের মত, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাটো কথাবার্তার মত, বেশ নারকেল-পাতায় ঝুরঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘন ছায়া, এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধের মত—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ! মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদী-স্নেহ-বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের নয়।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে নাই। তিনি পদ্মা তীরের বাংলার যে অপরূপ কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা একই সঙ্গে রূপকথা ও বাঙালীর আত্মজীবনী। আমার নিজের আত্মজীবনীর প্রথম অংশও এই বাংলারই স্মৃতিকথা, ঊষর উত্তরাপথে বসিয়া লেখা।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যরচনার মধ্যে ছোটগল্পই শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যেও আবার নিম্নলিখিত গল্পগুলিকে আমি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি—

কঙ্কাল; একরাত্রি; জীবিত ও মৃত; মধ্যবর্তিনী; সমাপ্তি; মেঘ ও রৌদ্র; নিশীথে; মানভঞ্জন; অতিথি; মণিহার; দৃষ্টিদান; নষ্টনীড়।

এই বারোটি গল্পের মধ্যে আটটি বাংলার জলের সহিত সংশ্লিষ্ট, কতকগুলি জল ভিন্ন দাঁড়াইত না; এই আটটির মধ্যে ছয়টি পাবনা অঞ্চলের, একটি ভাগীরথীতীর ও পদ্মার তীরের মধ্যে বিভক্ত, একটি নোয়াখালি জেলার। বাকী চারিটি মাত্র কলিকাতার। পল্লী-অঞ্চলের গল্পগুলি ও কলিকাতার গল্পগুলির মধ্যে আর একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পল্লী-অঞ্চলের সবগুলি গল্পই উদার ও করুণ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি, "সাদাসিধে সহজ উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ।" কলিকাতার চারটি কাহিনী গল্প হিসাবে, আর্ট হিসাবে অতি উচ্চস্তরের, কিন্তু প্রত্যেকটি নিদারুণ-ভাবে নির্মম ও কঠিন। এই গল্পগুলির নিষ্ঠুরতা মোপাসাঁর গল্পের নিষ্ঠুরতার মত।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও জলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'নৌকাডুবি'

উপন্যাস হিসাবে খুব বড় জিনিস নয়, কিন্তু উহার মধ্যে রমেশ ও কমলার গোয়ালন্দ হইতে গাজিপুর পর্যন্ত গঙ্গার স্টীমারযাত্রার অংশটুকু অতি সুন্দর। 'গোরা'তেও গল্পের দিক হইতে যে ঘটনাটি সব চেয়ে প্রাণস্পর্শী তাহাও স্টীমারেই ঘটিয়াছে। গঙ্গার বুকে স্টীমারে আসিতে আসিতে ললিতা বিনয়ের প্রতি নিজের ভালবাসা আবিষ্কার করিল। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে এই অংশ-টুকুর মত মাধুর্যপূর্ণ বর্ণনা কমই আছে। আমি উহা উদ্ধৃত করিব। প্রথমেই স্টীমারের কথা,—

"ললিতা ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিক চাহিয়া দেখিল, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনও নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে—এই মাত্র একটি শীতল বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে, এবং নীচের তলায় এঞ্জিনের খালাসিরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতরো চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে।"

আমি একদিন শেষরাত্রে ভৈরব বাজারে স্টীমারে উঠিয়া মেঘনার বুকে ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটিতে দেখিয়াছিলাম, সঙ্গে অবশ্য কোনও ললিতা ছিলেন না।

তারপর ললিতার কথা,—

"ললিতা ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াই দেখিল, অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ওইখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে। এত নিকটে, তবু এত দূরে!

"ডেক হইতে তখনই ললিতা কম্পিতপদে ক্যাবিনে আসিল; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যুষে সেই অন্ধকারজড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের দিকপ্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।"

সকালে দুইজনের মধ্যে একটু সম্ভাষণ মাত্র হইল :—

"ইহার পরে দুইজনে আর কথা কহিল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে

এমন প্রভাত আর কোনোদিন দেখে নাই।"

দুইজনে কলিকাতা ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে 'গোরা' উপন্যাস আবার প্রধানত সমাজতত্ত্বের আলোচনাতে পরিণত হইল। কলিকাতা ও ব্রাহ্মসমাজের লোক হিসাবে হারাণবাবু বিনয় ও ললিতার একত্রে স্টীমারে আসা সম্বন্ধে এই রায় দিলেন—

"কোনো কুমারীকে তার মায়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে যদি বাইরের পুরুষের সঙ্গে একলা এক জাহাজে ভ্রমণ করতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সে সম্বন্ধে কোন্ সমাজের আলোচনা করবার অধিকার নেই জিজ্ঞাসা করি।"

হারাণবাবু নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন, বিবাহিতা রমণী ওইভাবে পরপুরুষের সহিত স্টীমারে ভ্রমণ করিলে ডিভোর্সের মামলা হইতে পারে। বাংলার জলে ও কলিকাতার ইটে মনোভাবের এই প্রভেদ হইতে বাধ্য। তবে গ্রাম্যবালিকা কলিকাতায় বধূ হইয়া আসিয়া বলিয়াছিল,—

"সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট—
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা।"—

তাহার কানে আর একটা ধ্বনি বাজিতেছিল,—

"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চস্—
পুরোনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল।"

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে শুধু যে প্রেমের সহিত জলের যোগই আছে তাহাই নয়, ইহার উপরেও কিছু আছে—কি করিয়া প্রেমের বিভিন্ন রূপের সহিত জলের বিভিন্ন রূপের যোগ তিনি ঘটাইয়াছেন তাহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়। হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানিয়া শুনিয়া এই সমন্বয় করেন নাই, এই যোগাযোগ সম্ভবত অন্তর্নিহিত অনুভূতির জোরেই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ফলে প্রেমের বিশিষ্ট রূপের সহিত জলের বিশিষ্ট রূপ যে-ভাবে এক হইয়া গিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইহা গভীর অন্তর্দৃষ্টি হইতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহাকে আমরা অন্তর্দৃষ্টি বলি উহা যুক্তির ব্যাপার নয়।

'এক রাত্রি', 'নিশীথে' ও 'সমাপ্তি' শুধু এই তিনটি গল্পের প্রসঙ্গেই প্রেমের

সহিত জলের যোগের কথা বলিব। 'এক রাত্রি' গল্পের নায়ক কলিকাতায় পড়াশুনা করিবার সময়ে বাল্যসঙ্গিনী সুরবালার সহিত বিবাহের প্রস্তাব কানে তোলে নাই। পরে যখন নোয়াখালি জেলার এক জায়গায় সে মাস্টারী লইয়া গেল তখন জানিতে পারিল, সেখানকার সরকারী উকিল রামলোচন রায়ের স্ত্রী তাহার সেই বাল্যসখী।

সে মাঝে মাঝে রামলোচনবাবুর বাড়ী যাইত। একদিন যাওয়ার পর বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে শখের গল্প হইতেছিল এমন সময় সে অনুভব করিল, পাশের ঘর হইতে কেহ যেন তাহাকে দেখিতেছে। হঠাৎ সুরবালার মুখ তাহার মনে পড়িয়া গেল—"সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতর হইতে টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।"

এই ভাব কেন হইল তাহার আলোচনা অন্যত্র করিব, কারণ গল্পটি তিন দিক হইতে তখনকার বাঙালী জীবন সম্বন্ধে গভীর অনুভূতির প্রকাশ। এখানে শুধু নিরাশ বা ব্যর্থ প্রেমের সহিত জলের সংহারক ও ভয়ঙ্কর মূর্তির কি যোগ তাহাই দেখাইব।

সেদিন হইতে তাহার আর কাজে মন বসে না, ছুটি হইয়া গেলে ঘরে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, অথচ দেখা করিতে লোক আসিলে অসহ্য ঠেকে। যত সে মনকে বুঝাইতে চায় সুরবালা তাহার কেউ নয়, ততই তাহার মন বলে,—সত্য, সুরবালা আজ তোমার কেউ নয়, কিন্তু সুরবালা কি না হইতে পারিত।

এই অবস্থায় এক রাত্রিতে—তখন রামলোচনবাবু মোকদ্দমার কাজে মফঃস্বলে গিয়াছেন—প্রচণ্ড ঝড়ের পর বান আসিল। সে যেমন পুকুরের উঁচু পাড়ে গিয়া দাঁড়াইল, আর দিক হইতে সুরবালাও উঠিয়া আসিল। দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল,—

> "তখন প্রলয় কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিতেও ক্ষতি ছিল না, —কিন্তু একটি কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।
>
> "কেবল দুইজন অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।"

তাহার মনে হইল, আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। শৈশবে সুরবালা

কোন্ জন্মান্তর হইতে ভাসিয়া আসিয়া সূর্যচন্দ্রালোকিত পৃথিবীতে তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল, কতদিন 'পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া সেই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে একাকিনী তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জন্মস্রোত নববালিকাটিকে তাহার কাছে আনিয়াছিল, মৃত্যুস্রোত বিকশিত পুষ্পটিকে আবার কাছে আনিয়াছে। এখন একটা ঢেউ আসিলেই বিচ্ছেদ কাটিয়া দুইজনে এক হইয়া যায়। কিন্তু সে বলিল,—

"সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহ ধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি···

"আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রি উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"

অনেকের মন এত সঙ্কীর্ণ, এত ক্ষুদ্র যে এই লোকোত্তর অনুভূতি তাহাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হইতে পারে। কিন্তু কাপুরুষ না হইলে প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিলে মানুষ মাত্রেরই দৈনন্দিন সামান্যতা ছাড়িয়া অনুভূতির উচ্চতম স্তরে উঠিবার ক্ষমতা হয়। তখন তাহার ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক তীব্রতা আসে, মানসিক উদারতার অপরিসীম প্রসার হয়, সুখ-দুঃখকে সমান গৌরব মনে হয়, আত্মবিসর্জনের একটা দুর্নিবার ঝোঁক আসে। আমি নিজেও উহা খানিকটা অনুভব করিয়াছি।

কিশোরগঞ্জে একদিন ভূমিকম্পে আমাদের সমস্তটা পাকা বাড়ী একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। আমি শুইয়া একটা ইংরেজী উপন্যাস পড়িতেছিলাম, এমন সময় ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়া যখন বাহির হইতে যাইতেছি তখন দেখিলাম মা দৌড়িয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া আমার জ্বরগ্রস্ত ছোট ভাইকে নিতে আসিয়াছেন। চীৎকার করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলাম, কিন্তু মা পরে বলিয়াছিলেন—তিনি কিছুই শোনেন নাই, কারণ চারদিকে একটা সর্বব্যাপী গুরু-গুরু শব্দ হইতেছিল। তাঁহাদের বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াই আমিও এক দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলাম। দুই চার পা গিয়াছি, তখন দেখি সমগ্র বাড়ীটা কাঁপিতে কাঁপিতে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকটি ইটকে যেন খসিতে দেখিলাম, দেখিলাম ছাতের কার্নিশ কাত হইয়া

নীচের দিকে আসিতেছে, দেখিলাম দেয়াল ও ছাতের বড় বড় চাই ধীরে ধীরে বাহিরের উঠানের ঘাসের উপর দিয়া ফুটবলের মত গড়াইয়া যাইতেছে। বাড়ী পড়িয়া যাইতে মিনিটখানেক লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু সেটা যেন এক দণ্ড মনে হইল। চোখের ও অনুভূতির এত তীব্রতা আসিয়াছিল যে আজও মনে হয় যেন একখানা ফোটোগ্রাফ তোলা আছে, বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি।

আর একবার একটা প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোনের পর কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলাম। ১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস। সিরাজগঞ্জ হইতে স্টীমারে উঠিবার পরই দেখিলাম, নদীর পূর্বতীরের গাছপালা যেন বিধ্বস্ত মনে হইতেছে, সারারাত যেন ঝড় বহিয়াছে। ময়মনসিংহ শহরে পৌঁছিয়া শুনিলাম, ট্রেন যাইবে কিনা সন্দেহ—টেলিগ্রাফের লাইন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, স্টেশনে খবর দিবার কোন উপায় নাই. ট্রেনের চলা বিপজ্জনক। তবু সন্ধ্যা নাগাদ সিটি দিতে দিতে ধীরগতিতে ট্রেন চলিল। ময়মনসিংহের কাছে ব্রহ্মপুত্রের পুল পার হইয়া বিশ্‌কা স্টেশনের কাছে আসিতেই দেখিলাম, ঝড়ে একটা ট্রেনের কয়েকটা গাড়ীকে উড়াইয়া পাশের ধানক্ষেতের উপর ফেলিয়াছে। চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।

কিশোরগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, চারিদিক অন্ধকার, যানবাহন নাই। মালপত্র স্টেশনে রাখিয়া একা হাঁটিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম, মাইল দেড়েক পথ। চলিতে পারি না, গাছ পড়িয়া জায়গায় জায়গায় রাস্তা বন্ধ। চারিদিক এত অন্ধকার যে বাড়ীঘর আছে কি নাই তাহাও বুঝিতে পারা কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে রাস্তা হইতে নামিয়া নদীর পাড়ে দিয়া বন্ধ জায়গা অতিক্রম করিয়া আবার রাস্তায় উঠিতে লাগিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি, চারিদিক যেন ছন্ন-ছাড়া—বাড়ীটা পাকা, তাই পড়ে নাই। 'বাবা', 'বাবা' বলিয়া তিন-চারবার ডাক দিলাম—খবর দিই নাই, সুতরাং তাঁহারা জানিতেন না। যখন বাবা উত্তর দিলেন, "কে? নীরু?" তখন মনে হইল যেন আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

দাদার কাছে ঝড়ের বর্ণনা শুনিলাম। রাত্রি এগারোটা-বারোটা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল, সেই মেঘ ঘেরাটোপের মত, উহার ভিতর হইতে একটা পিঙ্গল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আর রাত্রি দুপুর হইতে একটা দম্‌দম্‌ শব্দ হইতে লাগিল, যেন বহু দূর হইতে একটা সেনাবাহিনী তামার দামামা বাজাইয়া আসিতেছে। ক্রমে সেই শব্দ বহু রথের চাকার ঘর্ঘরের মত হইয়া দাঁড়াইল। রাত তিনটা হইতে ঝড় বহিতে লাগিল। ক্রমাগত

হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া চলিল, ইহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া সাইক্লোনের ধর্মমত আবার উল্টা দিক হইতে বহিল। বাড়ীর টিনের বারান্দার একটা কোণ মচকাইয়া কাগজের মত ভাঁজ হইয়া গেল। খোলা থাকিলে সমস্ত বারান্দা উড়িয়া যাইতে পারে, তাই ভাইরা ও চাকররা ও বাবা কাছি দিয়া বাঁধিয়া চালটাকে আবার ঠিক জায়গায় আনিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

সকালে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম, হাকিমদের বাংলোর বড় বড় ভারী টিনের চাল ঘুড়ির মত উড়িয়া গিয়া হয় দীঘিতে, নয় ক্ষেতে পড়িয়া আছে। এই তাণ্ডব ঝড়ের মধ্যে যদি উপস্থিত থাকিতাম, আর যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া জানিতাম যে তাহাকে কখনও পাইব না, তখন নিশ্চয়ই মনে হইত এই সাইক্লোনে নিরুদ্দেশ হইয়া উড়িয়া যাইবার মধ্যেও একটা উচ্ছ্বসিত সুখ আছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বান নিজে দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার অল্পবয়সে ওই দিকে অতি সর্বনাশকারী বান একাধিক হইয়াছিল। উহার বর্ণনা পড়িয়া নিজের মনে যে চিত্র জাগিয়াছিল তাহার জোরেই 'এক রাত্রি' গল্পের লোকোত্তর অনুভূতি তিনি আনিতে পারিয়াছিলেন। আমিও সেই বান দেখি নাই, বর্ণনা মাত্র পড়িয়াছি, তবে আমি অন্য রকম বন্যা দেখিয়াছি। সেটা এত আকস্মিক এবং প্রলয়ঙ্করী না হইলেও, আরও ব্যাপক ও সর্বনাশকারক। সুতরাং জলের এই মূর্তি দেখিয়াও মনের ভাব কি হইতে পারে তাহা কল্পনা করিতে পারি।

১৯১৩ সনের দামোদরের বন্যার বর্ণনা শুনিয়াছিলাম ও ছবি খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু নিজের চোখে সর্বব্যাপী বন্যা দেখিলাম ১৯২২ সনে উত্তরবঙ্গে। ইহার কথা সকলেরই জানা আছে। সিরাজগঞ্জ হইতে ট্রেনে ঈশ্বরদি আসিতেছি। গভীর রাত্রি, অন্য যাত্রীরা ঘুমাইয়া আছে। আমার কিন্তু ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না, প্রায়ই জাগি। সে রাত্রিতে জাগিবামাত্র দেখিলাম, ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে, শুনিলাম নীচে লোকে চীৎকার করিয়া কি নির্দেশ দিতেছি, তার পর ট্রেন আবার ধীরে ধীরে চলিতেছে। একবার উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, প্রায় দিনের মত পরিষ্কার, তবে রূপালী। চারিদিক জলে জলাকার, এক রেলের বাঁধ ভিন্ন কোথাও স্থলের চিহ্ন নাই। একটু পরেই ট্রেনটা একটা পুলের উপর আসিয়া

আরও বেগ কমাইয়া অতি ধীরে চলিল। দেখি নীচে নদীর জল প্রায় গার্ডার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আর আর ফেনায় ফেনায় আবর্তিত হইয়া ঘোর গর্জন করিয়া পুলের নীচ দিয়া যাইতেছে। জলের বেগ এত প্রবল যে দূরে কয়েকটা নৌকার মাঝিরা লগি ঠেকাইয়া নৌকাগুলিকে রুখিতেছিল, নহিলে সেগুলি পুলের উপর পড়িয়া ভাঙিয়া যাইত।

পুল পার হইয়া গাড়ী যখন খোলা জায়গার ভিতর দিয়া চলিল, তখন আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। জল উঁচু-নীচু হয় না প্রবাদেই আছে, বিজ্ঞানেও বলে। কিন্তু রেল লাইনের বাঁধের দুধারের জল একেবারে অসমতল। একদিকে জল লাইনের প্রায় কাছে উঠিয়াছে, অন্যদিকে ছয়-সাত ফুট নীচে। বুঝিলাম, পুল ও কালভার্টের অল্পতার জন্য জল এক দিক হইতে আর এক দিকে তাড়াতাড়ি সরিতেছে না। আরও একটা জিনিস দেখিলাম—পারে পারে শেয়ালরা বসিয়া আছে, ঊর্ধ্বমুখ হইয়া শৃগালজীবনের এই বিপর্যয়ের ধ্যান করিতেছে। ট্রেনের গর্জনে ও সান্নিধ্যে তাহাদের কোনও ভয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম, এই বন্যা লইয়া ঘোর তোলপাড়। পথে পথে গান গাহিয়া লোকে বন্যাবিধ্বস্তদের সাহায্যের জন্য টাকা তুলিতেছে। কিন্তু তাহার সুর আর বন্যার সুর বিভিন্ন প্রকার। লোকের দুঃখে বিচলিত হইয়া কলিকাতার নানা পল্লীর বেশ্যারাও টাকা তুলিবার জন্য দলে দলে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন একটি দল আসিয়া এসপ্লানেডে আমাদের আপিসের উঠানে ঢুকিল। দারোয়ান-পুলিস নিষেধ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু অর্ডিন্যান্স বিভাগের ডেপুটি-ডিরেক্টর কর্ণেল ব্রাউন জানালায় আসিয়া ইঙ্গিতে মানা করিলেন, পরে নিজেও কিছু টাকা দিলেন। মেয়েগুলিকে পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ শালীন দেখাইতেছিল, গানও খারাপ গাহে নাই। কিন্তু আমার সহকর্মীরা ভাল করিয়া দেখিয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এরা রামবাগানের দল না? কাল সোনাগাছি আর হাড়কাটার দল এসেছিল।" বুঝিলাম কলিকাতার কেরানীর বন্যার অনুভূতি আর বন্যাপীড়িত শৃগালের অনুভূতি এক নয়। মেসে ফিরিয়া বাঙাল মেস-মেটের উক্তি শুনিয়া এই পার্থক্যটা আরও অনুভব করিলাম। আমরা বাঙালরা শালীন হইতে চেষ্টা করি। তাই 'মাগী' বা 'খানকী', এমন কি 'বেশ্যা' শব্দও মুখে সহজে আসে না। সুতরাং মেসবাসীরা সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা তুলবার জন্যে 'প্রস্'-রা নাকি বেরিয়েছিল?" একেবারে বুনিয়াদী কথাটা মুখে আনিলেও ইহারা বন্যা হইতে

এর চেয়ে বেশী দূরে সরিয়া যাইতেন না।

'নিশীথে' গল্পে প্রেমের সহিত একটা গুরুতর অপরাধ জড়িত আছে বলিয়া উহাতে জলের আর এক রূপ দেখা যায়। আশা করি গল্পটা সকলেরই স্মরণ আছে। আমার একটা বড় দুঃখ এই যে, যখনই কোনও বিখ্যাত বাংলা গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাই, তখনই শ্রোতার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারি, ঘটনাগুলি ইঁহাদের একেবারেই জানা বা মনে নাই। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকের সহিত দেখা হইলে ব্যাপারটা আরও শোচনীয় দাঁড়ায়। তখনই তাঁহারা কতকগুলি চিরশ্রুত, পুরাতন বাঁধা বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ একজাতীয় ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল—এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়—মনে হয় এর বারো আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা।"

আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকগণ এই কথাই আমাদের শুনাইতেন, আমরা নিজেরাও উহাই পড়িয়াছি। কিন্তু আজকালকার অধ্যাপকেরা ইঁহাদেরও নকল শিষ্যানুশিষ্য। ইঁহাদের কথা ধৈর্য ধরিয়া শোনা যায় না। আমি ধরিয়া লইতেছি, আমার পাঠক-পাঠিকারা ইহাদের কথা ছাড়া মূল লেখারও সন্ধান রাখেন।

জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি গভীর অপরাধ করেন। তিনি পীড়িতা পত্নীর চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের যুবতী কন্যা মনোরমার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ দেখান। পত্নী তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য—অভিমান হইতে নয়—বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন। পরে দক্ষিণাবাবু মনোরমাকে বিবাহ করেন বটে, কিন্তু মনোরমাও তাঁহার প্রতি পূর্ণ প্রেম ব্যক্ত করিত না, তিনিও কল্পনায় সর্বদাই পত্নীর আর্ত 'ও কে, ও কে গো' প্রশ্ন শুনিতে পাইতেন। এই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি মনোরমাকে লইয়া বজরায় করিয়া পদ্মার বক্ষে চলিয়া গেলেন। প্রথমে মনে করিলেন, সেখানে শান্তি পাইয়াছেন। সে-পদ্মার এই রূপ,—

"ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জীব ভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির

চর ধূ ধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আম্রবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে,—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপঝাপ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।"

এই রকম চড়াতে একদিন রবীন্দ্রনাথের পত্নী এবং ভ্রাতৃবধূ বলেন্দ্রনাথের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছিলেন। উহার বর্ণনা 'ছিন্নপত্রাবলী'তে আছে,—

"উপরে উঠে চারিদিক চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না—সমস্ত ফ্যাকাশে ধূ ধূ করছে। একবার 'বলু' বলে পুরো জোরে চীৎকার করলুম—কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চারদিক থেকে দমে গেল, একখানা বড় খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর হয়। গফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম—আমি একদিকে 'বলু' 'বলু' করে চীৎকার করছি—প্রসন্ন আর এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোট মা'—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠছে।'

চারিদিকের দৃশ্য সে কি!

"সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল··· কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো—মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দ্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি···"

এই রকম চড়ায় দক্ষিণাবাবু মনোরমাকে লইয়া চন্দ্রালোকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ মনোরমা হাতখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাত টানিয়া ধরিল। তিনি মনে করিলেন, এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। এর পর কি হইল?

"এইরূপ চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর জল বাঁধিয়া আছে।

"সেই মরুবালুবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে

আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা খসিয়া পড়িল; আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

"সেই সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—'ও কে। ও কে। ও কে।'

"আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পক্ষীর ডাক।"

যিনি রাত্রিতে বড় নদীর চর দেখিয়াছেন ও হঠাৎ জলচর পাখীর ডাক শুনিয়াছেন, তাঁহার কাছেই এই বর্ণনার ভয়াবহ সৌন্দর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এইবার 'সমাপ্তি'র কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় সমাপ্তির মৃন্ময়ীকে তাঁহার 'তিনকন্যা'র এক কন্যা করাতে গল্পটির সহিত অনেকের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়াছে। কিন্তু উহার ফলে অন্তরঙ্গতা কতটা হইয়াছে বলিতে পারি না। আমি গল্পটি বাল্যকালে—১৯১১ কি ১৯১২ সনে প্রথম পড়ি, তার পর আরও অনেক পড়িয়াছি, পড়িতে পড়িতে প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

গল্পটির নাম 'সমাপ্তি'। কিসের সমাপ্তি? প্রশ্ন কখনও করিয়াছি। তবে যে-উত্তর পাইয়াছি তাতে মনে হয়, আমাদের বাঙালীদের মানসিক ধর্মে একটা গেরো বা প্যাঁচ আছে, উহা হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। প্যাঁচটি আর কিছু নয়, অতি সহজ, চোখে দেখিবার জিনিসকে, কানে শুনিবার ব্যাপারকে তত্ত্বের গ্যাসে পরিণত করিয়া কচকচি পরিবেশ। একবার কোনও ফরমূলা বাহির করা গেল কি, তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই।

অথচ গল্পটার শেষ ছত্রে নামটা কেন দেওয়া হইয়াছিল, এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর আছে। ছত্রটি এই, "অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল—অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায় অসমাপ্ত চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।"

অর্থাৎ গল্পটির পুরা বিস্তার যাই হউক, উহার দীপ্ত শিখা একটি চুম্বনের ইতিহাস। একদিন উহা সমাপ্ত হয় নাই, অবশেষে গভীর অন্ধকারে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে চুম্বন লইয়া আর একটি বিখ্যাত গল্পের কথা মনে হইবে। সেটি অন্ধকারে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কখনই শেষ হয় নাই। সেই অসমাপ্ত

ও অসমাপ্য চুম্বনের জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট রিয়াবোভিচের জীবন একটা অর্থহীন, লক্ষ্যহীন পরিহাসে পরিণত হইয়াছিল। সমাপ্তিতে সেই অসমাপ্ত চুম্বন সমাপ্তি লাভ করিয়া, যাহারই প্রাণ আছে তাহারই কাছে চির-উচ্ছ্বলিত সুখের উৎস হইয়া রহিয়াছে।

সমস্ত গল্পটা জুড়িয়া বাংলার জল এই সুখের সাথী হইয়া আছে।

"শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া নদী একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশ ঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

"বহুদিন ঘনবর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

"নৌকায় আসীন অপূর্ব্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষার কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বলজ্বল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।"

এই 'লাইট-মোটিফ' সমস্ত গল্পটাতে আছে—

"ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।"

এর পর,—

"পরদিন কি মুক্তি, কি আনন্দ! দুই ধারে কত গ্রাম, বাজার, শস্যক্ষেত্র, বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে।"

আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব,

"দুই বেলা নিয়মিত স্টীমারে আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কি অবাধ স্বাধীনতা।"

শুধু কি এই? আগেকার অসাড়হৃদয়া মৃন্ময়ীর মনে ভালবাসার প্রথম আবির্ভাবের প্রতীকও সেই বাংলার নদী, বর্ষা ও মেঘ,—

"এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের সজল নব মেঘের মত তাহার হৃদয়ে একটি বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের

ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল।"

বাঙালী আজ তাহার জলরাশি হারাইয়া কলিকাতার সংকীর্ণতায় শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার প্রাণে এই ছবি সাড়া জাগাইবে কিনা জানি না, চোখে জল আনিবে কিনা বলিতে পারি না।

আমি এইটুকু বলিব, যদি কাহারও মুখে আমার জন্য এই অভিমান জাগিত তাহা হইলে তাহাকে বুকে বাঁধিয়া চুম্বনে-চুম্বনে অভিমান মুছিয়া দিবার আগে পায়ে পড়িয়া পদচুম্বন করিয়া বলিতাম,—

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি
মোরে পরায়েছ গৌরব-মুকুট।"

পুরুষের একটা ক্ষুদ্র দম্ভ আছে। সে পয়সা উপার্জন করে বলিয়া মনে করে নারীর ভালবাসা পয়সা দিয়াই কেনা যায়—বেশ্যার 'ভালবাসা'র উপর জোর আছে বলিয়া সে বুঝিতে পারে না, সত্যকার ভালবাসা পাওয়া কি দুর্লভ, কত বড় সৌভাগ্য। ইহার পর রূপে, বিদ্যায়, ধনে, বুদ্ধিতে নারীর যোগ্যতা বিচার করার মত মূঢ়তা কিছু হইতে পারে না।

'সমাপ্তি'তে এই ভালবাসাকে বাংলার জলের সহিত একীভূত দেখি। প্রথমেই বলিয়াছি, সে জল কতদিন দেখি নাই। তবু রাম সীতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও বাংলার জলের উদ্দেশে তাহাই বলিব—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নো—
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥"

হায়! দুর্মুখ আসিয়া শুধু আমাকে নয়, প্রতিটি বাঙালীকেই বলিতেছে,—

"দেব! উপস্থিতঃ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙালী সমাজ ও নূতন ভালবাসা

নূতন ভালবাসার সহিত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বহুমুখীন সঙ্গতির কথা আগেকার পরিচ্ছেদে আলোচনা করিলাম, উহা অনুভূতির ফল, যুক্তির নয়। এ ধরনের সামঞ্জস্য কেহই ইচ্ছা করিয়া, হিসাব করিয়া করিতে পারে না ; ইহার উপলব্ধি যদি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে না আসে তাহা হইলে একেবারেই আসে না। আমার মনেও উহার ধারণা যে জাগিয়াছে, তাহাও আমার বিচারবুদ্ধি হইতে আসে নাই—আসিয়াছে একদিকে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে আবেগ হইতে, অপরদিকে বই বা গল্পগুলির মধ্যে যে লোকোত্তর ভাব আছে তাহার অনুভূতি হইতে। ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইতে যাহা আসে, বিচার বা তর্ক হইতে তাহা কখনই আসিতে পারে না ; আজিকার দিনের হৃদয়হীন, কচ্‌কচি ব্যবসায়ী বাঙালীরা ইহা মনে রাখিলে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে আমরা সাধারণ বাঙালীরা ত্রাণ পাইতাম।

কিন্তু বাঙালীর সামাজিক জীবনের পুরাতন ধারার সহিত কি করিয়া নূতন ভালবাসার সমন্বয় করা যায়, সেই হিসাবটা প্রথম হইতেই সজ্ঞানে করা হইয়াছিল। সমস্যাটার সমাধান অবশ্য যুক্তি হইতে আসে নাই, তবু উহার রূপনির্ণয় বিচারের দ্বারাই করা হইয়াছিল। যিনি বাঙালী জীবনে নূতন ভালবাসার প্রবর্তনকর্তা, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, তিনি প্রথম হইতেই এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি কি করিয়া এই ভালবাসাকে আমাদের জীবনে আনিলেন, তাহার কথা পরে বলিব। এখানে শুধু জিনিসটাকে বাঙালীজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সম্বন্ধে যে সমস্যা ছিল, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিব। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য ভালবাসাকে পাশ্চাত্ত্য আচরণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া এদেশে চালানো যাইবে না। তাই বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী এবং অন্যান্য বই-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,

> "লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কেন না কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালাসমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে

বাঙালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই।”

ইহা ১৮৮৬ সনে লেখা। এই বৎসরেই সত্যকার একটি বাঙালী মেয়ের রচিত ব্যর্থ প্রেম সম্বন্ধে একটি করুণ কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্ব ইতিহাস শুনিয়া থাকিবেন, কারণ মেয়েটির পিতাকে তিনি চিনিতেন। তাই হয়ত পূর্বোল্লিখিত ইঙ্গিত তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও জানিতেন যে, পাশ্চাত্ত্য ধরনের পূর্বরাগ প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল; তাই তিনি লিখিলেন,

“আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনই আছে। দীনবন্ধু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।”

সেজন্য দীনবন্ধুর এই সব বই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বিচার এই,—

“এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়া দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।”

দীনবন্ধুর নায়কদের সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র এই একই আপত্তি তুলিয়াছিলেন,

“দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতি নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।”

এখানে কিন্তু একটা মজার কথা বলা যাইতে পারে। এত কথা জানিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একটি গল্পে শুধু যে ‘ধেড়ে’ বাঙালী মেয়েকে নায়কের কোর্টশিপের জন্য প্রতীক্ষমাণা করিয়াই রাখিয়াছিলেন তাহাই নয়, এগারো বৎসর বয়সে পূর্বরাগ অনুভব করিবার পর—তাহাও চাক্ষুষ না দেখিয়া—তাহাকে দিয়াই উনিশ বৎসর বয়সে নায়ককে প্রথম দেখার পরই ‘প্রপোজ’ পর্যন্ত করাইয়াছিলেন। গল্পটা অবশ্য ‘রাধারাণী’। ইউরোপে একমাত্র রাণী হইলে স্ত্রীলোকে ‘প্রপোজ’ করে, নহিলে পুরুষে করে,—রাধারাণী এই কথাটা জানে ইহা দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র

তাহাকে দিয়া এই কথাগুলি বলাইয়াছিলেন,

"ওঁতে আমাতেই সে কথাটা হবে কি ? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয় ? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি ? এই যে উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলেম্ না, এতে কে না কি বলে ? আমি ত বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত কুমারী,—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।"

কিন্তু তখনই রাধারাণীর মনে পড়িল যে, সাধারণ ক্ষেত্রে ইংরেজী প্রথা অন্য রকম। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বিবরণ দিতেছেন,

"তার পর রাধারাণী বিষন্ন মনে ভাবিল, তা যেন হলো ; তাতেও বড় গোল ! মোমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষমানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন ?"

এই অবাঙালী ধরন-ধারণ দেখিয়া আমি অল্পবয়সে ভাবিতাম, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিকাদের ব্যঙ্গ করিবার জন্য গল্পটা লিখিয়াছিলেন। পরে কিন্তু এই মত পরিবর্তন করিয়াছি। এখন আমি মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রেমের গল্পটা আন্তরিক-ভাবেই লিখিয়াছিলেন, এবং গল্পটা উৎরাইয়াছে। কি উপায়ে এই ধরনের গল্পকে বিশ্বাস করাইতে হয় সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল, নহিলে তিনি এত বড় ঔপন্যাসিক হইতে পারিতেন না।

বাঙালীজীবনে নূতন ধরনের রোমান্টিক প্রেমকে প্রতিষ্ঠার পথে যে মূলগত বাধার প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র তুলিয়াছিলেন তাহার সমাধান কি করিয়া হইল উহা পরে বলা হইবে। আপাতত তখনকার বাঙালী সমাজের একটু পরিচয় দিতে হইবে এবং সেই সমাজের সহিত নূতন ভালবাসার কি রূপ ধরিল, তাহার একটু আলোচনা করিব।

উহা অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বাঙালী সমাজ। কিন্তু উহা এক সমাজ নয়, দুইটি সমাজ—অর্থাৎ কলিকাতার বাঙালী সমাজ ও পল্লীগ্রামের বাঙালী সমাজ। এই দুই-এর মধ্যে ধর্ম ও লক্ষণের বহু পার্থক্য ছিল। সেইজন্য প্রেমকেও বাঙালী সমাজের এই দুইটি ভাগের সহিত বিভিন্ন ভাবে মিলিতে হইয়াছিল।

কলিকাতা মহানগরের আবির্ভাবই বাঙালী সমাজের এই দ্বিত্বের মূলে ; কারণ কলিকাতা শুধু শহর হিসাবেই ভারতবর্ষে একটা নূতন জিনিস, উহা পাশ্চাত্ত্য মহানগরের একটা দো-আঁশলা রূপ। উহার উদ্ভব ইংরেজের শাসন, ইংরেজের

শিল্পবাণিজ্য, ইংরেজের জীবনযাত্রা হইতে হইয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষে বাস করা একটা প্রাচ্য লণ্ডন সৃষ্টি না করিয়া সম্ভব হয় নাই। বাঙালী যখন বৈষয়িক উন্নতি বা নিতান্তপক্ষে জীবিকার জন্য এই প্রাচ্য লণ্ডনে বাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে তাহার জীবনের বাহ্যিক, সামাজিক ও মানসিক আবেষ্টনী বদলাইয়া গেল—গ্রামে যে বাঙালী ছিল সে তাহা আর থাকিতে পারিল না।

কিন্তু ইহাও দেখা গেল যে, পূর্ণভাবে নূতন নাগরিক জীবন গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাহার নাই। তাই নূতন ধরনের জীবনযাত্রার চাপে একদিকে যেমন সে অসহায় ভাবে বদলাইতে লাগিল, তেমনই সে মনে মনে একটা অসামঞ্জস্যের কষ্টও অনুভব করিতে লাগিল। সুতরাং বাঙালী সমাজের যে দ্বিত্বের কথা বলিলাম, তাহার দুই দিক সমান হইতে পারে নাই—একদিক প্রবল এবং দুর্নিবার হইলেও মনের দিক হইতে অস্বাভাবকি ও অস্বাস্থ্যকর হইল, অন্য দিক উহার তুলনায় দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু হইলেও স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যবান রহিল। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য রোমান্টিক প্রেমের আবির্ভাবের পর এই দ্বিত্বটাও প্রেমের চিত্রে প্রতিফলিত হইল, অর্থাৎ বাঙালীর নূতন ভালবাসা কলিকাতায় দেখা গেল এক রূপে, পল্লীজীবনে অন্য রূপ।

কলিকাতার বাহ্যিক চেহারার সহিত—ইটের উপর ইট চাপানো মানুষ উই-এর ঢিবির সহিত, এই মানসিক ও সামাজিক দ্বিত্বের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং এই দৃশ্যগত বৈষম্যের আলোচনা আগের পরিচ্ছেদে করা উচিত ছিল, অর্থাৎ বাংলার জলের সংস্পর্শে প্রেমের কি রূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা যেমন দেখানো হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ইটের সংস্পর্শেও প্রেমের কি রূপ দেখা দিয়াছিল তাহার কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলি নাই এই কারণে যে, কলিকাতার বাহ্যিক রূপকে 'দৃশ্য' বলিলেও 'প্রাকৃতিক দৃশ্য' বলা চলে না—তৃতীয় পরিচ্ছেদে শুধু বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত নূতন ভাল-বাসার কি সম্পর্ক তাহা বলাই আমার অভিপ্রেত ছিল। কলিকাতায় বাংলার দৃশ্যগত দৈন্য ভিন্ন কিছু দেখা দেয় নাই। তাহা ছাড়া আরও বড় কথা এই যে, কলিকাতার বাহ্যিক দৃশ্য কলিকাতার সামাজিক জীবনেরই বস্তুগত প্রকাশ। সুতরাং কলিকাতার সমাজ ও কলিকাতার দৃশ্যকে একই জিনিস বলিয়া ধরিয়া এই পরিচ্ছেদে প্রেমের সহিত এই দুইটার কি সম্পর্ক তাহা একই সঙ্গে বিচার করিব।

কলিকাতার বাহ্যিক চেহারার যে কুশ্রীতা আমি বত্রিশ বৎসর সেখানে বাস করিয়া প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছি, তাহা আমার কাছে এখনও একটা বিভীষিকার মত। বড় শহর হইলেই যে সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বর্জিত হইতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। আমি লণ্ডন, প্যারিস এবং রোম নিজে ভাল করিয়া দেখিয়াছি। এই তিনটি শহরের সর্বত্র সৌন্দর্য আছে তাহা বলিব না, কিন্তু কোথাও পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করি নাই। তাহার উপর যে জায়গাগুলি সুন্দর সেগুলি অপূর্ব সৌন্দর্যে অভিষিক্ত। লণ্ডনে সেণ্টজেমস্ পার্কে, প্যারিসে লুভ্রের বা লুক্সমবুর্গের চারিদিকে, রোমে সেণ্ট পিটার্সের অঙ্গনে বা ক্যাপিটলে যে সৌন্দর্য দেখিয়াছি তাহা বিভিন্ন ধরনের হইলেও, মনকে সমানভাবেই অভিভূত করে। কলিকাতায় এক গড়ের মাঠে বা নদীর ধারে গিয়া উহার ক্ষীণ ছায়া ভিন্ন কিছু পাই নাই—অন্যত্র তো সর্বদাই নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছে—দেহের নিঃশ্বাস এবং মনের নিঃশ্বাস দুইই।

এই বাহ্যিক সঙ্কীর্ণতা এবং কুশ্রীতা কলিকাতাবাসীদের মনেও সংক্রামিত হইয়াছিল। ইহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। আমি তখন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক—মিলিটারী অ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি। আমার এক সহকর্মী—কলিকাতাবাসী এবং প্রৌঢ়—আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভাই তুমি রোজ গড়ের মাঠে বেড়াও?"

ন—"হাঁ"

সহঃ—"কতদূর যাও?"

ন—"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত।" অবশ্য এসপ্লানেড হইতে।

সহঃ—"পারো? আমিও ভাই কখনো-কখনো ভাবি হেঁটে যাব। কিন্তু বলব কি, আউট্রাম সায়েবের স্টাচুর কাছে গিয়ে যখন ফাঁকা মাঠটা দেখি তখন প্রাণটা কেমন হু-হু করে ওঠে, আর ট্রামে উঠে পড়ি।"

ইহার সহিত পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত স্বাভাবিক বাঙালীমনের তুলনা করুন।

এখানে একটা বড় আপত্তি উঠিবে, এবং সে আপত্তিটা যথার্থ। কলিকাতার কুশ্রী সঙ্কীর্ণতায় বস্তুগত ও মনোগত রূপ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে কলিকাতাই বাঙালীর বর্তমান যুগের সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল; সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, ব্যক্তিগত আদর্শবাদ, এই সব বিষয়ে নূতন ধারণার উদ্ভব কলিকাতাতেই হইয়াছিল;

নূতন কর্মধারাও কলিকাতা হইতেই বহিয়াছিল। তাহা হইলে ক্ষুদ্রতা বা কুশ্রীতাই কলিকাতার সবটুকু নয়—কলিকাতার একটা মহান্ দিকও আছে।

এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। প্রথমত, ব্যক্তিগত কারণে—আমি মানসিক ধর্মে যাহা হইয়াছি তাহা কলিকাতাতে থাকিয়াই হইয়াছি, বিলাত গিয়া হই নাই; আমি শিক্ষা কলিকাতাতেই পাইয়াছি। জীবনের আদর্শকেও কলিকাতায়ই পূর্ণ করিয়াছি। কলিকাতার ঋণ অস্বীকার করা আমার পক্ষে কৃতঘ্নতা হইবে। বাঙালী জাতির বর্তমান কালের ইতিহাসও আমি যতটুকু পড়িয়াছি, তাহাতেও কলিকাতার কি দান তাহা দেখিয়াছি। সুতরাং একদিকে কলিকাতাই বাঙালীর উন্নতির মূল তাহা বলিতে আমার দ্বিধা নাই।

কিন্তু সেদিক, বাঙালী জীবনের যেদিক লইয়া এই বই-এ আমি আলোচনা করিতে যাইতেছি সেদিক নয়। দুইটা ইংরেজী কথা ব্যবহার করিয়া বলিব—কলিকাতার মাহাত্ম্য বাঙালীর 'পাব্লিক লাইফ' ও 'পাব্লিক থিঙ্কিং' এ, 'প্রাইভেট লাইফ' ও 'প্রাইভেট ফিলিং'-এ নয়। কলিকাতায় শিক্ষায়তন ছিল, শাসনযন্ত্র ছিল, লাইব্রেরী ছিল, রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, সভাসমিতি ছিল, খবরের কাগজ ছিল, তাই কলিকাতা হইতে এই দিকগুলিতে বাঙালীর মানসিক জীবনের প্রসার হইবার সহায়তা হইয়াছিল, বলিতে কি কলিকাতা ভিন্ন উহা সম্ভবই হইত না। কিন্তু বাঙালীর ব্যক্তিগত জীবনে যে সুখ, উচ্ছ্বাস, বা আনন্দের অনুভূতি আসিয়াছিল তাহাতে কলিকাতার ভদ্রসমাজের অনুদার ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, মলিনতা মানুষের জীবন ও অনুভূতিকে শুধু ভারাক্রান্ত ও পীড়িতই নয়, অনেক ক্ষেত্রে নির্বাপিত করিয়া দিত। কলিকাতা ও কলিকাতার সমাজ লইয়া সেজন্য উদারতম সাহিত্যিক সৃষ্টি হয় নাই—অন্তত রবীন্দ্রনাথ যাহাকে "সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ" বলিয়াছেন তাহা হয় নাই। অথচ গ্রাম্য জীবন লইয়া যে সব গল্প তিনি লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই তাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা অসাধারণ সুতরাং কলিকাতার জীবন লইয়াও তিনি যে সব গল্প লিখিয়াছেন তাহা সাধারণ হয় নাই। এমন কি কলিকাতার জীবনের ঘৃণ্যতম ও তুচ্ছতম দিক লইয়া তিনি যে তিনটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ আর্ট হিসাবে অন্য কোনও গল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। কিন্তু এইগুলি নিষ্ঠুর ও মর্মন্তুদ, হৃদয়কে যেন অ্যাসিডের ছিটা দিয়া

পুড়াইয়া ফেলে। উহাদের সৌন্দর্য গোক্ষুর সাপের সৌন্দর্যের মত, কীটভোজী উদ্ভিদের সৌন্দর্যের মত, পারদের সৌন্দর্যের মত। লোকোত্তর অনুভূতি থাকিলে কলিকাতার কদর্যতা এবং তুচ্ছতা লইয়াও কি ধরনের গল্প দেখা যায় তাহার তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। এই তিনটি 'কঙ্কাল', 'মানভঞ্জন' ও 'মধ্যবর্তিনী'।

'কঙ্কাল' গল্পে বলিবার ভঙ্গী এবং আসল কাহিনীটাকে অবতারণা করিবার উপলক্ষ্য যেরূপ, তাহার মধ্যে একটা লঘুতা আছে। ইহার জন্য সমস্ত গল্প-টাকেও লঘু মনে হয়—উহার ভয়াবহ সৌন্দর্য অনেকের কাছেই অনুপলব্ধ থাকে। কিন্তু এই বাহ্যিক কাঠামোর পিছনে চরিত্র যেটি আছে, উহা সর্বদেশে সর্বকালে নারীচরিত্রের একটা পরিচিত রূপ—মোহিনী অথচ সর্বনাশিনী। এই চরিত্রের নারী চিরন্তনী মানসী ভ্যাম্পায়ার—নিজের অপরূপ সৌন্দর্য তাহার কাছে শিকারের অস্ত্র মাত্র; তাহার ভালবাসার ক্ষমতা নাই কিন্তু উগ্র কামনা আছে; সেই তীব্র কামনা একেবারেই আত্মপরায়ণ, তাই এই নারী পুরুষকে আত্মতৃপ্তির উপকরণ হিসাবেই গ্রাস করিতে চায়; সুতরাং বঞ্চিত হইলে হিংস্র হইয়া উঠিতে পারে, তখন তাহার আর দয়া বা মমতা থাকে না।

এই কুহকিনী কীটসের la belle dame sans merci-র অপেক্ষাও ভয়ের বস্তু, কারণ কীটসের মায়াবিনীর একটা আর্ত নির্ভরশীলতা আছে, পেলব উদাস ভাব আছে, অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন আছে, মধুর চুম্বন আছে, অপরকে মায়ামুগ্ধ করিবার জন্য তাহার যে চেষ্টা উহায় মধ্যে আত্মসমর্পণও আছে। এই কুহকিনীর এসব কিছুই নাই, এ হীরকের মত দীপ্ত অথচ গোলাপের মত প্রস্ফুটিত, আবার রূপে লাবণ্যময়ী হইলেও হীরকের মতই কঠিন ও বিষাক্ত। সে পুরুষকে গ্রাস করিতে চায় নিজে তিলমাত্র আত্মসমর্পণ না করিয়া—যেন সে একটা অপ্সরারূপিণী বিষাক্ত ঊর্ণনাভ, যাহার কাজই জাল বিস্তার করিয়া পুরুষ-মক্ষিকা খাওয়া।

নায়িকা শ্বশুরের মুখ দিয়া নিজেকে 'বিষকন্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত একটু ভুল আছে। 'বিষকন্যা' সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত, 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'কথাসরিৎসাগরে' ইহার উল্লেখ আছে। ইহাদের সহিত সহবাস করা মাত্র পুরুষের মৃত্যু হয়। সেইজন্য রাজা এবং রাজ্যকামীরা শত্রুবধ করিবার জন্য উহাদিগকে প্রলুব্ধকারিণী করিয়া শত্রুর কাছে পাঠাইতেন। বিশেষ গ্রহ-নক্ষত্রের যোগে বিশেষ বিশেষ বারে উহাদের জন্ম ঘটিত, লক্ষণ

দেখিয়া বা কার্যকলাপের হিসাব লইয়া উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হইত।

এই অর্থে 'কঙ্কালে'র নায়িকা বিষকন্যা নয়, কারণ তাহার স্বামীর যখন মৃত্যু হইল, তখন সে একেবারে বালিকা, প্রাচীন বিষকন্যার মত কাহারও মৃত্যু ঘটাইবার বয়স তাহার হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হয়ত শুধু কুলক্ষণা ও অমঙ্গলকারিণী অর্থেই এটিকে 'বিষকন্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় যাহাকে femme fatale বলে, নায়িকা যে তাহা সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার সান্নিধ্য বিপজ্জনক অথচ তাহার আকর্ষণে কাহারও অবিচলিত থাকিবার উপায় নাই। পাঠকেরও তাহার আকর্ষণ হইতে বিপদ আছে, তাই সেও যাহাতে বাঁচিতে পারে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এই অপরাধিনী রূপসীকে কঙ্কালের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কঙ্কাল যেন 'তফাৎ যাও' 'তফাৎ যাও' এই কথা বলিয়া সুন্দরীর সর্বনাশকারী লাবণ্যের কাছ হইতে দূরে থাকিবার জন্য সকলকে সাবধান করিতেছে। এই কঙ্কাল না থাকিলে হয়ত পাঠক পর্যন্ত তাহার সুডৌল বাহু, আরক্ত করতল ও লাবণ্যশিখার মত অঙ্গুলি হইতে বিষের গুঁড়া গ্লাসে পড়িতেছে স্পষ্টচক্ষে দেখিয়াও সুরাটুকু নিঃশেষে চুমুক দিয়া ফেলিতেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যে উপকরণ হইতে গল্পটাকে এই স্তরে উঠাইয়াছিল সে উপকরণ কলিকাতার শ্রেণীবিশেষের জীবনের একটা পঙ্কিল দিক। 'কঙ্কালে'র নায়িকার দাদা বড়লোক, বাড়ীর অন্দরে বকুল গাছসুদ্ধ বাগান ছিল, বাহিরে আস্তাবলে জুড়ি গাড়ী ছিল। এই ধরনের ধনীবাড়ীতে অতিশয় রূপসী মেয়ে যেমন দেখা যাইত, তেমনই কামনারও একটা উলঙ্গ এবং উন্মাদ রূপ প্রকাশ পাইত। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় যে-অঞ্চলে, যে-সমাজে এবং যে-ভাবে বড় হইয়াছিলেন, তাহাতে এই সুন্দরীদের অস্তিত্বের কথা তাঁহার না জানা থাকিবার কথা নয়। বাস্তববাদী হইলে এই ধরনের জীবন অবলম্বন করিয়া তিনি হয়ত একটি 'মাদাম বোভারী' লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা অন্য রকম হওয়াতে যে গল্পটা খাড়া করিলেন, তাহাকে পাপের ফুল বলা যাইতে পারে।

'মানভঞ্জন'-ও এই ধনীসমাজেরই গল্প। উহাতে গিরিবালার প্রতিশোধের যেটুকু কাহিনী আছে, তাহা কবির রচিত উপসংহার, poetic justice; আসলে গল্পটা বাঙালীসমাজে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতার ধনীবাড়ীতে রূপের নৃশংস অপমানের কাহিনী। এই অবমাননার কিছু আভাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটাকে আর্টের উচ্চতম স্তরে

তুলিয়াছেন, কিভাবে তুলিয়াছেন তাহার পরিচয় দিবার আগে কেন উহা ঘটিত তাহার কথা বলা আবশ্যক।

রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই অল্পবয়সে বিবাহ হইয়া যাইত। বিবাহের বাজারে উহাদের বেশ চাহিদা ছিল, আর পিতারাও কন্যার সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিয়া তাহাকে রূপের বাজারে বিক্রয় করিতেন। এই বড়লোকের ছেলেরা সাধারণত বিবাহের পূর্ব হইতেই বেশ্যা বা উপপত্নীর সংসর্গ করিয়া অভ্যস্ত থাকিত। সুতরাং সুন্দরী পত্নী কিছুদিনের জন্য একটি অতিরিক্ত উপপত্নীর পদ পাইত। এই সাময়িক আকর্ষণ ঘুচিয়া গেলে ধনীপুত্র বারাঙ্গনার কাছে ফিরিয়া যাইত ও পত্নী কার্যত বিধবার জীবন যাপন করিত।

'মানভঞ্জন' রূপের এই অবমাননারই একটি নিদারুণ অথচ সুন্দর গল্প। গিরিবালার রূপ সে কি! "শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেওয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে। গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।"

কিন্তু এই সৌন্দর্যের উপাসক তাহার স্বামী নয়। সে "যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে 'প্রাণনাথ', 'প্রাণেশ্বর' করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন ধুতির উপর ওয়েস্টকোট পরা ফুলমোজা-মণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী 'এক্সেলেণ্ট' 'এক্সেলেণ্ট' করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।'

একদিন গিরিবালা তাহার স্বামীকে পাইল, ভাবিল তাহাকে জয় করিবে। কিন্তু গোপীনাথ "তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠি, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।" কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। "কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত নিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইত।"

এর সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত পাঠককে গিরিবালার ঘরের আসবাবপত্রের বর্ণনাও লক্ষ্য করিতে বলিব। উহাও গল্পটা বাঙালীসমাজের কোন্ যুগের কোন্ স্তর হইতে আসিয়াছে তাহার সূচক।

অবশেষে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের একটু আলোচনা করিব। আগের দুইটি গল্প কলিকাতার ধনী সমাজের, এই গল্পটি কলিকাতার অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের। ইহাতে পাপ বা পঙ্কিলতা ছিল না বটে, কিন্তু উহার একঘেয়ে, অবিচিত্র, অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় সামান্যতা তেমনই মারাত্মক ছিল। একরাশি ধুলা চাপা দিয়া যদি কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে বলা হয়, এই সমাজে বাস করিতে বলা তাহারই মত।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে, তাঁহার সামাজিক জীবনেও একেবারে ধনীসমাজে আবদ্ধ না থাকিলেও সচ্ছল বা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহের বাহিরে যাইত বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কেরানী-জাতীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী ও জীবনের সহিত তিনি পরিচিত হইলেন কি করিয়া? অথচ এই ধরনের গৃহস্থবাড়ীর বাহ্যিক ও মানসিক রূপের অতি নিখুঁত চিত্র মধ্যবর্তিনী গল্পে আছে। উহা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বহির্মুখীন দৃষ্টির সমন্বয়ে সম্ভব হইয়াছিল।

এই মধ্যবিত্ত জীবনে আপিস ও রোয়াকের, এবং রান্নাঘর ও শোবার ঘরের আবর্তন ভিন্ন কিছুই ছিল না। উহাতে মানসিক ঐশ্বর্য আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, মানসিক সম্পদের মধ্যেও যে জিনিসটা কোনওক্রমে আসিতে পারিত তাহা শুধু একটা উচ্ছ্বাসহীন, জোয়ার-ভাঁটাহীন, বর্ণহীন কিন্তু স্বচ্ছ ও নির্মল স্নেহ, স্বল্প হইলেও সুখের, ধারায় ক্ষীণ হইলেও প্রবহমাণ। নিবারণ ও হরসুন্দরীর জীবনে এই স্নেহটুকুই ছিল মূল্যবান মানসিক বস্তু।

এই জীবনে একদিন হরসুন্দরীর গুরুতর পীড়া হইতে একটা সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহার সহিত একটা মানসিক অসামান্যতাও দেখা দিল—সেটা হরসুন্দরীর আত্মত্যাগের উচ্ছ্বাস। পাশের বাড়ীর একটা অতি তুচ্ছ বাগান দেখিয়া তাহার মনে একটা যেন আনন্দের সঙ্গীত উঠিতে লাগিল। সেই আনন্দের বশে তাহার মনে একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে নিজেকে একটা মহৎ ত্যাগ ও বৃহৎ দুঃখের উপর নিক্ষেপ করিতে চাহিল—নিজে নিঃসন্তানা বলিয়া প্রৌঢ় স্বামীকে আবার বিবাহ করাইয়া।

স্বামী অবশেষে বিবাহ করিল। তখন তাহাদের ঘরে আর একটা নূতন জিনিসের সম্ভাবনা দেখা দিল—সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত নূতন ভালবাসা। ইহাতে নিবারণের মনের যে অবস্থা হইল উহা বাল্যবিবাহের উপর সুপ্রতিষ্ঠ দাম্পত্য-জীবনের ধারার বিসম্বাদী। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"একেবারে পাকা আমের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের-আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ।"

কিন্তু না অন্ধ নিবারণ, না অন্ধ হরসুন্দরী, কেহই বুঝিতে পারে নাই যে তাহাদের জীবন যে ধরনের, উহার মধ্যে ত্যাগ বা ভালবাসার মত অসামান্যতার কোন স্থান নাই। এই সমাজের সামান্যতার শরীরিনী মূর্তি হইয়া শৈলবালা দুজনেরই সর্বনাশ করিল। কলিকাতার জীবনযাত্রার এক সামান্যতা হইতে হরসুন্দরীর যে সর্বনাশ হইল, উহাকে সেই জীবনযাত্রার আর এক সামান্যতা উপহাস করিতে লাগিল।—

"প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্য-শয্যার উপর আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন সৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হাঃ হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।"

শৈলবালা মরিয়া যাইবার পরও তাহারা আর আগের জীবন ফিরিয়া পাইল না। কলিকাতার জীবনে অসামান্যতা আনিবার প্রচেষ্টায় সামান্যতর স্বস্তিও জীবন হইতে নির্বাসিত হইল। শুধু নিদ্রাহীন অশান্তিকে দূর হইতে নটীকণ্ঠের বেহাগরাগিণী আরও অসহনীয় করিয়া তুলিল।

মানুষের মন ও জীবনের উপর কলিকাতার মারাত্মক প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পেরও উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু উহা ইচ্ছা করিয়া করিলাম না। এক সময়ে আমি উহাকে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প না মনে করিলেও পাঁচ-ছয়টি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে ধরিতাম। সেই মত পরিবর্তন করিয়াছি। এখন গল্পটাকে আমার কাছে এত অবিচ্ছিন্নভাবে পীড়াদায়ক মনে হয় যে, উহা আমি পড়িতে পারি না। উহার দোষ কেবলমাত্র

নিষ্ঠুরতা নয়। যে তিনটি গল্পের আলোচনা করিলাম সেগুলিও নিষ্ঠুর, কিন্তু এগুলির মধ্যে 'ট্রাজেডি' আছে, তাই এগুলি পাবক, এগুলির মধ্যে 'ক্যাথারসিস্' পাওয়া যায়। 'নষ্টনীড়' 'ট্রাজেডি' নয়, নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণা। ম্যাথিউ আর্নল্ড এই ধরনের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়াছেন—

> "What then are the situations, form the representation of which though accurate, no poetical enjoyment can be derived? They are those in which the suffering finds no vent in action, in which a continuous state of mental distress is prolonged, unrelieved by incident, hope or resistance, in which there is everything to be endured, nothing to be done. In such situations there is invevitably something morbid, in the description of them something monotonous. When they occur in actual life, they are painful, not tragic; the representation of them in poetry is painful also."

'নষ্টনীড়' এই জাতীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ। রবীন্দ্রনাথ গল্পটার বিষয় কলিকাতার জীবনের একটা সত্যকার ব্যাপার হইতে পাইয়া থাকিলেও, উহাকে সাহিত্যের লোকোত্তর জগতে তুলিতে পারেন নাই, এইখানে কলিকাতা সাহিত্যকে পরাজিত করিয়াছে।

এইবার পল্লীজীবনের দিকে মুখ ফিরাইয়া সেই জীবনের সহিত নূতন ভালবাসাকে সমন্বিত করিবার কি সমস্যা, তাহার কথা বিবেচনা করা যাক। বাংলার পল্লীজীবনে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, দ্বেষ, বিবাদ ছিল না এ কথা কেহ বলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেরই গ্রাম্যজীবনের এই দিকটার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহারা সাধারণ গ্রাম্যজীবনের বাস্তব বর্ণনা দিতে গিয়া এই দিকটাকে মোটেই চাপা দেন নাই। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'ই উহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—'দিদি' ও 'উলুখড়ের বিপদ' গল্প দুইটি গ্রামের পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'মেঘ ও রৌদ্র' পল্লীজীবনের ক্ষুদ্রতার আবেষ্টনেও ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছিয়াছে। তেমনই 'সমস্যাপূরণ' গ্রাম্যজীবনের একটা অত্যন্ত ইতর দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উচ্চস্তরে গিয়াছে। গ্রাম্যজীবনে কোন্ দিকের জন্য তাহা সম্ভব

হইয়াছিল উহার আলোচনা করিব। আগে প্রথাগত পল্লীজীবনে ভালবাসার পথে আরও যে যে বাধা ছিল, তাহার অন্তত একটির বিশেষ উল্লেখ করিব।

পল্লীজীবনে সামাজিক আচারবিরুদ্ধ ভালবাসার জন্য স্থান করা প্রায় সম্ভবই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু তিনি উহার সঙ্কট সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত কায়স্থের মেয়ের বিবাহ হওয়াতে কি সর্বনাশ উদ্যত হইয়া আসিতে পারে, 'ত্যাগ' গল্পে উহার একটি অতি করুণ বর্ণনা আছে। কুসুম পরিত্যক্তা হইবার অপেক্ষায় বসিয়া ভাবিতেছে,—

"যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমন একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল।"

তবু পল্লীজীবনে ভালবাসাকে আনা কলিকাতার জীবনে ভালবাসাকে আনা অপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছিল। পল্লীজীবনের ধর্মের সহিত কলিকাতার জীবনের ধর্মের তুলনা করিতে হইলে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র সহিত 'নষ্টনীড়ে'র তুলনা করিতে হয়। দুইটিই বিষাদপূর্ণ গল্প, কিন্তু প্রভেদ কত!

এই প্রভেদের একটি কারণ পল্লীজীবনের আকাশ, বাতাস, জল—ইহাদের কথা আগে বলিয়াছি। এখন আরও দুইটি জিনিসের কথা বলিব। উহাদের একটি পল্লীজীবনের স্বার্থ-নিরপেক্ষ সামাজিক আচরণ। যেখানে স্বার্থের সংঘাত ছিল না, সেখানে গ্রামের লোকের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে একটা সহজ সরল হৃদ্যতা ছিল। ইহার ফলে এই সামাজিক জীবনে একটা অনাবিল মাধুর্য দেখা যাইত। বৈষয়িক ক্ষুদ্রতাকে বাদ দিলে এই সমাজের একেবারে আর একটা রূপ প্রকাশিত হইত।

বিষয়কর্ম ও বিষয়াসক্তি হইতে মুখ ফিরাইলেই পল্লীবাসী বাঙালীর মনের কি রূপ দেখা যাইত তাহার একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত শিবনাথ শাস্ত্রী দিয়াছেন। তিনি পল্লীজীবনের নীচতা কোথাও ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ প্রপিতামহের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে সেই জীবনের আর একটা দিক একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার প্রপিতামহের বয়স তখন প্রায় পঁচানব্বই বৎসর। তিনি অন্ধ ও

বধির। তবু তিনি জপতপ পূজায় ও পিতৃপুরুষের তর্পণে প্রতিদিন দেড়ঘণ্টা মত সময় দিতেন। তারপর আধঘণ্টা মাটিতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেন। এই প্রণামের ফলে তাঁহার কপালের উপর একটা আবের মত মাংসের গুলি জমিয়া গিয়াছিল। এই ধরনের প্রার্থনায় বৃদ্ধ কি বলিতেন তাহার বিবরণও শিবনাথ দিয়াছেন,—

"একদিন মা শুনিলেন যে, তিনি মুখে মুখে বাংলা ভাষাতে তাঁহার ইষ্ট-দেবতার চরণে আমার বিদেশবাসী পিতার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, 'মা দয়াময়ী! সে বিদেশে পড়ে আছে, তাকে রক্ষা করো। সে কাহারও বারণ শোনে না, তাকে সুমতি দেও,' ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত, 'বাবা!' আমি তখন দিগম্বরমূর্ত্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টি দিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে—

'দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।'

আমি নিজে গ্রাম্যজীবনের সহিত বাল্যকালে পরিচিত হই। তাই সেই জীবনের ক্ষুদ্র ও নীচ বিষয়াসক্তির সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। আমি দেখিয়াছি অন্য জিনিস। সেটাও যে সত্য সে বিষয়েও সন্দেহ মাত্র নাই—আমার চোখের আড়ালে যাহাই থাকিয়া থাকুক। আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির একটু পরিচয় দিব।

আমার মনে হইত গ্রাম্যজীবনের প্রধান ধর্ম ছিল একটা অপার শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন স্থৈর্য। এই সব গ্রামে সময়ের নদী যেন স্রোত বন্ধ করিয়া দীঘিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এটা আমি যখনই গ্রামে গিয়াছি তখনই অনুভব করিয়াছি। সকালের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সকলে আমাদের সদরের বড় আটচালার ফরাশের বিছানায় কাত হইয়া বা বারান্দায় ইজিচেয়ারের বসিয়া গল্প করিত, না হয় সামনের মাঠের ওপারে গ্রামের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া থাকিত। কাহারও কোন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে তাহা কখনই মনে হইত না। তাহাদের মনের ভাব যেন এই—কিছু করি আর না করি,

সংসার তো নিজের মতেই চলিবে, নিরর্থক আঁকুপাঁকু কেন?

এই আঁকুপাঁকুই আজকাল শহুরে বাঙালীর জীবনের রূপ। ইহাতে জীবিকা-নির্বাহ জীবনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাই প্রতিটি বাড়ীতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে জীবিকার ধান্দা দুইটা পয়সা আনিবার অশোভন চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা মনকে তিক্ত করিয়া তুলে। ইহারা পেটের দায়কে সেকালের পিতৃদায়ের মত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে না আছে গৌরব, না আছে শান্তি।

গ্রামে যে দারিদ্র্য ছিল না তাহা নয়। সেখানে ধনী বা সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র গৃহস্থ পর্যন্ত সকল রকমের লোকই ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পয়সার জন্য প্রকাশ্য ছুটাছুটি তো দেখা যাইত না, এমন কি অর্থের তারতম্যঘটিত কোন উগ্রতা ব্যবহারেও প্রকাশ পাইত না। অর্থের অপেক্ষা না রাখিয়া সামাজিক মেলামেশা অব্যাহত থাকিত। সকল ধরনের পরিবারেই একটা নির্দিষ্ট কাঠামো ও বাঁধা ছন্দ ছিল। তাই বিভিন্ন অবস্থার লোকের একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে বাধা থাকা দূরে থাকুক, বিবাহ হইবার পথেও বাধা হইত না। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে অপূর্বদের সংসার ধনীর বা সম্পন্ন গৃহস্থের সংসার, মৃন্ময়ীর মায়ের সংসার দরিদ্রের সংসার। তবু মৃন্ময়ীর সহিত অপূর্বের বিবাহে আর্থিক আপত্তি উঠে নাই। অর্থগত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বাংলার পল্লীজীবনে তখন একেবারেই ছিল না।

তার পর হৃদ্যতা ও আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। ছেলে কলিকাতার মেস বা বাসাবাড়ী হইতে গ্রামে ফিরিলে ধুমধাম হইবারই কথা। আমিও খবর দিয়া বা না দিয়া যখন দূরের স্টেশন হইতে হাঁটিয়া বা সাইকেলে চড়িয়া বাড়ীর উঠানের কোণে দাঁড়াইতাম, তখন কি সাড়া পড়িত তাহা দেখিয়াছি। সুতরাং অপূর্বর মার ব্যস্ততার বর্ণনা পড়িয়া আশ্চর্য হই নাই।

আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী গেলে অবশ্য ধুমধাম আরও প্রকাশ্যে ও সশব্দে হইত, শুধু মার চোখের কোণের হাসি, মুখের স্নিগ্ধতা ও চঞ্চল গতির মধ্যেই আধ-আত্মপ্রকাশ আধ-আত্মগোপন করিয়া থাকিত না। একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে এক প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যে আদর পাইয়াছিলাম তাহার কথা বলি। যে গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে একটি মাত্র ঘর ভদ্রগৃহস্থ।

গৃহস্বামী আমার দূরসম্পর্কের দাদা, কিন্তু বয়সে আমার পিতারও বড়। দুইটি ছেলে, প্রত্যেকেই আমার চেয়ে অনেক বড়। খাইতে বসিয়াছি, বাড়ীর কনিষ্ঠা অবগুণ্ঠনবতী বধূ, কলিকাতা-প্রত্যাগত, আসন্ন বি-এ পাস যুবা এবং

বয়সে ছোট খুড়শ্বশুরকে বলয়-ঝঙ্কৃত-হস্তে পরিবেশন করিতেছেন। খাইবার পর শুইতে অনুরোধ করা হইল। আমি দিনে ঘুমাই না বলা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের শোবার ঘরেই লইয়া যাওয়া হইল। একটি ছোট চার-চালা টিনের ঘর, দরমার বেড়া, ধবধবে বিছানা। যখন শুইলাম তখন টিনের চাল হইতে তাপ নামিয়া ও কাছের মাঝারি গোছের একটা নদী হইতে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে তাপ ও শৈত্যের টানাপোড়েন রচনা করিতেছিল। দেখি শিয়রের কাছে একটি শালুর ঝালর দেওয়া তালপাতার বোনা হাতপাখা ও একটি উপন্যাস—অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র'। পরজীবনে বিলাতী আতিথেয়তার বই-এ পড়িয়াছিলাম যে, অতিথির শোবার ঘরে উপন্যাস রাখিতে হয়। সেই অজ পাড়াগাঁয়েও উহা ইংরেজী বই হইতে শিখিতে হয় নাই।

সব চেয়ে মধুর লাগিতেছিল বালিশের মৃদু সুগন্ধ—অবশ্য লক্ষ্মীবিলাস তেলের। বাঙালীসমাজে তখনকার দিনে দুইটি ভাগ ছিল—একদিকে শহুরে, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপন্থী উদারনৈতিক লোক ও অন্যদিকে গ্রামের রক্ষণশীল অধিবাসী। তেমনই মাথার তেলেরও একটা উদারনৈতিক ও একটা রক্ষণশীল মার্কা ছিল। প্রথম শ্রেণীর ভদ্রঘরের মেয়েরা জবাকুসুম ও কুন্তলীন ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা করিতেন লক্ষ্মীবিলাস। আমার মা জবাকুসুমের দলে হইলেও, গ্রামের কিশোরী বধূদের সহিত বালক দেবর হিসাবে যে সম্প্রীতি ছিল তাহার বশে আমি লক্ষ্মীবিলাসকে কখনও তুচ্ছ করি নাই। ঝাঁপের পিছনে নববধূ, লক্ষ্মীবিলাসের গন্ধ ও গ্রামের জীবন আমার স্মৃতি ও অনুভূতিতে একেবারে জড়াইয়া আছে। এই কারণেই বি-এ পরীক্ষা দিবার পর, অর্থাৎ দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান ঐতিহাসিকদের দুরূহ বই পড়িবার পরও বালিশের মৃদু সুবাস আমার খুবই ভাল লাগিতেছিল।

মনে রাখিবেন, সেই বৎসর আমি ইতিহাসে বি-এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলাম ও এই ঘটনার তিন-চার মাস পূর্বে লিখিত ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধে কঠিন কচকচিপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ আমার আত্মজীবনীর ৩৪৪ পৃঃ ৩৫৩ পৃঃ পর্যন্ত মুদ্রিত আছে। এই দুই জগতে বাস করিতে আমার কোন অসোয়াস্তি বোধ কখনও হয় নাই। তিন বৎসর অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে পড়িয়া যাঁহারা বিলাতি মেম ও দেশী বৌ লইয়া কাল্পনিক শখের সমস্যা সৃষ্টি করিয়া ইংরেজীতে নভেল লেখেন, অথচ দেশী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে

কোন সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহাদের জন্যই এই তুচ্ছ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিলাম।

এই হইল গ্রাম্যজীবনের সেই দিক যাহার সহিত নূতন ভালবাসাকে অঙ্গাঙ্গীভূত করা সম্ভব ছিল। ইহার আভাস রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর কথায় দিয়াছেন—"গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।"

গ্রাম্যজীবনের আর একটা সুন্দর প্রবাহ বহিত পূজাপার্বণের বর্ষব্যাপী পরম্পরাকে অবলম্বন করিয়া। শান্ত গ্রাম্যজীবনকে যদি হরিৎ শষ্পের আস্তরণ বলা যায়, তাহা হইলে পূজাপার্বণ ছিল যেন তাহার উপর রঙীন ফুলের গাছ। উপমা বদলাইয়া বলা যাইতে পারে, পূজাপার্বণ যেন শাড়ীর সাদা খাপের উপর বুটি, দুর্গাপূজা তাহার জরিদার আঁচল। তাই গ্রামে যে-গৃহস্থের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ মনে করা হইত তাহার সম্বন্ধেই বলা হইল এই যে, উঁহার বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়া আছে। রথযাত্রাই হউক, ঝুলনযাত্রাই হউক, সরস্বতী পূজাই হউক, আর দোলযাত্রাই হউক, এই পূজাপার্বণের প্রত্যাশাই বাঙালীর জীবনে সর্বোচ্চ আনন্দ ছিল, উৎসবের তো কথাই নাই। আমার আত্মজীবনীতে এই আগ্রহের বর্ণনা দিয়াছি।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সোনার কাটিতে বাঙালীর মন জাগ্রত না হইয়া উঠা পর্যন্ত সে-মনে গ্রাম্যজীবনের সৌন্দর্যের কোনও অনুভূতি আসে নাই। মাছ যেমন জলে বাস করে, কিন্তু জলের সৌন্দর্যের কোন খবর রাখে না, জল হইতে তুলিলে মরিয়া যায় বটে, তবুও জলের অপরিসীম ও করুণ রূপের কথা স্মরণ করে না, বাঙালীও তেমনই গ্রাম্যজীবনে বাস করিয়াও উহার সৌন্দর্য অনুভব করিত না।

কিন্তু অনুভূতি যাই আসিল, তখনই তাহার চোখ এবং মুখ দুইই খুলিয়া গেল। সে গ্রাম্যজীবনের স্তুতি আরম্ভ করিল। 'অতিথি' গল্পের শেষের দিকে রথযাত্রার আসন্নতার যে বর্ণনা আছে তাহাকে একটা অপরূপ স্তোত্র বলা চলে,—

"কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রাদল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে, সম্মুখে আজ যেন

সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, —মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে…"

ইহার সবটুকু পড়িতে বলিব।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবি। তাঁহার মনের ভাবও অসাধারণ হইবারই কথা। কিন্তু নূতন অনুভূতি আসিবার পর সাধারণ বাঙালী লেখকের মনেও বাংলার গ্রাম্য-জীবন পূজাপার্বণ লইয়া কি মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্য একজনের লেখা উদ্ধৃত করিব—এটি প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে প্রকাশিত ষষ্ঠী-পূজার একটি বিবরণ। সেটি এইরূপ—

"অধিকাংশ পল্লীর রমণীই উৎকৃষ্ট বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি হস্তে লইয়া ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে পূজোপকরণ বিস্তৃত।

"রমণীগণ নিকটে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছেন, তাঁহাদের মৃদু মধুর গুঞ্জনে বনপ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে। কেহ অবগুণ্ঠনবতী, কাহারও নাকে নোলক, কাহারো নাসিকায় নথ; বলয়চুড়ে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইতেছে, পট্টবস্ত্র বায়ুপ্রবাহ কম্পিত হওয়ায় খস্‌খস্ শব্দ হইতেছে, কেশতৈলের মধুর গন্ধ সমীরণ-হিল্লোলে ভাসিয়া যাইতেছে, দীপ্ত সূর্য্য অন্তরীক্ষ হইতে অশ্বত্থের নিবিড় পল্লব ভেদ করিয়া যুবতীজনের প্রীতিপ্রফুল্ল সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ হাস্যোজ্জ্বল মুখের মোহন ভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না।

"কাহারও পাঁচ বৎসরের মেয়েটি নীলাম্বরী পরিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া কজ্জলরাগরঞ্জিত নেত্রে একদৃষ্টে পূজা দেখিতেছে। কাহারও ক্রোড়ে এক বৎসরের শিশুপুত্র মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোমল ওষ্ঠাধর স্তনবৃন্ত পরিত্যাগ করে নাই, ঘর্ম্মস্রোতে শিশুর নবনীসুকোমল দেহ প্লাবিত। স্নেহময়ী জননী তাহাকে তদবস্থাতেই ক্রোড়ে ধরিয়া বলয়বেষ্টিত সুগোল হস্তখানি দ্বারা অঞ্চল ঘুরাইয়া শিশুর ঘর্ম্মনিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, এক এক বার পূজার দিকে ও এক এক বার গভীর স্নেহে নিদ্রামগ্ন পুত্রের মুখের দিকে অতি সতৃষ্ণ করুণ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, স্নেহময়ী জননীর অন্য স্তনবৃন্ত ভেদ করিয়া অমৃত উৎসবের ন্যায় ক্ষীরধারা নিঃসারিত হইতেছে।"

লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়।

নারীর দেহ সম্বন্ধে পুরাতন কদর্যতা কোথায় গেল ? আমিও কিশোরী মাতাকে বিনা সঙ্কোচে আমার সম্মুখে সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়াছি। এই যে সমাজ, তাহার সহিত নূতন ভালবাসাকে মিলাইবার উপায় ছিল।

তাই একদিকে যেমন এই ভালবাসা গ্রাম্যজীবনের সুন্দর দিকটাকে অবলম্বন করিল, তেমনই অন্যদিকে গ্রামে ভালবাসারও যে রূপ দেখা দিল তাহা কলিকাতার রূপ হইতে বিভিন্ন। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, উহার ধর্ম বদলাইয়া গেল—সুখে আসিল উচ্ছলতা, দুঃখে আসিল করুণা। এই ভালবাসায় নিষ্ঠুরতার স্থান কোথাও রহিল না। রবীন্দ্রনাথের পল্লীজীবন সংক্রান্ত কয়েকটি গল্পের নাম বলিলেই প্রভেদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে—'সমাপ্তি', 'অতিথি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'দৃষ্টিদান', 'শুভদৃষ্টি' ; এগুলির সহিত 'কঙ্কাল', 'মানভঞ্জন' ও 'মধ্যবর্তিনী'র পার্থক্য কত !

স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ 'মানভঞ্জনে'ও আছে, 'মধ্যবর্তিনী'তেও আছে। উহার পরিচয় দিয়াছি। এখন 'দৃষ্টিদানে' এই দুঃখের রূপ কি দেখাইব। অন্ধ কুমু বলিতেছে,—

> "মনে আছে সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটিভেজা গন্ধ ও বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে,—সঙ্গচ্যুত সাথীগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি, ততক্ষণ প্রদীপ জালানো হয় না—পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধ জগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতে ছিলাম,—'প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্নহৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি, বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না, আমায় আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই বা বল।' এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।"

হেমাঙ্গিনী ঘরেই খাটের উপর শুইয়া ছিল। সে নামিয়া আসিয়া কুমুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কুমুর হৃদয়ে শান্তি আসিল,—

"ইতিমধ্যে কখন মেঘ গর্জ্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না—বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।"

আবার 'শুভদৃষ্টি' গল্পে জমিদার কান্তিচন্দ্র যে গ্রামে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে বিবাহের প্রস্তাব করিতে গেলেন, কলিকাতার উচ্চ কুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ একেবারে কাটাইয়া ফেলিলেন, তাহাও পল্লীজীবনের শান্ত সরল ছবির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল—

"কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।"

ম্যাথিউ আর্নল্ড এক জায়গায় ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম বোভারী'র নিষ্ঠুর শূন্যতার সহিত টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা'র সকরুণ পূর্ণতার তুলনা করিয়াছিলেন। এখানেও সেই পার্থক্য দেখিতে পাই। সে যাহাই হউক, নিষ্ঠুরভাবেই হউক বা করুণভাবেই হউক, নূতন ভালবাসা বাঙালী সমাজে যে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল তাহা এ পর্যন্ত দেখা গেল, কিন্তু ইহার পরও একটা সামাজিক প্রশ্ন ছিল।

এই যে সমাজ, উহার মধ্যে প্রেম আবির্ভূত হইবার মূলগত সুযোগই ছিল কিনা উহাই প্রশ্ন। এখন সেটা বিবেচনা করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ, সহজ, এবং স্বাভাবিক মেলামেশা যে-সমাজে নাই তাহাতে এই ধরনের প্রেম ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতে পারে না। অথচ বাঙালী সমাজে যে ইহার প্রচলন ছিল না তাহা বলারই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু একটা কৌতূহলজনক বিষয় এই যে, কলিকাতায় ইংরেজী জীবনযাত্রা দেখা দিবার পর হইতে, বাঙালীর যাই এই জীবন দেখিবার সুযোগ দেখা দিল, তখন হইতেই স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক মেলামেশার যে একটা সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে, তাহা শিক্ষিত বাঙালী অনুভব করিয়াছিল। একটি ঘটনার কথা বলিতেছি।

১৮২৪ সনের ২১শে এপ্রিল কলিকাতার লর্ড বিশপ হিবার বিয়াল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে পরিচিত সমস্ত ইংরেজ এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীকে নিমন্ত্রণ করেন। অভ্যাগতদের মধ্যে গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট এবং

তাঁহার পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ হিবার নিজের হাতে বাঙালী বাবুদের পান, গুলাব ও আতর দেওয়াতে উঁহারা খুবই খুশী হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের অনেকেই ইংরেজী খুব ভাল বলিতে পারিতেন—বিশপ লিখিয়া গিয়াছেন, "not only fluently but gracefully." হরিমোহন ঠাকুর বিশপের সহিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে অন্য একদিন আলাপ করিয়াছিলেন ; রাধাকান্ত দেব করিয়াছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে এবং ফ্রী মেসনদের সম্বন্ধে, তিনি হিবারকে জিজ্ঞাসা করেন, মেসনদের যে গোপন তত্ত্ব, "if he thought it was anything wicked or Jacobinical." তাঁহারা সকলেই ইউরোপের তদানীন্তন চিন্তাধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

হরিমোহন ঠাকুর উপস্থিত ইংরেজ রমণীদের দেখিয়া বিশপকে বলিলেন, "What an increased interest the presence of females gives to your parties !"

বিশপ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে রমণীদের সামাজিক জীবনে যোগ দেওয়ার প্রথা প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও ছিল।

হরিমোহন হাসিয়া তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু এও বলিলেন, "It is too late for us to go back to the old custom now."

রাধাকান্ত দেব কাছে ছিলেন, কথাটা শুনিতে পাইয়া তিনি আসিয়া বলিলেন, "It is very true that we did not use to shut up our women till the times of the Musalmans. But before we could give them the same liberty as the Europeans they must be better educated." কিন্তু শুধু আগ্রহ জন্মিলে কি হইবে? ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও স্ত্রী-পুরুষের সত্যকার সামাজিক মেলামেশা —ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা এখানে বলিতেছি না—বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৮৯৩ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠিতে এ বিষয়ে একটা চমৎকার সাক্ষ্য আছে। তিনি লিখিতেছেন,

"সু…[সম্ভবত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমি নিশ্চিত নই] বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে খুব সুমনোযোগ অথচ সপ্রতিভভাবে ঈষৎ-হাস্য-মুখে বক্রগ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপ-

কথন, অ্যালবম্ খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক দস্তুরমত চাল চাল্‌ছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় যেরকম লজ্জাভিভূত সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্দ্ধমাত্র প্রকাশ পেল না।"

তারপর নিজের কথা লিখিতেছেন,

"আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময়বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিত ভাবে অবলাজাতির সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি নে। চল্‌তে গেলে হুঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বোধ করি, অথচ কিছুই করে ওঠা যায় না—দুটোকে কোথায় গুটিয়ে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডবৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।"

শেষে তখনকার দিনের অন্য বাঙালী যুবকদের কথা লিখিলেন,

"আমাদের ছেলেগুলি কার্ত্তিকের মতো চেহারা নিয়ে সসম্ভ্রমে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেবল লজ্জায় রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠছে—কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে যে বেশ একটি নরম জায়গা বেছে গরম হয়ে বসবে সে যোগ্যতা তাদের আর রইল না। এর চেয়ে ধিক্কারের বিষয় আর কী হতে পারে।"

নিজের এই অক্ষমতা জানিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তে সুচরিতার সহিত প্রথম দেখা হইবার পর বিনয়ের হতবুদ্ধি হওয়ার বর্ণনা একেবারে যথাযথভাবে দিতে পারিয়াছিলেন। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিনয়ের কোনও দিন কোনও পরিচয় হয় নাই। তাই গাড়ী ছাড়িবার সময় সুচরিতা যখন তাহাকে ছোট একটি নমস্কার করিল, এই নমস্কারের জন্য প্রস্তুত হইয়া না থাকায় হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতি-নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল।

"এইটুকু ত্রুটি লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া সে নিজেকে বারবার ধিক্‌কার দিতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত বিনয় নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল—মনে হইল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

পক্ষান্তরে গোরা নব্য হিন্দু হওয়াতে স্ত্রীজাতির সহিত ভদ্রতা করার কোনও কর্তব্যই স্বীকার করিল না। পরেশবাবুর বাড়ীতে গিয়া "মেয়েরা যে এখানে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল।" দুইটা ব্যবহারই একই অনভ্যাসের এদিক আর ওদিক। পরেশবাবু অবশ্য তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই গোরার উপর চটিয়া হারানবাবু যখন বলিলেন যে, "মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে ভদ্রতা এঁরা জানে না," তখন পরেশ বলিলেন,

"না, না, বলেন কি। ভদ্রতার অভাব আপনি যাকে বলছেন সে-একটা সঙ্কোচ মাত্র—মেয়েদের সঙ্গে না মিশলে সেটা কেটে যায় না।"

আমি বলিব, আমাদের সমাজে আজও এবং অনেক বেশী স্বাধীনতা সত্ত্বেও, সামাজিক জীবনের এই গুরুতর অসম্পূর্ণতা বেশ বর্তমান। নিঃসম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের একই জায়গায় শুধু শারীরিক উপস্থিতির জন্যই মেলামেশা হইতেছে, উহা বন্ধুভাবে মেলামেশা নয়। কথাবার্তা আচার-ব্যবহার, মনোভাব এখনও স্বাভাবিক, সাবলীল বা ধাতস্থ হইয়াছে বলিতে পারি না। আমি এইরূপ মেলামেশা'র জায়গায় প্রায়ই যাই। কিন্তু দেশীয় স্ত্রী-পুরুষকে প্রায় সর্বত্রই তেল-জলের মত ভাগ হইয়া পড়িতে দেখি। একদিন এক পার্টিতে গিয়া দেখি একটি আসনে দুইটি দেশীয় এবং একটি ইংরেজ মহিলা বসিয়া আছেন। আমি ইংরেজ মহিলাটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"Lady X, when did you arrive in India ?"

তিনি বলিলেন,

"Only last night, Mr. Chaudhuri,"

আমি টিপ্পনী করিলাম,

"You seem to have picked up the purdah very soon."

অবশ্য রহস্যটা তিনি তখনই বুঝিলেন, এবং একটি দেশীয়া ভদ্রমহিলাকে একটু ঠেলা দিয়া খানিকটা জায়গা করিয়া দিয়া বলিলেন,

"Come, sit down and separate us."

এই ব্যাপারটা খালি দেশী পার্টি হইলে আরও বেশী দেখি। একদিকে প্রৌঢ় ব্যক্তিরা তৃষিতনেত্রে অন্য পারের যুবতীদিগের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ উঠিয়া গিয়া কথা কহিতে ভরসা পাইতেছেন না। দেখিলে আমার কষ্ট হয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কোনও দেশেই সহজ নয়। ফ্রান্সের মত দেশেও উহা আয়ত্ত

করিতে হয়। তখন গাঁবেতা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে খুবই নাম করিতেছেন, তবু বৃদ্ধ তিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি মেয়েদের কাছে লিখতে বা কথা কইতে পারে? ফ্রান্সে ওই হল সব।"

মাদাম অ্যাডাম বলিলেন, গাঁবেতা ফরাসী সাহিত্য ও ইতিহাসে একেবারে নিমগ্ন থাকেন, এবং আর্টের বিচার করিতে পারেন।

তবু তিয়র আবার বলিলেন, "মেয়েদের কি তাকে ভাল লাগে? আমি মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করছি।"

মাদাম অ্যাডাম তখন উত্তর দিলেন, "আমি স্ত্রীলোক, আমার তো তাঁকে ভাল লাগে।"

কিন্তু গাঁবেতাও প্রথম দিনে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মাদাম অ্যাডামের বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বাজে স্যুট ও ফ্ল্যানেলের শার্ট পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন সকলেই ইভনিং ড্রেসে। তখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া গৃহকর্ত্রী নিজে গিয়া তাঁহার বাহু ধরিয়া খাইবার টেবিলে গেলেন। গাঁবেতা তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "মাদাম, এইভাবে শিক্ষা পাওয়া আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।"

সুতরাং যে-দেশে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ধারাটা বহু শতাব্দী ধরিয়া একেবারেই নাই সেখানে যে ওটা সহজে বা শীঘ্র গড়িবে না তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আর একটা মেলামেশার কথা বলা আমি প্রয়োজনই মনে করি না। সমপাঠী বা সহকর্মী যে সমপাঠিনী বা সহকর্মিণীর জন্য গাছ বা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে সিক্ত মার্জারের মত দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে আমি স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক ও সামাজিক মেলামেশা বলি না, কারণ পিতার গৃহদ্বার দৃষ্টিগোচর হইলেই তরুণী আরক্তমুখী ও আনতলোচনা হন, এবং অপরপক্ষ চম্পট দেন।

অথচ বিশপ হিবার ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে এই মেলামেশা ছিল। আমি সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার বর্ণণা যতই পড়ি, ততই মুগ্ধ হই। একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

চন্দ্রপীড় শিকার করিতে গিয়া শিবমন্দিরে মহাশ্বেতাকে গান করিয়া পূজা করিতে দেখিলেন। মহাশ্বেতা রাজা-রাজড়া দেখিয়াই দেবতাকে ছাড়িয়া নরদেবতার দিকে ছুটিয়া আসিলেন না; তখনও বিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ডে "some central ministers are also expected to attend", এই কথা

বসাইবার রেওয়াজ হিন্দুসমাজে হয় নাই। সেই সমাজে অতিথি মাত্রেই ছিলেন নারায়ণ, এবং নারায়ণ স্বয়ং রাজ অতিথিরও উপরে ছিলেন। তবে অর্চনা শেষ হইবামাত্র মহাশ্বেতা উঠিয়া মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামান্তে অতিথির কাছে আসিয়া বলিলেন,

"স্বাগতম্ অতিথয়ে। কথম্ ইমাং ভূমিম্ অনুপ্রাপ্তো মহাভাগঃ? তৎ উত্তিষ্ঠ, আগম্যতাম্, অনুভূয়তাম্ অতিথিসৎকারঃ।"

(সংস্কৃতের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বাংলায় আনা কঠিন, তাই এইটুকু এবং আরও খানিকটা সংস্কৃতেই রাখিব। বুঝিবার সুবিধার জন্য সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দিলাম।) চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার শয়নগুহার দ্বারে একটি শিলার উপর বসিলেন। মহাশ্বেতাও পর্ণপুটে করিয়া নির্ঝর হইতে অর্ঘ্যের জন্য জল আনিলেন, কুমার তখন বলিলেন,

"অলম্ অতিযন্ত্রণয়া; কৃতম্ অতিপ্রসাদেন, ভগবতি! প্রসীদ, বিমুচ্যতাম্ অত্যাদর। ত্বদীয়ম্ আলোকনম্ অপি সর্ব্বপাপপ্রশমনম্ অঘমর্ষণম্ ইব পবিত্রী-করণালয়ম্—আস্যতাম্।"

অনুবাদও দিতেছি—"এত কষ্টের প্রয়োজন নাই; এত বেশী আপ্যায়ন থাকুক, ভগবতি! আপনি প্রসন্ন হউন, অতি আদর ছাড়িয়া দিন। আপনার দর্শনই সর্বপাপের প্রশমন, অঘমর্ষণ সূক্তের ন্যায় পবিত্র করে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া বসুন।"

তবু মহাশ্বেতা যখন অনুরোধ করিলেন তখন রাজকুমার অতিথি পরিচর্যার সব-টুকুই অতিশয় নতমস্তকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই আচার-ব্যবহার ভারতবর্ষে কোথায় গেল? আজ সুন্দরী মেয়ে দেখিলেই জিভে লাল পড়িতে দেখি।

ইহা অবশ্য সাহিত্যের বিবরণ! কিন্তু সাহিত্যের এই ধারা যে আসল জীবনযাত্রার ধারা হইতে আসিয়াছিল সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাঙালী ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকদের শুধু এই ভদ্রতা ব্যতীতই নয়, নর-নারীর মেলামেশা ছাড়াই প্রেমের কাহিনী সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তবে দুই পক্ষকে একত্র করিবার কি উপায় ছিল? তাঁহাদিগকে বিপদে পড়িয়া কলিকাতায় পাশা-পাশি ছাদ ও ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইতে হইল। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'তে রমেশ ও হেমনলিনীর অনুরাগ ছাদ হইতেই বিকশিত হইয়াছিল; আর একটি অতি

সুন্দর গল্পের নায়ক-নায়িকাও ছাদ হইতে পরস্পরকে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল, সেটি 'ত্যাগ'।

ইহা ছাড়া কলিকাতা ও গ্রামে আত্মীয়-কুটুম্বিতার মধ্যে এমন কতকগুলি সম্বন্ধ ছিল যেখানে বিবাহ চলে, সুতরাং প্রেম আনিলে শুধু "চুটিয়ে পীরিত করে লম্বা দিবার" কথা বা প্রশ্ন উঠিত না। ইহাদের মধ্যে দাদার শ্যালক বা শ্যালিকা, অথবা আরও মধুর করিয়া বলিতে হইলে বৌদির ভাই বা বোন অত্যন্ত পরিগ্রহক্ষম বা-ক্ষমা ছিল। একটু আধুনিক পরিবার হইলে ভাই-এর বন্ধু ও ভগিনীর বান্ধবীও আসিয়া পড়িতেন।

কিন্তু ইহার পরেও সেকালের বাঙালী জীবনে একটি অতিমধুরিমাময় সামাজিক সম্পর্ক ছিল, যাহার উপর প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করা যাইত। সেটি বাল্যসঙ্গীর সহিত বাল্যসঙ্গিনীর সম্পর্ক। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মজীবনীতে একটি সুন্দরী খেলার সঙ্গিনীর কথা বলিয়াছেন—

> "একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তাহার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধূলা লেখাপড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। আমরা পাড়ার বালক-বালিকা মিলিয়া 'চাঁদ চাঁদ, কেন ভাই কাঁদ' প্রভৃতি অনেক খেলা খেলিতাম। তখন সে আমাদের সঙ্গে খেলিত। খেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে একদলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না। আমি তাহার হাত ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতাম, আমি এর সঙ্গে থাকব, তোমরা আমার বদলে এ দল হতে ও-দলে আর কারুকে দাও। বালকেরা আমার অনুরোধ রাখিত না, বকিয়া, ঠেলিয়া, গলা টিপিয়া আমাকে আর এক দলে দিয়া আসিত।"

শিবনাথ কলিকাতায় পড়িতে গেলেন এবং মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। সুতরাং দুজনের আর দেখা হইত না। পরে বড় হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর তিনি আবার মেয়েটিকে দেখিলেন,—

> "দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে, সন্তানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা 'তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী?' নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি।"

আমার বাল্যকাল পর্যন্তও এই বাল্যসঙ্গিনীরা ছিল। সত্তর বৎসরে উপনীত

হইবার পর গ্রাম্যজীবনের-এই চিত্ত-চাঞ্চল্যকারী মাধুর্যের কথা চাপিয়া রাখিবার কারণ দেখি না। বাল্যসঙ্গিনীর সহিত এই সম্পই ছিল আমাদের জীবনের বিকচোন্মুখ 'ফ্লার্টেশন', উহার মিষ্টতা বর্ণনা করা কঠিন। নয়, দশ, এগারো বছরের বালিকারাই উহার মায়াজাল ছড়াইত। উহা তাহাদের দিক হইতে আরও মায়াময় হইত কলিকাতায় শিক্ষিত, মার্জিত ও গ্রামের চুয়াড়ে ছেলেদের তুলনায় একেবারে অন্য জগতের কিশোর দেখিলে।

বড় বড় কালো চোখে সারাদিন দেখিয়া, আশেপাশে ঘুরিয়া, সন্ধ্যার পর বালকের তন্দ্রা আসিলে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া, মাথার চুল এলাইয়া দিয়া, গালে অতি কোমল গাল রাখিয়া কানে কানে বলিত, "দাদা, খেতে এস।" তখন সমস্ত শরীরে শিহরণ উঠিত না বলিলে একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথা বলা হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ ও শৈবলিনী বাল্যসঙ্গী ও বাল্যসঙ্গিনী। উপন্যাসে তাহাদের সম্পর্ক বিয়োগান্ত নাটকে পর্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন জীবনেও উহা আগমনীতে বিসর্জনের মত। তাই তিনি লিখিয়াছেন,

> "বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখাসাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়, কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!"

ইহার মধ্যে বাল্যসঙ্গিনীর স্মৃতি আরও মধুর। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন,

> "বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালপ্রভাবে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।"

রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' এই নিদারুণ অভিসম্পাতেরই গল্প। তবে এই অভিসম্পাত নায়কের নিজের সৃষ্টি। ইচ্ছা করিলে সে বাল্যসঙ্গিনীকে বিবাহ

করিতে পারিত, কিন্তু করে নাই। সংসারে প্রবেশ করিবার পর আবার তাহার সান্নিধ্যে পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—"বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি।" তখন আর তাহাকে পাইবার উপায় নাই। পরিণাম কি হইল তাহার আলোচনা আগেই করিয়াছি, কেন এমন হইল তাহার কথা পরে বলিব।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্পেও এই মধুরিমাময়ী বাল্যসঙ্গিনীর এক অপরূপ চিত্র আছে। গল্পটা অন্যদিক হইতে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু নায়কের চিঠির মধ্যে বাল্যসঙ্গিনীর কথা যেন একটা সাধারণ গহনার মধ্যে একখানা উজ্জ্বল মণি। নায়ক কলিকাতার ছাত্র, বি-এ ফেলও করিতে পারিয়াছে; হয়ত বাল্যসঙ্গিনীকে শহরে আবিষ্কার করার ফলেই ফেল করিয়াছে। তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছে বাল্যসঙ্গিনীর স্বামী দুশ্চরিত্র এবং মেয়েটির জীবন সুখের নয়। তাই তাহার জীবনে সুখ আনিবার জন্য কিছু পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে যুবক একখানা চিঠি লিখিল,—

"সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্ব্বদাই সেখানে হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জানো কিনা বলিতে পারি না, এক সময় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয়পক্ষের কর্ত্তারা কোনক্রমে রাজি হইলেন না।"

কলিকাতায় বাল্যসঙ্গিনীর বাসা খুঁজিয়া বাহির করিবার পর সে কি করিয়াছে, তাহার বিবরণ সে পরে দিতেছে,

"তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্য্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মত প্রবেশলাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্ত্তী একটি গ্যাসপোষ্টের তলে আমি সূর্য্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি—তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরে কাচের জানালাটির সম্মুখে স্থাপন কর—সেই মুহূর্ত্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত

প্রতিমাখানি আবার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।"

বাকীটুকু পাঠক গল্পটাতে পড়িবেন। উহার নাম যে 'ডিটেক্‌টিভ' তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতেই বোঝা যাইবে, বাল্যসঙ্গিনীকে কোন্ দিব্যলোকে লইয়া যাওয়া বাঙালীর মনে নূতন প্রেমের উদ্ভবের পর সম্ভব হইয়াছিল। ইহা কি 'ভিতা নুয়োভা' যে-লোকে তাহারই বাঙালীকৃত রূপ নয়? দান্তেও তো বেয়াত্রিচেকে নয় বৎসর বয়সেই দেখিয়াছিলেন। এই দেখার ফল কি হইয়াছিল তিনি পরজীবনে কবি হইয়া লিখিয়াছিলেন—

"Incipit vita nova. Ecce deus fortior me, qui veniens dominibatur mihi,"

(আজ হইতে নবজীবন আরম্ভ হইল। দেখ, এই দেবতা আমার চেয়ে শক্তিমান। তিনি আসিয়া আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর মন ও ভালবাসা

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ বাঙালীর কাছে খেটক-খর্পধারিনী করালী মূর্তিতে আবির্ভূতা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি আমাদের কাছে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাই প্রেমের প্লাবনে আমাদের হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই প্লাবন আসিয়াছিল কোন নদীতে? নদী কি বাস্তবিকই ছিল? এই প্রশ্নগুলি তুলিতেই হইবে। শান্তি যখন "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" গাহিতে গাহিতে নিজেদের কুটিরে প্রবেশ করিল তখন জীবানন্দ মাটিতে বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর দিলেন, "নালা-ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?"

সত্যিই প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগে বাঙালীর হৃদয় নালা-ডোবা হইয়া গিয়াছিল। সে

নালা-ডোবাও আবার কতখানি পঙ্কিল ছিল তাহার পরিচয় পাঠক-পাঠিকা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে তাহাতে বন্যা আসিয়া মনটির অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে তাহাকে "সর্বতঃ সম্প্লুতোদক" মন বলিতে পারা যায়। সে পাশ্চাত্য প্রভাব কি ও কি ধরনের, তাহার পরিচয় পরে দিব। এই পরিচ্ছেদে শুধু সেই জোয়ারের দৃশ্য দেখাইব।

ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জীবন হইতে প্রেমের নূতন রূপের সন্ধান পাইবার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালী ইহার আকর্ষণে ও আবেগে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। তখন প্রায় প্রতিটি বাঙালী যুবককেই তাহার অদৃষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারিত,—

"ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর ?"

সেও উত্তর দিত,—

"আমি কি যেন করেছি পান—
কোন্ মদিরা রসভোর,
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।"

অদৃষ্ট ধিক্কার দিয়া বলিত,—ছি, ছি, ছি! কিন্তু সে লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিত,—

"সখী, ক্ষতি কি!
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর।
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।"

যেহেতু বাঙালী চরিত্র বাঙালীরই চরিত্র, তাই এই অনুভূতিতে খানিকটা দুর্বলতা ছিল। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, এই নূতন প্রভাবে সে অতিরিক্ত আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভাবুকতা ও ভাবুকের মত চলাফেরা একটু লোকদেখানো হইয়াছিল, এমন কি ঢং এবং আদেখ্‌লেপনাও তাহার চরিত্রে ছিল।

তখন বাঙালী সবেমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি নূতন ভাব, আবেগ ও আবেশের খোঁজ পাইয়াছে। এই অনুভূতি তাহাদের মানসিক জীবনে

এমনই একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছিল যে তাহাদের স্থির থাকিবার উপায় ছিল না, তাহাদের সমস্ত চেতনা উহার উপর বড় নদীতে ডিঙ্গি নৌকার মত দোলা খাইতেছিল। সেই প্রবল তরঙ্গে ক্ষীণপ্রাণ বাঙালী যুবককে ডিঙ্গি ভিন্ন আর কিছু বলা যাইত না। তাই তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যেসব নূতন ভাব অনুভব করিতে শিখিয়াছে, যেসব নূতন তত্ত্ব পাইয়াছে, সে সবই তাহাদের মনের কপালে অনভ্যাসের ফোঁটার মত চড়চড় করিতেছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, তাহারা ভাবজগতের নূতন বড়লোক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে একটু আদেখ্‌লে বা লোকদেখানো হওয়া স্বাভাবিক। ইহা লইয়া একটু তামাশাও করা যাইত।

নব্যবঙ্গের এই বাউলরা দুই দিক হইতে অবজ্ঞা বা পরিহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদিকে ইংরেজ উহাদের অনুকরণশীল বানর বলিয়া মনে করিত, অন্যদিকে বিষয়ী ও রক্ষণশীল বাঙালীরা তাহাদের সং বলিয়া ভাবিত। সকলেই ধরিয়া লইত, এই মানসিক শৌখীনতা টিকিবার নয়, দুই এক ধোপ দিলেই উহার রং উঠিয়া দিব্য সাফ হইয়া যাইবে; তখন চাকুরি করিয়া বা ওকালতি ডাক্তারি করিয়া অল্প পয়সা গোনা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে উৎসাহ থাকিবে না। অনেক ক্ষেত্রে তাহা যে হইত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

সর্বোপরি তাহাদের 'লাভে' পড়িবার দুর্বলতা একটা পরিহাসের ব্যাপার ছিল। এ ধরনের 'লাভ' লইয়া মধুর পরিহাসের কাহিনী লেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভা'তে এই পরিহাস অতি মৃদু ও মধুর ভাবে আছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পেও ইহার অবতারণা করা হইয়াছে। তাঁহার তিনটি গল্পের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে—একটি 'বৌচুরি', একটি 'মানিকের প্রেম' ও তৃতীয়টি 'আমার প্রেম'। (শেষ গল্পটির নাম আমার স্পষ্ট মনে নাই *)। রবীন্দ্রনাথ এই নব্যবঙ্গকে জানিতেন। নূতন বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, ইহা যে পরিহাসের খোরাক যোগাইতে পারে ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার 'অধ্যাপক' গল্পে এই দুর্বল আত্মম্ভরিতা লইয়া একটু নির্মম ব্যঙ্গই তিনি করিয়াছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাও জানিতেন যে, এই দুর্বলতাই নূতন বাঙালী চরিত্রের সবটুকু নয়। এমন কি 'অধ্যাপক' গল্পেও উহার সরলতার দিক তিনি চাপা

* গল্পটির নাম 'আমার উপন্যাস'। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে আবার পড়িলাম ও অতি মধুর লাগিল।—ন.চ. (২।৪।৬৯)

দেন নাই। নায়ক অহমিকার বশে নিজেকে একেবারে বোকা বানাইয়াও পরে নিজেকে উদ্ধার করিল। নিজের বোকামির কাহিনীর সে নির্মমভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া শেষে লিখিল, "রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম। গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।"

কিন্তু বাঙালী চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতার সহিত অসাধারণ শক্তির সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন সর্বোপরি 'সমাপ্তি' গল্পে, অপূর্বের চরিত্রে। এই গল্পটিতে কোন্ চরিত্র মুখ্য, কোনটি গৌণ সে সম্বন্ধে ভুলের অবকাশ আছে। আমি দেখিয়াছি, অনেকেই মনে করেন, মৃন্ময়ীই প্রধান, শুধু তাহার উদ্দাম সরলতার লক্ষ্য হিসাবে শৌখীন অপূর্বের অবতারণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ গল্পটা হাস্যরসের, এটা একটা মিষ্ট পরিহাস; খুব বেশী হইলে গ্রাম্য প্রাকৃত চরিত্রের একটা 'ঈডিল্'।

অপূর্ব যেভাবে দেখা দিল এবং যেভাবে তাহার বিবাহ পর্যন্ত ব্যাপারটা চলিল, তাহাতে এই ধারণা করা অসঙ্গত নয়। শৌখীনতার ধাক্কা অবশ্য প্রথমে তাহার বেশভূষা, প্রসাধন, ও অন্যান্য বাহ্যিক আচারেও পৌঁছিয়াছিল। তাই তাহার বাক্সে যে এসেন্স, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ, হার্মোনিয়াম শিক্ষা ও কবিতার খাতা থাকিবে তাহা মোটেই আশ্চর্য নয়। আমার বাল্যকালে কলেজে পড়া এক পিসতুতো দাদা শহর হইতে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি যখন ট্রাঙ্ক খুলিলেন তখন দেখিলাম, উহাতে ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ ইত্যাদি সবই আছে। রুবিনির ক্যাম্ফর কি আজকাল অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। আমি অনেক দেখিতাম—উহা কলেরার প্রতিষেধক। তখন আধুনিক ব্যক্তিমাত্রেই গ্রামে আসিবার সময়ে উহা লইয়া আসিত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সমাপ্তি' গল্পে ভাবিলেন, এই যে চরিত্র—যাহা আপাতদৃষ্টিতে বলহীন ও শৌখীন, তাহা লইয়াই দেখাইবেন উহার অন্তর্নিহিত শক্তি কতটুকু, এই চরিত্রই কিভাবে আদর্শের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, অবিচলিত বিশ্বাস, সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা সকল অসামর্থ্য অতিক্রম করিয়া কোথায় উঠিতে পারে। অপূর্ব যে উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহার শৌখীনতা যে উপরের বার্নিশ বা রং মাত্র, ভিতরের পদার্থ নয়,

তাহার পরিচয় গোড়াতেই পাওয়া গিয়াছিল। বলিষ্ঠতা না থাকিলে সে মৃন্ময়ীর প্রেমে পড়িত না, কারণ কে ঝোঁকের মাথায় মৃন্ময়ীকে বিবাহ করিবে স্থির করিলেও আগে অবকাশের সময়ে, এমন কি অনবকাশের সময়েও তাহার মুখখানির কথা অনেক চিন্তা করিয়াছিল। তার পর এই বিবাহের জন্য জেদেও তাহার মনের জোর দেখা গিয়াছিল। তবু বলা যাইতে পারে, এ দুই-এর মধ্যে আবেগের প্রভাব ছিল। কিন্তু বিবাহের পর হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তাহার শক্তির উপর সত্যিই টান পড়িল।

বাংলা সাহিত্যে প্রেমের গল্পের নায়কেরা সাধারণত কাপুরুষ হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের 'হৈমন্তী' ও 'অপরিচিতা' গল্পের এবং শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' ও 'অরক্ষণীয়া' গল্পের, চারিটি নায়কের মত কাপুরুষ কল্পনা করা শক্ত। তবু ইহাদের মধ্যে অনুপম ও শেখর খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, অন্য দুটির কাপুরুষতা একেবারে সীমাহীন। এই মাপে বিচার করিলে অপূর্বকে বীর বলিতে হয়। সে মায়ের ভর্ৎসনা সত্ত্বেও বৌকে বাপের কাছে লইয়া যাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, বাঙালী যুবকের মত অভিভাবকের সম্মুখে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত দেখায় নাই।

কিন্তু সর্বোপরি তাহার বীরত্ব দেখা গিয়াছিল মৃন্ময়ীর প্রতি তাহার ভালবাসা সম্পর্কে। বিবাহের পরই দেখা গেল, গ্রামের লোক তাহার পছন্দের নামকরণ যে 'অপূর্ব পছন্দ' করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। সত্যই তাহার বধূ তাহার মাতার বর্ণনার অনুরূপ—অর্থাৎ অস্থিদাহকারী দস্যু মেয়ে। তখনকার দিনের বাঙালী সমাজে উপহাস্য 'লাভে' পড়িয়া, নানা দিকে বোকা বনিয়া ও হাস্যাস্পদ হইয়া দুর্বল ব্যক্তি আক্কেলসেলামী দিতে প্রস্তুত থাকিলেও প্রেমে নিষ্ঠা রাখিতে পারিত না, কলিকাতায় ফিরিয়া ব্যর্থ ভালবাসার জালা বেশ্যালয়ে মিটাইত, যদি সত্যিই ভালবাসিয়া থাকিত তাহা হইলে আরও সেখানে যাইত।

আপনাদের বলিয়া দিতে হইবে না যে, প্রাণ দিয়া ভালবাসা অনেক ক্ষেত্রেই জানিয়া শুনিয়া বিষপান করার মত। যাহার ভালবাসার ক্ষমতা যত বেশী তাহার বিপদও তত বেশী। তাই 'গোরা'তে আনন্দময়ী বিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও যদি একবার আত্মসমর্পণ করলে, তবে ও আর কিছু হাতে রাখতে পারে না। সেইজন্যে আমাকে বড় ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়, ওর পাছে এমন জায়গায় মন যায় যেখান থেকে ওর কিছুই ফিরে পাবার আশা নেই।" বেশীর ভাগ লোকের সৌভাগ্য এই যে, তাহারা ভালবাসার অক্ষমতার জন্য,

হৃদয়ের ক্ষুদ্রতার জন্যই জীবনের চরম দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায়।

প্রেম খেলা নয়, ব্যর্থ প্রেম আরও ভয়ানক—হৃদয়দহনজ্বালা, সারাজীবন না মরিয়া চিতানলে দগ্ধ হইবার মত। অতি অল্প লোকেরই এই জ্বালা সহিবার ক্ষমতা থাকে। তাই অসহনীয় হইলে কামের শরণাপন্ন হইয়া সেই দাহ নিভাইতে চাহে। ইহা যে স্বাভাবিক তাহাও আপনাদিগকে বলিতে হইবে না। একমাত্র কামই ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণাকে নাইট্রিক অ্যাসিডের মত পোড়াইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু হায়, এই অ্যাসিডে সোনাই পুড়িয়া যায়, শুধু খাদ থাকে।

অপূর্ব প্রেমে নিরাশ এবং হাস্যাস্পদ হইয়াও এক মুহূর্তের জন্য নিজের উপর মৃন্ময়ীর উপর বা প্রেমের উপর আস্থা হারায় নাই। এমন কি কলকাতায় যাইবার আগে মৃন্ময়ীর মনে বিরহব্যথা জাগাইবার চেষ্টা করিয়া অতিশয় হাস্যকর উত্তর পাওয়াও তাহার মনে হয় নাই যে সে ভুল করিয়াছে। শুধু পাশে ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর মুখের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়ার পর সেদিকে চাহিয়া ভাবিল—যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে; এরপর সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়; রূপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল। কলিকাতায় ফিরিবার পর মৃন্ময়ীর কাছে হইতে কোন চিঠি না পাইয়া বা কোন সাড়া না পাইয়াও তাহার ভালবাসা টলে নাই, এমন কি অভিমান ত্যাগ করিয়া সে নিজেই চিঠি লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই দৃঢ়তা দুর্বল বা শৌখীন বাঙালী যুবকের ধর্ম নয়—ইহার জন্য শৌখীনতার পিছনে আরও কিছু থাকা প্রয়োজন—সে বীরত্ব। মনে রাখিবেন, যুদ্ধের অপেক্ষাও পুরুষের শক্তি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় ভালবাসিবার ক্ষমতার মধ্যে। যুদ্ধ পুরুষের আত্মপ্রকাশ, ভালবাসা পুরুষের আত্মবিস্মৃতি। তাই যুদ্ধে আত্মসমর্পণে কলঙ্ক আছে, প্রেমে আত্মসমর্পণে গৌরব ভিন্ন কিছু নাই।

এর পর বাঙালী মেয়ের মনে প্রেমের বিকাশের কথা। 'সমাপ্তি'র প্রসঙ্গেই উহার আলোচনা করিব। মৃন্ময়ী একটি দুরন্ত, উদ্দাম গ্রাম্য বালিকা, ইংরেজীতে যাকে বলে, 'টমবয়', তাহার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, সে পাগলী, আচারব্যবহার ও কার্যকলাপের জন্য একাধারে স্নেহ ও কৌতুকের পাত্রী ইহাই তাহার চরিত্র নয়। অপূর্বের শৌখীনতা যেমন বাহ্যিক ব্যাপার, এগুলিও তেমনিই বাহ্যিক ব্যাপার। মৃন্ময়ী যদি শুধু এ রকমই হইত—তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে গল্প লিখিবার আবশ্যক হইত না। কি ধরনের গ্রাম্য মেয়ে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের

মনে মৃন্ময়ীর সূচনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে আছে। রবীন্দ্রনাথের বজরা ১৮৯১ সনের জুলাই মাসে সাজাদপুরের ঘাটে বাঁধা ছিল। তীরের অনেকগুলি 'জনপদ-বধূ'র মধ্যে তিনি একটি মেয়েকে দেখিতে পান। তিনি লিখিতেছেন—

> "ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়স বারো-তেরো হবে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চৌদ্দ-পনর দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসঙ্কোচে কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।··· বাস্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা ছেলে আধা মেয়ের মত হয়ে আরও একটা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মত আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব তার এবং সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নূতন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে।"

সেই মেয়েটির মা বলিতেছিল—মেয়িটির বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, 'কারে কি কয়, কারে কি হয়, আপনপর জ্ঞান নেই।' সে-ও শ্বশুরবাড়ি যাইতে চাহে নাই, টানিয়া-টুনিয়া নৌকায় তোলা হইয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃন্ময়ী এ মেয়ে নয়। অমন মেয়ে বাংলাদেশে সহস্র সহস্র জন্মিত।

আসলে মৃন্ময়ী অন্য চরিত্রের নায়িকা। তাহার প্রথম রূপ পুরুষের প্রেম সম্বন্ধে অসাড়হৃদয় একটি সুপ্তচৈতন্য কিশোরী বা যুবতীর। সেই অবস্থায় তাহার যে উদ্দাম চঞ্চলতা দেখানো হইয়াছে তাহা শুধু তাহার বলিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—"সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।"

মৃন্ময়ী চরিত্রের মূলগত কথাটা ভুলিলে চলিবে না। 'সমাপ্তি'-তে দুইটি মৃন্ময়ী পর পর দেখা দিল। প্রথম মৃন্ময়ী শিশু—যৌবনের দেহগত প্রকাশেও শিশু; অপরটি কিশোরী হইয়াও পূর্ণবিকশিতা নারী। মুকুলের পরিণতি পুষ্পে হইয়াছে, ইহা মনে না রাখিলে গল্পটা পড়াই বৃথা। এই কারণেই উহা আমার কাছে বাঙালী

জীবনে ভালবাসার অনুপস্থিতি ও আবির্ভাব, এ দুয়েরই প্রতীক।

চেতনা পাইবার পর ও প্রেমের পিপাসা জাগিবার পর যে মৃন্ময়ী দেখা দিল, আগেকার উদ্দাম মৃন্ময়ী সম্বন্ধে সে মৃন্ময়ীর কোন সমবেদনা বা প্রশ্রয় ছিল না। যে পরিতাপ ও লজ্জায় নূতন মৃন্ময়ী নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল তাহা এই—স্বামী তাহাকে দুরন্ত, চপল, অবিবেচক, নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃত-ধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না। ইহার জন্য স্বামীর উপরও তাহার অভিমান হইল—সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন?"

অপূর্ব তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া গেল তাহা স্মরণ করিয়া মিলনের প্রাক্কালেও মৃন্ময়ীর মনে একটা ভীতি রহিল। শাশুড়ী যখন তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবেন বলিলেন, তখন সে সুখে-আনন্দে অধীর হইয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া হাসিয়া নড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল বটে; কিন্তু পরমুহূর্তেই অপূর্ব তাহাকে কি মনে করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিষণ্ণ, গম্ভীর এবং আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কাঁদিতে লাগিল—পাছে অপূর্ব তাহার নূতন সত্তার পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ অপূর্বের দিক হইতে প্রত্যাখ্যান এড়াইবার জন্য তাহাকে যাহা করিতে হইবে, সেটাও কম সঙ্কোচের ব্যাপার নয়; প্রগল্‌ভা এমন কি ব্যাপিকা হইয়া তাহাকেই অগ্রসর হইয়া স্বামীকে আদর করিতে হইবে। ইহা দিনের বা প্রদীপের আলোতে তখনই ভীতা, সঙ্কুচিতা মৃন্ময়ীর পক্ষে সম্ভব হইত না, তাই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সমাপ্তি অন্ধকার ঘরে করিয়াছিলেন। গভীর অন্ধকারই মৃন্ময়ীকে যাচিয়া গিয়া আত্মসমর্পণের সাহস দিয়াছিল।

'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ীকে বাদ দিয়া এই ধরনের সুপ্তচৈতন্য আরও তিনটি নায়িকার কথা আমি পড়িয়াছি। উহাদের একটি রবীন্দ্রনাথেরই 'মাল্যদান' গল্পের কুড়ানি, একটি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ও আর একটি জোসেফ কনর‍্যাডের 'রোভার' উপন্যাসে আর্লেৎ। ইহাদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হইবার পর মৃন্ময়ী ও আর্লেতের জীবন সুখের হইয়াছিল, কুড়ানির অদৃষ্টে প্রেমের ফল দাঁড়াইয়াছিল মৃত্যু, কপাল-কুণ্ডলার প্রেম সম্বন্ধে কোন চেতনাই হয় নাই। কপালকুণ্ডলা অবশ্য শুধু পুরুষ সম্বন্ধে সুপ্তচৈতন্য ছিল, নিজের সম্বন্ধে নয়।

আর, নায়কদের দিক হইতে তিনজন—'সমাপ্তি'র অপূর্ব, 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার, ও 'রোভারে'র লেফটেনাণ্ট রেয়াল চেতনা জাগ্রত হইবার অপেক্ষা না

রাখিয়াই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল; 'মাল্যদানে'র যতীন ভালবাসে নাই শুধু এইজন্য যে, তাহার মনে হইয়াছিল এই অবস্থায় প্রণয়ের সম্ভাবনা তোলাই নিষ্ঠুরতা হইবে; লেফটেনাণ্ট রেয়ালেরও তাহাই মনে হইয়াছিল, এবং নিজেকে সংযত করিতে না পারার জন্য সে ধিক্কারে আত্মহত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কেবল যুদ্ধের সময়ে সেনানীর প্রাণ তাহার দেশের, নিজের নয়; সেজন্য করে নাই। কুড়ানি তাহাকে ভালবাসে শুনিয়া পরে যতীন নিজেও তাহাকে ভালবাসিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। যে নারীর প্রেম বা পুরুষ সম্বন্ধে কোন চেতনাই নাই, তাহাকে ভালবাসা কি করিয়া সম্ভব? এ যেন পিগম্যালিয়নের গল্পের মত, নিজের মূর্তি গড়িয়া তাহাকে ভালবাসা। কিন্তু তাই যদি হয়, সেটাও অস্বাভাবিক নয়। পিগম্যালিয়নের গল্পটাকে নরনারীর প্রেমের একটা রূপক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বেশীর ভাগ প্রণয়ীই বুঝিতে পারে না যে শরীর-ধারিণী প্রণয়িনী দেখা দিবার বহু পূর্বে তাহার মনে প্রণয়িনীর একটা মানস-প্রতিমা গড়া থাকে, ভালবাসার জন্য শুধু এমন একটি জীবন্ত নারীর অপেক্ষা থাকে যাহার উপর মানস-প্রতিমাকে আরোপ করা যায়। ইহাও বলা দরকার যে, এই আরোপণ খুব শক্ত নয়। যদি জীবন্ত নারীটি দেহে ও মনে মানস-প্রতিমার বিসম্বাদী না হয়, এবং সে নিজে যদি রূপ, বিদ্যা বা বাপের টাকার গুমোরে এই আরোপণে বাধা না জন্মায় তাহা হইলে অশরীরিণী ও শরীর-ধারিণীর ঐক্য অতি সহজেই হইয়া যায়।

আসল কথা এই, পুরুষ নারীকে ভালবাসে সে নারী বলিয়াই—সে অমুকের কন্যা, সে অমুক পরীক্ষা পাস, বা তাহার এত টাকা আছে বলিয়া নয়, এমন কি তাহার এত সব গুণ আছে বলিয়াও নয়। এ বৃত্তিটা প্রায় ষোল আনাই কোন সুন্দর জীব বা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবার মত—কাহারও বাঘ দেখিলে ভাল লাগে, কাহারও ময়ূর, কাহারও বিড়ালছানা, কাহারও বা গাছ ও ফুল, কাহারও প্রভাত ও সন্ধ্যার আকাশ ও মেঘ মাত্র। তাই প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শুধু সন্ধ্যার মেঘমালা মনে করিয়াও ভালবাসিতে পারে।

তবে কি বুদ্ধি ও মনের সহিত ভালবাসার কোন সম্বন্ধ নাই? একটা আছে, সেকথা পরে বলিব। প্রথমে এইটুকু মাত্র বোঝা দরকার যে, প্রেমের প্রথম প্রকাশে মন অবর্জনীয় নয়, মনের পরিচয় না পাইলেও ভালবাসা সম্ভব। লেফটেনাণ্ট রেয়াল সুপ্তচৈতন্য আর্লেৎকে ভালবাসিয়া নিজেকে সেই নিগড়

হইতে মুক্ত করিবার জন্য অবজ্ঞাভরে কেবলই বলিতেছিল—"Body without a mind! Body without mind." শুধু তাই নয়, পিগম্যালিয়নের কথাও স্মরণ করিয়াছিল—

"Hasn't there been once a poor devil who fell in love with a picture or a statue? He used to go and contemplate it. His misfortune cannot be compared with mine! Well, I will go to look at her as at la picture too, a picture as a untouchable as if it had been under glass."

কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়! পরমুহূর্তেই তাহাকে বলিতে হইয়াছিল—

"No, it isn't that. All in her is mystery, seduction, enchantment. And then—what do I care about her mind?"

প্রেমের জন্য যে জিনিসটার প্রয়োজন হয় (অবশ্য আমি পুরুষের কথাই বলিতেছি, নারীর দিক হইতে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই) তাহা জীবন্ত নারীত্ব, দেহে ও প্রকৃতিতে। রূপ, দেহসৌষ্ঠব, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, চলাফেরা সবেতেই উহার প্রকাশ হয়, কখনও এগুলির কোনও একটা কখনও বা সবগুলি অল্প বিস্তর জড়াইয়া আকর্ষণের সৃষ্টি করে। নবকুমার রূপ দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল। তাই কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে আসিয়া তাহাকে বলিতে হইয়াছিল,—"তুমি কি জানিবে, মৃন্ময়ি! তুমি তো কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই, তুমি তো কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই!"

অপূর্ব কি দেখিয়া মৃন্ময়ীকে ভালবাসিয়াছিল তাহার কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন।—

"পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ হয় স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মানুষপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য

নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মত সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।"

তবে ভালবাসা এভাবে আরম্ভ হইলেও পরিণতি পাইবার জন্য, এমন কি বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও মন ও বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু সে বুদ্ধি অর্থোপার্জনের, দেশের নেতা হইবার, গবেষণা করিবার, এমন কি সামাজিক ও পারিবারিক জীবন নিপুণভাবে চালাইবার বুদ্ধি নয়। প্রেমের জন্য (দাম্পত্য-জীবন কেবলমাত্র প্রেম তাহা বলিব না) শুধু সেই বুদ্ধির প্রয়োজন যাহা নারী-প্রকৃতিকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলে। আর প্রেমের জন্য যে মনের প্রয়োজন হয়, সে মন যাহা হইতে 'মনীষা' কথাটার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে সে মন নয়। উহা সেই মন যাহাতে জীবন ও প্রেম প্রতিফলিত হয়, যাহা জীবন ও প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারে।

যে নারীর এই ধরনের মন আছে, পুরুষের কাছে তাহার শারীরিক সত্তার চারিদিকে আর একটা বিভাময় অশরীরী সত্তার সৃষ্টি হয়, ইহা ছাড়া নারীর দিক হইতে প্রেমের প্রতিদান দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। প্রেম সম্পর্কে মন অনেকটা রেডিওর অ্যাম্পলিফায়ারের মত, যাহা ভিতরে আসে তাহা বহুগুণ করিয়া বাহির করে। এই মন যদি কোন ভালবাসার পাত্রীর প্রথম হইতেই জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলেও কোনও পুরুষের ভালবাসা সেই মনকে জাগাইতে পারে। ইহাই 'সমাপ্তি'র মত গল্পের মূলকথা।

এই তো গেল মরা গাঙ্গে বান ডাকিবার কথা। কিন্তু সেই যুগের বাঙালী প্রেমের উচ্ছল রূপের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসেরও সন্ধান পাইয়াছিল—উহা সতীত্ব বা পাতিব্রত্য। হিন্দুর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণা বাঙালী নূতন করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাইয়াছিল, এ কথাটা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য, এমন কি অশ্রদ্ধেয় মনে হইতে পারে। তবু কথাটা সত্য। কোনও একটা জিনিসের জিনিস হিসাবে অস্তিত্ব, আর লোকের মনে অস্তিত্বের অনুভূতি, একই ব্যাপার নয়। আমি এক্ষেত্রে অনুভূতির কথাই বলিতেছি। এ যেন শ্রুতিতে উক্ত দুইটি পাখীর বিভিন্ন কাজের মত,—

> "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

(দুইটি সুন্দর পক্ষী অবিচ্ছেদ্য বন্ধুভাবে একই বৃক্ষে থাকে। ইহাদের একটি

তৃপ্তির সহিত ফল খায়, আর অন্যটি না খাইয়া শুধু দেখে।)

মানুষের মনও একই সঙ্গে দুইটি পাখী। মন কিছু করে কিনা সে-বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের সন্দেহ আছে, কিন্তু মন যে দেখে ও দেখিয়া সুখী হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

তেমনই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য বাঙালী হিন্দুসমাজে থাকিলেও উহা দেখিয়া সুখ বা গর্ব অনুভব করিবার মত ক্ষমতা বাঙালীর মনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আসিবার পূর্বে আসে নাই। এখানে প্রাসঙ্গিক বলিয়া একটা সূত্র ধরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী যে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করে তাহাতে সে পাশ্চাত্ত্যের উচ্চতম জিনিসের সহিত প্রাচ্যের উচ্চতম জিনিসের সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যে স্বাদেশিকতা হইতে সমন্বয়ের ধারণাটা আসিয়াছিল সেই স্বাদেশিকতা, এবং সমন্বয়ের মধ্যে যে দেশী জিনিস আনিতে হইবে উহার জ্ঞান পর্যন্ত বাঙালীর কাছে সাক্ষাৎভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আসে নাই—আসিয়াছিল ইউরোপ বা পাশ্চাত্ত্য জগৎ ঘুরিয়া। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাইয়াছিলাম, ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বের গবেষকদের কাছ হইতে। সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রাই আমাদিগকে দেশের কথা শিখাইয়াছিলেন।

কিন্তু দেশের সন্ধান পাইবার পরই আমরা ইউরোপ হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় জিনিসকে মিলাইবার চেষ্টাও আমরা করিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া ইউরোপীয় ধ্যানধারণাকে আমরা একটা ভারত-বর্ষীয় রূপ দিতে প্রয়াস করিয়াছিলাম, অন্ততপক্ষে উহার উপর একটা দেশী ছাপ বসাইয়াছিলাম। ইহার দুইটা দৃষ্টান্ত দিব। ব্রাহ্মধর্ম ভারতবর্ষে বা বাঙালী জীবনে খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ আনিয়াছিল, কিন্তু উহার বাহ্যিক রূপ খৃষ্টীয় রাখে নাই, উহার উপর উপনিষদের ব্রহ্মের রূপ চাপাইয়াছিল—দুই ধরনের একেশ্বরবাদ সমধর্মী না হওয়া সত্ত্বেও। তেমনই ইউরোপ হইতে প্রেমের ধারণা পাওয়া মাত্র উহাকে আমরা শকুন্তলা ও মহাশ্বেতার প্রেমের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আসলে যাহা করিলাম, তাহা এই ব্যাপারের উল্টা। বাংলার নূতন সাহিত্যে শকুন্তলা ও মহাশ্বেতার প্রেম ইউরোপীয় রোমান্টিক রূপ ধারণ করিল। উহার আভাস আগেই দিয়াছি।

প্রেমের সহিত সতীত্ব বা পাতিব্রত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা এই বড় ব্যাপারটারই

অন্তর্ভুক্ত। নরনারীর সম্পর্কের রোমান্টিক পাশ্চাত্ত্য রূপের সন্ধান পাইবামাত্র বাঙালীর মনে হইল এই 'থিসিস'-এর একটি দেশী 'কাউণ্টারথিসিস'-এরও প্রয়োজন আছে। তাই বাংলা সাহিত্যে পাতিব্রত্যের ধারণাও নূতন রূপ ও নূতন গৌরব ধরিয়া দেখা দিল।

'দেবীচৌধুরানী'তে নিশি ও প্রফুল্লের মধ্যে কথা হইতেছিল। নিশি বলিল,—

"যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল,—

"দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?"

নি। "মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।"

প্র। "আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।"

বাঙালীর কাছেও প্রেম ও পাতিব্রত্য দুই ধারণাই নূতন ছিল।

কিন্তু এইভাবে পাতিব্রত্যকে ফিরিয়া পাইবার পর সে-যুগের বাঙালী উহাকে পুরাতন বলিয়া তুচ্ছ করা দূরে থাকুক, প্রেমের অপেক্ষাও উহার মহিমা বেশী করিয়া কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল।

ইহার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাই। তিনিই একই সঙ্গে নূতন প্রেমের প্রবর্তক ও নূতন পাতিব্রত্যের ধারণার উপাসক। এইজন্যই নিশি ও প্রফুল্লের কথোপকথনের পরই বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি পাই—"নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে পতিভক্তির মহিমা জুড়িয়া আছে। তিনি ইন্দিরাকে দিয়া বলাইলেন,—

"যে বুদ্ধি কেবল কালেজের পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌছে, ওকালতীতে দশটাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সম্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষের মত নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতি-ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি?"

সতীত্বের প্রতি এই ভক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অসতীত্বের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। উহার স্পষ্টতম প্রকাশ দেখিতে পাই 'চন্দ্রশেখরে'।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমের মধ্যে কলুষভাব তিলমাত্র ছিল না। তবু, যেহেতু চন্দ্রশেখরের পত্নী হইয়াও শৈবলিনী প্রতাপের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে তারকা-কন্যাদের মুখে এই কথা বসাইয়াছিলেন,—

"নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে, 'দেখ, ভগিনি, মনুষ্যকীটের মধ্যে আবার অসতী আছে'! কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে, কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে।"

আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা হয়ত ইহাকে সেকেলে গোঁড়ামি বলিবেন। কিন্তু সে-যুগের বাঙালীর পক্ষে ভালবাসার গৌরবের সহিত সতীত্বের গৌরবের অনুভূতিও পোষণ না করা সম্ভব ছিল না। এমন কি সেই 'সিম্বেসিসে'র হাওয়ায় বড় হওয়ার ফলে আমিও সতীর সম্বন্ধে গর্বের কথাই বলিয়াছি। ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত ইংরেজ জীবন সম্বন্ধে বই-এ আমি লিখিয়াছি,—

"If anybody tells you that the Hindu ideal of wifely devotion is on imposition by a patriarchal society, a tyranny prompted by male jealousy. do not believe a word of it. It simply is not true. With us, paradoxical as it may sound, it was the women who stole the wind out of the sails of the men. They set up an ideal of faithfulness which not only made the noose and the sack unnecessary, but even the worth of man of no consequence. Hindu women gloried in the idea of Sati (which is not the same thing as the Suttee of the Englsh language, though the word is the same), and gave their love irrespective of the merits of the recipient, in which their defiant love partook of the quality of God's love in Christianity, which is given freely without reference to the worth of man."

কিন্তু প্রেম ও পাতিব্রত্য সমানভাবে গ্রহণ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও গল্প-উপন্যাসে উহার সমন্বয় করা সহজ হয় নাই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র একই গল্পে

দুইটি জিনিসকে মোটেই মিলাইতে পারেন নাই। তাঁহার চৌদ্দটি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে একটি—'কৃষ্ণকান্তের উইল', শুধু পাতিব্রত্য ও সতীত্বের গল্প; দশটি শুধু প্রেমের গল্প; তিনটি—'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ', দুই-এর সংঘাতের গল্প।

অথচ দুইটি জিনিস যে স্বতন্ত্র, এ দুই-এর সমন্বয়ের যে একটা প্রশ্ন আছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত ছিলেন। ইহার পরিচয় 'আনন্দমঠে' একস্থলে জীবানন্দ ও শান্তির কথাবার্তার মধ্যে পাই। সে জায়গাটা উদ্ধৃত করিব,—

"বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কই, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?'

"জীবানন্দ আহ্লাদে গদ গদ হইয়া বলিলেন, 'শিখাইলে ত!'

"শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, 'আরও দেখ, গোসাঁই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে'?"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে—প্রেম প্রেম, পাতিব্রত্য পাতিব্রত্য। কিন্তু দুইটি কোথাও একেবারে মিলে নাই।

আমার যতটুকু জানা আছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে শুধু একটিমাত্র গল্পে প্রেম ও সতীত্বের মিল হইয়াছে। উহা রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প। এই গল্পটির কোনও আলোচনা পড়িও নাই, শুনিও নাই। কেন এইরূপ হইল ভাবিয়াছি, কারণ গল্পটি সৌন্দর্যে অপরাজিত; রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র' ইত্যাদির সহিত তুলনা করিলেও অপূর্ব। কিন্তু উহার সন্ধান দিতে ভয় হয়। তাহারও সঙ্গত কারণ আছে, অন্তত আমার কাছে কারণটা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ভয়টা এই—আমার লেখার ফলে আবার কোন্ ঘরের মেয়েকে সিনেমার বাজারে বাহির করা হয়। তবে হয়ত এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ কম। এই গল্পটির ঘটনাবলী শুধু একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের বাঙালী বধূর মনের কথা, বাহিরের

কিছুই নয় বলিলেই চলে। তবু সেই মানস জগৎ কর্মজগৎকে ছাড়াইয়া ও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় এই ধূলিময় পঙ্কিল সংসার—যাহাতে বাস করিয়া নির্মল থাকিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, তবু যাহার ক্লেদ সর্বাঙ্গে মাখিতে হইতেছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া ছায়াপথে উঠিয়া গিয়াছি, উহার স্নিগ্ধ আলোতে এক অপরূপ প্রেমের আহুতি দেখিতেছি।

কুমু, কুমু, কুমু! তোমাকে যৌবনে যদি দেখিতাম, ভালবাসিবার সাহস হইত না, দেবী বলিয়া পূজা করিতাম। তুমিই লিখিয়াছ কি করিয়া তোমার স্বামী তোমাকে দেবীপদে বসাইয়াছিল। "স্বামী কহিলেন—'কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।'—বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি চুম্বন করিলেন,—সেই চুম্বনের দ্বারা আমার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেই ক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল।"

যে স্বামী তোমাকে এইভাবে দেবীপদে বসাইয়াছিল, সে-ই তোমাকে দেবীত্বের জন্যই মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা দিয়াছিল। তাই স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া তুমি বলিয়াছিলে, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই—আমি তোমার ঘরের গৃহিণী—আমি সামান্য নারী মাত্র।" তোমার স্বামী তখনও বলিয়াছিল, "তুমি আমার দেবী।" আমার কাছেও তুমি দেবী।

আজি আমি পঁচিশ বৎসর বাংলা দেশ ছাড়া। সুতরাং বলিতে পারি না, এখনও বাঙালীর ঘরে কুমুর মত মেয়ে দেখা দেয় কিনা। বাঙালীর সবই গিয়াছে—নদী, জল, প্রান্তর, বন, আকাশ, কিছুই নাই। তবে কুমুর মত মেয়েই বা থাকিবে কেন? তবু বলিব, একদিন যে আমাদের মনে এমন একটি মেয়ের ধারণাও জন্মিয়াছিল, শুধু তাহাই আমাদের গর্বের কথা, সুখস্মৃতির অবলম্বন।

গল্পটার নাম প্রথমেই বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা হয়ত এতক্ষণে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তাই নামটা এখনও উহ্য রাখিলাম।

গল্পটির সহিত আমার পরিচয়ের উপলক্ষ্য একটু বিচিত্র। আমি তখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (আজকালকার সপ্তম শ্রেণীতে) পড়ি, ও আমার দাদা দ্বিতীয় (আজকালকার নবম) শ্রেণীতে পড়েন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষাতে ইংরেজী ভাষার প্রশ্নপত্রের প্রথমভাগ লইয়া বাড়ী ফিরিলে দেখিলাম বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য যে গদ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথমটির আরম্ভ এইরূপ—

"দাদা সে-বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কলেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, 'করিতেছ কি! কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ! একজন ভাল ডাক্তার দেখাও'।"

সবটুকু পড়িয়া যে-গল্প হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু তখনই উহা খুঁজিয়া পাইলাম না। বৎসর খানেক পরে 'গল্পগুচ্ছ' হাতে পড়াতে দেখিলাম অনুবাদের জন্য যে জায়গাটা দেওয়া হইয়াছিল, উহা 'দৃষ্টিদান' হইতে।

শুধু ভাষা ও স্টাইলের দিক হইতেও এই গল্পটির বিশেষ মূল্য আছে, এই জন্যই উহা পড়া ও পড়ানো উচিত। 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', ও 'জীবনস্মৃতি'তে বাংলা গদ্য যে সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া দেখা দিয়াছিল, কুড়ি বৎসরের মধ্যেই তাহাতে বিকার দেখা দেয়। ১৯২৭-২৮ সনে আমি 'শনিবারের চিঠি'র দলে। এই কাগজের পক্ষ হইতে নূতন গদ্যের বিরুদ্ধে কলম ধরিলাম। আমার কাছে তখনকার অল্পবয়স্ক লেখকদের ধরণ এরকমই অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল যে, তাঁহাদেরকে আমি অষ্টাবক্র মুনি, হার্লেকিন বা পিয়েরো অর্থাৎ সং আখ্যা দিয়াছিলাম।

এই সৌন্দর্যবর্জিত ত্রিভঙ্গ-মুরারিদের বাংলার সহিত ভাল গদ্যের কি পার্থক্য তাহা বুঝাইবার জন্য একটি প্রবন্ধে আমি খানিকটা ইংরেজী গদ্য ও খানিকটা বাংলা গদ্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইংরেজীটা নিয়াছিলাম হাডসনের 'ফার এওয়ে অ্যাণ্ড লং এগো' হইতে, আর বাংলাটুকু 'দৃষ্টিদান' হইতে। উহার প্রথমটুকু এই প্রবন্ধেও উদ্ধৃত করিতেছি।—

"অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না—কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা ক্ষেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনাঢালা অড়'র এবং সরিষা ক্ষেতের আকাশভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালদের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী চলার শব্দ পর্য্যন্ত—আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল, অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না।"—ইত্যাদি।

আমি প্যারাগ্রাফটির শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সবটুকু এখানে দিলাম

না। 'গল্পগুচ্ছ' হইতে বাকীটুকু পড়িয়া লইতে পাঠককে অনুরোধ করিব।

কিন্তু গদ্য ভাল হইলেই যে গল্পও ভাল হইবে তাহার অর্থ নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই বহু গল্প হইতে এই অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 'দৃষ্টিদান" কিন্তু যেমনই ভাষাতে উৎকৃষ্ট, তেমনই গল্প হিসাবেও। তাহার উপরেও কথা আছে, যাহার জন্য এই গল্পটির বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

'দৃষ্টিদান' রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পের মধ্যে একক; বিষয়েই হউক, বা অনুভবেই হউক, বা আবেগেই হউক, ইহার সহিত এক পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে এমন আর একটিও গল্প নাই। উহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা স্পষ্ট।

তবে তাহা কি? উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইতে পারে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বাঙালী হিন্দুত্বের পরিচায়ক। একটা একেবারে বাজে কথা সর্বত্র শুনিতে পাই। তাহা এই—রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি হিসাবে 'বিশ্বমানব' ও লেখক হিসাবে 'বিশ্বমানবতা'রই প্রচারক। কথাটার অর্থ ইংরেজী ও বাংলা কোনও ভাষাতেই বুঝিতে পারি না। তবে অস্পষ্টভাবে ধোঁয়া-ধোঁয়া যেটুকু বুঝি, তাহাতে অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা বিশিষ্ট বাঙালী ও খাঁটি বাঙালী হিন্দু জন্মায় নাই। তিনি এমনই বাঙালী যে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের অধিবাসীরও তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সত্য কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করার মত কপট ন্যাকামি আর কিছু হইতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী অথবা নেহরু যে তাঁহাকে এই অভিধানে অভিহিত করিতেন, উহাকেই আমি অবাঙালীর রবীন্দ্রনাথকে না বুঝিবার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করি। কাহাকেও না বুঝিয়া রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ভক্তি দেখাইতে গেলে কৃত্রিমতা এড়াইবার উপায় নাই। মহাত্মা গান্ধী ও নেহরু দুইজনেই এই দোষে দোষী।

আসলে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বাঙালী হিন্দু ছিলেন, বাংলী হিন্দু হিসাবেই নিজের কথা পৃথিবীর লোকের কাছে বলিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার ইংরেজী অনুবাদে তাঁহার এই প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় নাই। তাই আজ পাশ্চাত্যে, এমন কি বাংলার বাহিরেও তাঁহার আন্তরিক সমাদর নাই। যে বাঙালী হিন্দুত্ব তাঁহার আসল ধর্ম, 'দৃষ্টিদান' সেই ধর্ম হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। এই উৎসার আবার এত স্বাভাবিক যে, উহা রবীন্দ্রনাথের মন হইতে অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

অবশ্য একথা সত্য যে, একসময়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতসারেই এক ধরনের হিন্দুত্বের

দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। উহা জাতির জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে পর পর মৃত্যুশোকের কাল। তাঁহার পত্নী মৃণালিনী মারা যান ১৯০২ সনের ২৩শে নভেম্বর; তেরো বৎসরের কন্যা রেণুকা বা রাণী মারা যায় ১৯০৩ সনের মে মাসে; প্রিয় শিষ্য সতীশচন্দ্র রায় মারা যান ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সনে; পিতা দেবেন্দ্রনাথ বিগত হন ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে; কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র তেরো বৎসর বয়সে ১৯০৭ সনের নভেম্বর মাসে মারা যায়।

একদিকে বাঙালীর জাতিগত জীবনে রাজনৈতিক সঙ্কট, আর একদিকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের শোক, এই দুই মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে একটা নির্বেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দুর মনে ও ধর্মে অতি প্রাচীন কাল হইতেই একটা নিষ্ঠুর বৈরাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সাংখ্য, বেদান্ত, এমন কি গীতাও এই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বৈরাগ্য নিষ্ঠুর, তাই ইহা হইতে নিষ্কাম কর্মযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কর্মযোগের কথাও রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিয়াছিল।

কিন্তু এই পথ ধরিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্বদেশী আন্দোলন ও শোক দেখা দিবার আগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহাকেও স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ও বিবেকানন্দের কর্মযোগ এ দুইয়ের প্রভাব বাঙালীর উপর অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মত সজীব ব্যক্তির পক্ষে এই প্রভাব সম্বন্ধে অসাড় থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জীবনের অন্য ধারায় অর্থাৎ উদারনৈতিক ব্রাহ্মধারায় বড় হইলেও নব্য হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় তিনি পত্নীবিয়োগের পূর্বেই দিয়াছিলেন। ১৯০১ সনে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব আরও প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিবারের মানসিক ধারা একেবারে ছাড়িয়া যান নাই, এমন কি পরজীবনে আবার সেই ধারাতে নিঃসংশয়ে ফিরিয়া আসেন। এই আসার আগেও তাঁহার মনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের নব্য হিন্দুত্ব ও উদারনৈতিক ব্রাহ্মহিন্দুত্বের মধ্যে একটা বিরোধ চলিতেছিল। 'গোরা' এই মানসিক দ্বন্দ্বেরই কাহিনী। এই উপন্যাসটি ১৯০৭ সন হইতে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। উহাতে একদিকে আছে নব্য বাঙালীর ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্ব, অন্যদিকে আছে সেই নব্য বাঙালীরই জাতি, বর্ণ ও আচারে আস্থাবর্জিত ব্রাহ্ম হিন্দুত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত যোগ এই দ্বিতীয় ধারার সহিত, তাই

'গোরা'-তে উহারই জয় দেখানো হইয়াছিল।

কিন্তু যে-হিন্দুত্ব রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে দেখাইয়াছিলেন, উহা বিচারবুদ্ধির হিন্দুত্ব। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি এই হিন্দুত্ব হইতে আসে নাই। উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৯৮ সনের শেষের দিকে। তখনও রবীন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুত্বের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করিবার পরিচয় দেন নাই। সুতরাং গল্পটি আসিয়াছিল বাঙালীর প্রাচীন হিন্দুত্বের আরও গভীর, অতিশয় অন্তর্নিহিত উৎস হইতে। সেই হিন্দুত্ব আমাদের অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে, ধমনীতে প্রবহমান। যতদিন বাঙালীর কোন সত্যকার ধর্ম থাকিবে, যতদিন সে পদার্থে খাঁটি থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত সে অন্তঃসারশূন্য ট্যাঁশফিরিঙ্গি বনিয়া সব কূল না হারাইবে, ততদিন তাহার এই হিন্দুত্ব বজায় থাকিবে, দেখিতে না পাইলেও উহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিবে। ইহা হইতে বিচ্যুত হইবার ক্ষমতা সব ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবার আগে আমাদের হইবে না। আমি যে এই পঁচিশ বৎসর বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজ ছাড়া, এবং শুধু বাঙালীর নয়, প্রায় সমস্ত ভারতবাসীরই সম্পর্কবর্জিত, আমার মধ্যেও উহা রহিয়াছে। 'দৃষ্টিদানে' এই গভীর হিন্দুত্ব, প্রাণের হিন্দুত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। 'দৃষ্টিদানে'র এই হিন্দুত্বে নিষ্ঠুরতা বা কাঠিন্য নাই—এই হিন্দুত্বে আছে শুধু অপার স্নেহ, অপার করুণা, অপার শান্তি ও আনন্দ। উহা আগমনীর সুখ ও নবমীনিশির বিষাদের মত—বাংলার শিশিরে স্নাত, বাংলার ঊষা ও সন্ধ্যার বিভায় বিভাসিত, বর্ণে উজ্জ্বল, বৃষ্টি ও রৌদ্রে ঝলমল। আজ সেই হিন্দুত্ব গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে, উহা নির্মম সত্য। কিন্তু সেই জীবনের কথা স্মরণ করিলে, উহার অনিবার্য নির্বাণের কথাও ভাবিলে মনে যন্ত্রণা হয় না, শুধু একটা সীমাহীন বিষাদের আচ্ছন্নতা আসে। কুমু! আজ তুমি তাই আমার চোখের সম্মুখে নির্বাসিতা সীতার মত দেখা দিতেছ —

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥"—

"অতিশয় পাণ্ডু ও দুর্বল কপোলের জন্য আরও সুন্দর হইয়া, বিলোলকবরী মুখখানা লইয়া, করুণার মূর্তি অথবা শরীরধারিণী বিরহব্যথার মত জানকী

বনে আসিতেছেন।"

সংস্কৃত শ্লোকটা জোরে পড়িবেন, আমার বাংলা অনুবাদ মাত্র দেখিয়া উহার কবিত্ব বিচার করিবেন না।

'দৃষ্টিদান' গল্পের হিন্দুত্ব শুধু নায়িকার ভাব ও ব্যবহারেই নয়, তাহার সমস্ত বিবরণের ভাষায়, এবং তাহার উপরে শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনাতেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই লক্ষণটা সমগ্র কাহিনীটা জুড়িয়া মন্দিরে ধূপ ও ফুলের গন্ধের মত পরিব্যাপ্ত। প্রথমে দুইটা স্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দিব।

সতীত্বের অহঙ্কার হিন্দু মেয়ের বিশিষ্ট চরিত্রধর্ম। স্বামীর অবহেলা, এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা দেখিলেও তাহারা সতীত্বের অহঙ্কারে বলিত যে, তাহাকে সতী স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া আসিতে হইবেই। তাই ভ্রমর বলিয়াছিল—

"যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায়-আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি —আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে, আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ-কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী!"

এই ধরনের উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার মুখে স্বাভাবিক হইলেও রবীন্দ্রনাথের কোন নায়িকার কাছ হইতে আশা করি না; অথচ দেখি, স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, তখন কুমু বলিল,—

"যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্ব্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিবে না।"

যে রবীন্দ্রনাথ কুমুর মুখে এই উক্তি দিয়াছিলেন, তিনি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের লেখক নন।

'দৃষ্টিদান' গল্পের হিন্দুত্বের আর একটি প্রমাণ সত্যরক্ষা সম্বন্ধে মনোভাব। যে সত্যরক্ষার জন্য দশরথ রামকে বনে পাঠাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই সত্য সম্বন্ধেও কুমুরও অবিচল নিষ্ঠা। স্বামী বিবাহ করিবার জন্য জলপথে চলিয়াছেন, কাল-বৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতেছে, কুমু ঠাকুরঘরে বসিয়া স্বামীকে মহাপাতক হইতে বাঁচাইবার জন্য পূজা করিতেছে। তবু—

"আমি বলিলাম না যে, 'হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন

তাঁহাকে রক্ষা কর'। আমি একান্ত মনে বলিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত কর'।"

শুধু ইহাতেই নয়, গল্পটার হিন্দুত্ব সমস্ত উক্তিতে, ভাষায় ভঙ্গীতে ও শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা আগেও বলিয়াছি। একেবারে প্রথম ছত্র হইতেই উহার সূত্রপাত দেখিতে পাই। কুমু বলিতেছে—

"শুনিয়াছি আজকাল অনেক বাঙালীর মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি, কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।"

ইউরোপীয় সঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, এই কথাগুলি যে ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা সিম্‌ফনীর প্রথমে কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনির সহায়তায় 'টোন্যালিটি' প্রতিষ্ঠিত করিবার মত। ইহার দ্বারা স্বরের ধর্ম সূচিত হয়। তেমনই কুমুর প্রথম কয়েকটি কথা দিয়াই গল্পটার বিশিষ্ট ধর্মের, সোজা কথায় হিন্দুত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

তার পর ক্রমাগতই গল্পটাতে হ্বাগনারের 'লাইট-মোটিফে'র মত এই ধরনের কথা পাই। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। "পূর্ব্বজন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুই চক্ষু লইলেন।"

২। "ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না, তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না।"

৩। "যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল, তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম।"

৪। "ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

৫। "সেই সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিবপূজার কথা মনে পড়িল।"

৬। "পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।"

৭। "সংহারকারী শঙ্কর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড় করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম।"

৮। "তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী ; কি জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম !"

উপমা ও শব্দচিত্রের সহায়তায় রচনাবিশেষের ভাবব্যঞ্জনা যে স্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষাও ভাল করিয়া করা যায়, তাহার পরিচয় সাহিত্যের অধ্যাপকের ক্যারোলাইন স্পার্জনের 'ইনেজারী অফ শেকস্‌পীয়ার্স ট্র্যাজেডিজ' প্রবন্ধে পাইয়াছেন। আমি উহারই অনুকরণে 'দৃষ্টিদান' গল্পের সুরটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু 'দৃষ্টিদানে'র হিন্দুত্ব শুধু হিন্দুত্ব নয়, উহা বাংলার পল্লীজীবনের হিন্দুত্ব। তাই গ্রামের জীবন গল্পটির কাঠামো, গ্রাম্য কথাবার্তা উহার প্রাণ। বাংলা দেশের পল্লীবাসিনীর মনের সহিত প্রাণের যোগ না থাকিলে রবীন্দ্রনাথ দুইটি অল্পবয়স্কা মেয়ের মুখ হইতে এক ধরনের কথা শুনাইতে পারিতেন না। একটি মেয়ের বয়স চোদ্দ-পনেরো, অপরটির উনিশ-কুড়ি। ছোট মেয়েটি কুমারী। সে জিজ্ঞাসা করিল—

হেমাঙ্গিনী।—"তোমার ছেলেপুলে নাই কেন ?"

কুমু।—"কেন তাহা কি করিয়া জানিব—ঈশ্বর দেন নাই।"

হে।—"অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।"

কু।—"তাহাও অন্তর্যামী জানেন।"

হে।—"দেখ না, কাকীর ভিতরে এত কুটিলতা যে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।"

এই কথাগুলি "লুপ"-প্রচারিণী বা "লুপ"-ধারিণীর উক্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই সরল বাঙালীত্ব কি সকল আধুনিকতার উপরে নয় ? রবীন্দ্রনাথের মিথ্যা ও কৃত্রিম বিশ্বমানবতার কচ্‌কচির পাশে উহা শিশিরস্নাত ফুলের মত উজ্জ্বল। 'বিশ্বমানবতা' চুলায় যাক, আমরা বাঙালীত্ব ফিরিয়া পাইয়া মানুষ হই।

এই হিন্দুত্বের প্রয়োজন ছিল। 'দৃষ্টিদান' গল্পের ভালবাসা আসলে বিদেশী অর্থাৎ ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেম। উহাকে বাঙালী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে দেশী ছাঁচে ঢালিতে হইবে, একথা আমি আগেই বলিয়াছি। 'দৃষ্টিদানে' রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় অতি নিবিড়ভাবে করিয়াছেন।

স্বামীর প্রতি কুমুর যে মনোভাব, তাহা একদিক হইতে দেখিলে বিশুদ্ধ হিন্দু পাতিব্রত্য, আর একদিক হইতে দেখিলে বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম। কুমু যে হিন্দু-অর্থে সতী, পতিব্রতা. সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এতটুকু সন্দেহ রাখেন নাই। স্বামী গোয়াতুর্মি করিয়া নিজে চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহার চক্ষু দুটি নষ্ট করিতে বসিয়াছে। তাহার দাদা উহা দেখিয়া অন্য ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্বামী ও দাদার মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত দেখিয়া কুমু নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া দাদাকে কিছু না করিতে বলিল। আবার স্বামীর ভুলে চক্ষু যাইবার পরও তাহাকে দাদার ভর্ৎসনা হইতে বাঁচাইবার জন্য দাদাকে বলিল যে, তাহার দেওয়া খাইবার ওষুধ ভুলে চোখে দেওয়াতে তাহার অনিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কুমুর নিজের উক্তি এই—

> "স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিয়া এত মিথ্যাও বলিতে হয়। দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর মনও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকেও ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকেও ভুলাইতে হয়, মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।"

আর স্বামীকে সে বলিল,

> "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি যদি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কি সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না—সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে, এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ।"

ইহার পরে যখন এক বাল্যসখী আসিয়া তাহাকে বলিল, "তোর রাগ হয় না কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না", তখন সে উত্তর দিল, "ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন?"

ইহা আমাদের পুরাতন পাতিব্রত্যের সুর। কুমুর মত বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া বাল্যসখী লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। এই পাতিব্রত্যের জন্যই যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত, দুঃখিত, দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন সে সতীত্বের শান্তি ও ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত।

এই পাতিব্রত্যের জন্যই আবার অন্ধ হইবার পর স্বামীর ভালবাসার উপর অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে তাহার মনে সন্দেহ জাগিত। এই সন্দেহেই সে স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে বলিল। স্বামী তাহার উত্তরে বলিলেন, "নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এই কথা শুনিয়া কুমু বিপুল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মনে করিল, "আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মত আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন।" কিন্তু এই আনন্দের জন্য ও এই আনন্দের বশে স্বামীকে এত বড় শপথ করিতে বাধা না দিবার জন্য কুমু নিজেকে স্বার্থপর মনে করিল।

ইহার পরও তাহার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। একদিকে স্বামী আর কোনমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না এই আনন্দ, আর একদিকে এই ধারণা যে শপথ পালন না করিয়া বিবাহ করিলেই স্বামীর মঙ্গল হইবে। এই দ্বন্দ্বে সে তাহার নিজের যে দিকটাকে দেবী বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই দেবীর একটা নিরুত্তর ভ্রূকুটি দেখিল, ও একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার অন্ধকারে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এ সবই পাতিব্রত্যের কথা।

তবে কুমুর হৃদয়ে প্রেমের, রোমান্টিক ভালবাসার পরিচয় কোথায়? গল্পটা জুড়িয়াই সেটা রহিয়াছে। প্রথমে এইটুকু বলিব, এই ভালবাসার প্রমাণ তাহার দেহানুভূতিতে। দেহোত্তর প্রেম বলিয়া কোন জিনিস নাই। লোকোত্তর হওয়া আর দেহোত্তর হওয়া এক কথা নয়, কারণ দেহও লোকোত্তর হইতে পারে। নরনারীর আকর্ষণে দেহ যেমন জৈব কামের অবলম্বন হইতে পারে, তেমনই লোকোত্তর মানসিক অনুভূতির ব্যাপারও হইতে পারে। দেহের প্রতি দুই আকর্ষণের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে জড়পদার্থের দুই অবস্থার উপমাদিতে হয়। গ্রহ জড়পদার্থ, কিন্তু দাহ্যমান নয়; কিন্তু সূর্য বা তারা সেই জড়পদার্থই, তবুও দাহ্যমান। তেমনই কামের আকর্ষণের বেলাতে দেহ ভৌতিক বস্তু মাত্র, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে উহা ভৌতিক থাকিলেও বিভাময় জ্যোতিষ্কে পরিণত হইয়া যায়।

দেহই প্রেমের অবলম্বন, সেজন্য প্রেম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিসাপেক্ষ। না দেখিয়া, না শুনিয়া, না স্পর্শ করিয়া ভালবাসা যায় না। কবি যে লিখিয়াছেন—

জন্ম অবধি দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হইল না, লক্ষ লক্ষ যুগ বুকে রাখিয়াও বুক জুড়াইল না, ইহা প্রেমের গভীরতম সত্য। দৃষ্টি ছাড়া স্পর্শও যে ভালবাসার কত বড় অবলম্বন তাহা ভবভূতির মত আর কেহ এত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, অন্ততপক্ষে এত স্পষ্ট করিয়া কেহ বলে নাই।

সীতা রামকে অবলম্বন করিয়া শুইবামাত্র রাম বলিলেন, "প্রিয়ে কিমেতৎ।"

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষ-বিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ ॥"

—"প্রিয়া, একি! এ সুখ না দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না—এ কি মূর্ছা না নিদ্রা, বিষের আচ্ছন্নতা না আনন্দ? তোমার স্পর্শে স্পর্শে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তোমার স্পর্শ আমাকে বিকলচৈতন্য করিয়া একবার ভ্রান্ত ও একবার অবশ করিয়া ফেলে!"

তাই পঞ্চবটীবনে রামের মুহ্যমান হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া ভগবতী পৃথিবী ও ভাগীরথী তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য 'মৌলিক এব',—একেবারে মূলগত উপায়ের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে সীতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে সীতা রামকে স্পর্শ করিয়া আবার সচেতন করিতে পারেন। অদৃশ্য সীতার স্পর্শে রাম জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"স্পর্শঃ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এব
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ পরিহৃত মূর্চ্ছা
মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি ॥"

—"এই সেই পুরাতন পরিচিত স্পর্শ, যাহা আমার মনকে যেমন জাগায় তেমনই মুহ্যমানও করে, যাহা এখনই আমার শোকজনিত মূর্চ্ছা তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া দিয়া আবার শুধু আনন্দের জন্যই জড়তা আনিয়া দিল।"

কুমুর ভালবাসাও তেমনই স্বামীকে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র থাকিত। যখন দৃষ্টি ছিল তখন "স্বামী যখন কলেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকে জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম।" কিন্তু দৃষ্টি যাইবার পর তাহার "দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে

চেষ্টা করে।" কুমু বলিতেছে,—

"এখন তাঁহার ও আমার মাঝখানে একটা দুরন্ত অন্ধতা ;—এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়—কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।"

এই অন্ধতাই চরম সুখ। আমার বিশ্বাস—জগতের প্রতি, সংসারের প্রতি, অন্ধ না হইয়া ভালবাসা যায় না। বুঝিবা এই অন্ধতা দৈহিক হইলে ভালবাসার ক্ষমতা আরও বাড়ে। অন্ধ কুমুর ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া অন্ধ রজনীর উন্মত্ত ভালবাসার কথা সহজেই মনে পড়ে।—"ডাক্তারির কপালে আগুন জেলে দিই। সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম।"

কুমুর ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণ, স্বামীকে বিচার করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা। পাতিব্রত্য স্বামীকে বিচার করে না, কিন্তু ভালবাসা প্রণয়ীকে বিচার করে, প্রণয়ী স্বামী হইলেও করে। ভালবাসা বড় কঠিন বিচারক, কিন্তু স্বার্থবোধ হইতে বিচারক হয় না, হয় পরার্থপরতা হইতে। ভালবাসিলে ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীর বহু দুর্বলতা, বহু অপরাধ, এমন কি সাময়িক প্রবঞ্চনাও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু ভালবাসা ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীর নীচতা, ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা ক্ষমা করিতে পারে না।

ইহার সঙ্গত কারণ আছে। ভালবাসা নিজেকে দিবার, আত্মবিসর্জনের ব্যাকুল আগ্রহ, পরের কাছ হইতে কিছু আদায় করিবার ইচ্ছা নয়। ইহার মধ্যে স্বার্থপরতা মাত্র এইটুকু থাকে যে, আত্মসমর্পণ কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে কষ্ট হয় ; ইহার বেশী কিছু নয়। কিন্তু উহা ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীর অনুদারতা সহ্য করিতে পারে না, এতটুকু অনুদারতা দেখিলেই নিজের মধ্যে নিজেকে টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে চায়। সংসারের পাপ ও আবিলতা দেখিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের যে অবস্থা হয়, ভালবাসারও সেই অবস্থাই হয়,—

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

তবে কূর্মত্ব-প্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞের মানসিক জীবনে শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রেমে—ভালবাসিয়া কূর্মত্বে শমগুণযুক্ত হওয়ার মধ্যে কোনও সান্ত্বনা নাই। ভালবাসিয়া সাংসারিক ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর প্রণয়ী বা

প্রণয়িনীর নীচতা দেখিলে মৃত্যুভয়ের অপেক্ষাও বড় ভয় দেখা দেয়।

আমি জানি বহু নরনারীর বিবাহিত জীবনে কিছুদিনের মধ্যে এই দুঃখ আসে। ইহার যন্ত্রণা, যন্ত্রণাবোধ থাকিলে, প্রিয় বা প্রিয়াকে হারাইবার অপেক্ষাও নিদারুণ। আমি আমার পরিচিত ব্যক্তি বন্ধু বা আত্মীয়ের মধ্যে অনেককেই স্ত্রীর নীচতার সংস্পর্শে নীচ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। এইভাবে নীচ হইয়া পুরুষ স্ত্রীর নীচতা অনুভব করার বেদনা হইতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আমি স্বামীর নীচতায় স্ত্রীকে নীচ হইতে প্রায় দেখি নাই বলিলেই চলে। জানি না কোথা হইতে নারীর এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবার ক্ষমতা আসে, কিন্তু উহা যে আসে, তাহা দেখিয়াছি। তাই স্বামীর চরিত্রে নীচতা দেখিলে স্ত্রীর কষ্ট অনেক বেশী হয়। কুমুর এই যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল।

ডাক্তারিতে পসার হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীর চরিত্রে একটা বিষয়াসক্তি ও অর্থপরায়ণতা দেখা দিল। তিনি দরিদ্রকে চিকিৎসা করিতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। এমন কি উহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেও আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া কুমুর মনে যে কষ্ট হইল তাহা পরে স্বামীর হেমাঙ্গিনীর প্রতি আসক্তি ও নিজের প্রতি বিশ্বাসহীনতা দেখিয়াও হয় নাই। সে ভাবিত, অন্ধ হইবার পূর্বে সে যাহাকে শেষবার দেখিয়াছিল, তাহার সে স্বামী কোথায়—

> "একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে দিনে দিনে, পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনও রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।"

ইহা কি পূর্বরাগের প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, যাহারা বিবাহের বন্ধনে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে, তাহাদের অনেকেরই অপ্রকাশিত শোক নয়? এই শোকে কুমু নিজের অন্ধতার শোকও আর অনুভব করিতে পারে নাই। স্বামীর সঙ্গে যে চোখে-দেখার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেটা তাহার কাছে কিছুই নয়, তাহার আসল দুঃখ অন্য—

> "আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে

শেফালিকার অর্ঘ্য দান করিয়াছিলাম, তাদের শিশির এখনও শুকায় নাই,—আর আমার স্বামী—এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসার-মরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন।"

কুমু ইহা কেন হইল বুঝিতে পারে নাই। তাই বলিয়াছিল,

"প্রথম বয়সে আমরা একপথেই যাত্রা করিয়াছিলাম,—তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল, তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই, অবশেষে আজ আমি তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই নাই।"

শুধু পতিব্রতা হইলে কুমুর মনে এত কষ্ট হইত না। কিন্তু প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই এই কষ্টে নির্জন অন্ধকার কক্ষে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া তাহার অন্ধ জগতের জগদীশ্বরকে ডাকিয়া যাহা বলিয়াছিল উহা আবার উদ্ধৃত করিব,—

"প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্নহৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে, দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি, বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না, আমায় আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই বা বল!"

এই যন্ত্রণা যাহার ভালবাসা নাই, সে অনুভব করে না।

এইবার আর একটা সংঘাতের কথা বলিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে পাওয়া ভালবাসা ও পাশ্চাত্ত্য জগতের মারফৎ পুনরাবিষ্কৃত সতীত্বের ধারণা, এই দুইটির সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গীভাব দেখা না দিলেও মোটামুটি দুইটি সমান্তরাল খাতে পাশাপাশি বহিয়াছিল; উপমা বদলাইয়া বলিতে পারি, দুইটি সুর সঙ্গীতে 'কাউন্টারপয়েন্টে'র মত বাজিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে পাওয়া ভালবাসার সহিত সেই ইউরোপ হইতেই পাওয়া আর একটা জিনিসের সামঞ্জস্য কখনই হয় নাই। সে জিনিসটা দেশপ্রেম। প্রথম হইতেই দেশপ্রেমের সহিত নারীপ্রেমের বিরোধ বাধিল।

এ বিরোধটার রূপ একটু বিচিত্র। প্রেমের সন্ধান আমরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন হইতে গৌণভাবে পাইলেও উহাকে ইংরেজের কাছে পরাধীনতার গ্লানির সহিত কখনও যুক্ত করি নাই। ইহার কারণ, ইংরেজ বাঁ হাত দিয়াও এই ভালবাসা আমাদিগকে দেয় নাই, আমরা ইংরেজ জীবন হইতে, ইংরেজের

মানসিক রত্নভাণ্ডার লুট করিয়া কোহিনূরের মত উহাকে আমাদের ঘরে আনিয়াছিলাম। সেই ভালবাসাকে আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বাধিকারে নিজের করিয়া লইয়াছিলাম। এই কারণে স্থানীয় ইংরেজের হাতে অপমানিত হইলেও সেই অপমান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইংরেজী সাহিত্য হইতে পাওয়া ভালবাসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমরা ইতস্তত করি নাই। শুধু বিদেশী শাসক কেন, সমাজই নিষ্ঠুর, সংসারই নিষ্ঠুর, উহার পীড়ন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় ভালবাসা, তাহা আমরা ইংরেজী সাহিত্য হইতেই শিখিয়াছিলাম,—

"Ah, love, let us be true.
To one another ! for the world, which seems,
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain…"

রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি প্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় এই কাঠামোর মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল। গল্পটা ছিল এইরূপ—একটি বাঙালী কেরানী আপিসে সাহেবের দ্বারা অপমানিত হইয়া বাড়ীতে আসিয়া পত্নীর ভালবাসায় সেই গ্লানি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত ইহাতে আপত্তি করেন। এই মতবৈষম্যের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে ১৩০২ সনের ৬ই চৈত্র তারিখের একটি চিঠিতে দিয়াছিলেন। উহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"প্রেমের অভিষেক কবিতাটি 'চিত্রা' কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা চলে না—কারণ ইহাই উহার আদিম রূপ। 'সাধনা'য় যখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তখন কাহারও কাহারও মনে এত আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার জো হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন, কোনও আপিসবিশেষের কেরানীবিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে, আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশী সরল, উজ্জ্বল, উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখানো হয়—সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমানক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানীর মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিক-মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়—উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ব্ববিস্মৃত কবিত্বরসটি থাকে না—মনে হয়, সে

মুখে যতই বড়াই করুক না কেন আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এ সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যে ভাবে লিখিয়াছিলাম সেই ভাবে প্রকাশ করিয়াছি।"

কিন্তু আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। লোকেন পালিত বাঙালী সাহেব ছিলেন। তাঁহার মত বাঙালীরা দেহে সাহেব না হইলেও নিজেদের জন্য একটা বিলাতী সমাজ তৈরী করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারা নিজেদের ইংরেজী পোশাক, ইংরেজী আসবাবপত্র, ইংরেজী খানা ও ইংরেজী ধ্যানধারণা লইয়া জীবন কাটাইতেন। স্থানীয় ইংরেজের দম্ভ বা অভদ্রতা যেমন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, তেমনই স্থানীয় বাঙালীত্বও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহাদের কাছে সাধারণ বাঙালী জীবনের একটা সমস্যা কখনই দেখা দেয় নাই। সেটা এই—কি করিয়া জীবিকার জন্য ইংরেজের অধীন হইয়াও ইংরেজের অভদ্রতা ও অবজ্ঞা গায়ে না মাখিয়া অপমান-বোধের তামসিকতা হইতে মানসজগতে মুক্ত থাকা যায়। বহু বাঙালীই ইহার সমাধান করিতে পারিয়াছিল। বিলাত-ফেরত বাঙালীর কাছে সেটার খবর পৌঁছে নাই।

এই বাঙালীরা চাকুরিজীবনের গ্লানিকে ব্যক্তিগত জীবনের মহিমা দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা বড়াই করিয়া অশিক্ষিত সওদাগরী ইংরেজকে বলিতে পারিত, "আমরা দান্তের 'ভিতা নুয়োভা' পড়ি, বেয়াত্রিচের খবর রাখি। ভারতবর্ষে তোমাদের সভ্যতার বাহক ও প্রচারক তোমরা নও, আমরা।" তাই ইংরেজের অসভ্যতা তাহাদের গায়ে সাময়িক ভিন্ন স্থায়ী কোনও জ্বালা ধরাইত না। পরযুগে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই মনোভাবের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি শিখাইয়াছিলেন, ইংরেজের লাঠি খাইয়াও নিজেকে নিজের মনে ক্ষয় না মানিয়া মাথা উঁচু করিয়া থাকা যায়।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির 'সাধনা'য় প্রকাশিত রূপ যদি রবীন্দ্রনাথ বজায় রাখিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাকে সে-যুগের বাঙালীর সাংসারিক জীবনের কাঠামোর সহিত যুক্ত দেখিতাম। আমরা একদিকে ইংরেজ শাসনের ফলে বাঙালী জীবনের একটা পীড়াদায়ক বাহ্যিক দ্বিত্বের পরিচয় পাইতাম, অন্যদিক হইতে দেখিতাম যে, এই দ্বিত্ব বাঙালীর নূতন জীবনে পূর্ণতার অনুভূতির পথেও বাধা জন্মায় নাই। পরাধীনতার কষ্টের সহিত প্রেমের উচ্চতম গৌরব কি করিয়া একত্রে থাকিতে পারে তাহা আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিত।

কিন্তু আর একটা সংঘর্ষ মহান হইলেও রহিয়াই গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরাধীনতার খারাপ দিকটার সহিত প্রেমের বিরোধ না ঘটিলেও ভাল দিকটার সহিত সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। বাঙালীর কাছে নারীর প্রেমও নূতন, দেশপ্রেমও নূতন। এই দুইটিকে এক করিবার কোনও উপায়ই সে পাইল না। বিবাহ না করিয়া দেশসেবা করিতে হইবে ইহা প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক বাঙালী যুবকের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল।

রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পটি এই সংঘাতের গল্প। উহার নায়ক নাজির-সেরেস্তাদার হইবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিল, কিন্তু মাৎসিনি-গারিবাল্‌দি হইবার প্রয়াসে লাগিয়া গেল। আঠারো বৎসর বয়সে তাহার সহিত বাল্যসখী সুরবালার বিবাহের প্রস্তাব আসিল, কিন্তু সে তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিবে, তাই প্রস্তাবকে সে অগ্রাহ্য করিল। পরে যখন সুরবালার অন্যত্র বিবাহের খবর আসিল তখন সে পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়-কার্যে ব্যাপৃত থাকাতে সেটাকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করিল। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কথা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। একটি রাত্রিতে সুরবালার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইয়াছিল, সে যে সেরেস্তাদারও হয় নাই, গারিবাল্‌দিও হয় নাই, উহাতে তাহার ক্ষোভ নাই। দেশ ও নারীর মধ্যে এই নিরর্থক দ্বন্দ্বে যে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল, উহার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মনে সম্পূর্ণ আসিয়াছিল। 'গোরা' এই দ্বন্দ্বেরই আরও বড় কাহিনী। উপন্যাসটির এই দিক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি উহার প্রচেষ্টা করিব।

'গোরা' বইখানা উপন্যাসই নয়, পুরাদস্তুর সোশ্যোলজি, একথা অবশ্য কেহ বলে না; তবু বাঙালী সমালোচক ও পাঠক উহাকে লৌকিক উপন্যাস না বলিয়া তুরীয়লোকের উপন্যাস বলিয়া মনে করে। ললিতা সম্বন্ধে বিনয়ের একদিন যে নূতন উপলব্ধি আসিয়াছিল, 'গোরা' সম্বন্ধে বাঙালীর এখনও সেটা আসে নাই। সেদিন ললিতা বিনয়ের দিকে কটাক্ষপাত মাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ললিতার এই চাপা আগুনের মত ভাব বিনয় অনেকদিন দেখে নাই। সে কি ভুল করিয়াছিল একটু পরে সেটা বুঝিতে পারিল। ললিতা যে সমাজের কাছে অপমানিত হইতেছে, অথচ বিনয় সেই অবমাননা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া "কেবল সমাজতত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্ম তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে ললিতার মত তেজস্বিনী রমণীর কাছে সে যে অবজ্ঞাভাজন হইবে তাহা বিনয়ের কাছে সমুচিত বলিয়াই বোধ হইল।"

কাহারও অবজ্ঞাভাজন না হওয়াতে বাঙালী এখনও গোরা লইয়া সমাজতত্ত্বের সূক্ষ্ম তর্কই করিতেছে।

অপরপক্ষে যে কারণে বাঙালী পাঠকের মনে 'গোরা' সম্বন্ধে এই দণ্ডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবার প্রেরণা আসে, ঠিক সেই কারণেই বইটার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর সেটাকে উপন্যাস হিসাবে গ্রাহ্য করিতে ইংরেজ সমালোচকের অসুবিধা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, সমালোচনাটা 'টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে' পড়ি। প্রথম দেখাতেই ধর্ম, সমাজ, জাতিভেদ ইত্যাদি লইয়া ভদ্রসমাজে তর্ক, এমন কি ঝগড়া বাধিয়া উঠিতে পারে কিনা এই বিষয়ে ইংরেজ সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বীকার করিতেই হইবে, প্রথম দিন পরেশবাবুর বাড়ী গিয়াই গোরা যেভাবে হারাণবাবুর সহিত তর্ক জুড়িয়া দিল তাহা শোভন নয়। বরদাসুন্দরী 'জাতি মানেন কিনা' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর গোরা যে উত্তর দিল,—"জাত কি আমার নিজের তৈরী যে মানব না?" উহা আরও অশোভন।

তবু ইংরেজ সমালোচক ভুল করিয়াছিলেন। ইংরেজদের মধ্যে সামাজিক জীবনে যে-সব আলোচনা হয় না, তাহা বাঙালীদের মধ্যে হয় তাহা তো প্রতিদিনই দেখি। আমাদের একটা কচ্‌কচিপ্রিয়তা আছে, উহা আমাদের ইয়ার্কির ওপিঠ। কোনটাই খুব বৈদগ্ধ্যপূর্ণ নয়, কিন্তু কোনটাই অস্বাভাবিকও নয়। গোরা উপন্যাস যে-সময়কার সেই যুগে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় আলোচনা বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই আলোচনার বিষয়বস্তুই কি 'গোরা' উপন্যাসেরও প্রধান বিষয়বস্তু? যে জিনিসটা বিচার করিতে হইবে তাহা এই—ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এত আলোচনা সত্ত্বেও বইটা উপন্যাসে দাঁড়াইয়াছে কিনা—অর্থাৎ উহাতে নরনারীর প্রেমই মুখ্য বস্তু কিনা।

বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কতকগুলি বই বাঙালীর সমসাময়িক জীবনের সহিত জড়িত। এই উপন্যাসগুলি সব সময়ে লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। কিন্তু যুগধর্মের সহিত বিশেষ একটা আশ্লেষের ফলে সকলেরই মনে একটা সাড়া জাগাইয়াছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা বলিতে পারি। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয় তবু উহা তখনকার বাঙালী সমাজে একটা বিশেষ আলোচনার বস্তু হইয়াছিল। তাই ১৮৭৩ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"This novel…was to be found in the baitakhana of every

Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors, while the others were all historical, 'men and as they are, and life as it is,' is the motto of the present one."

'গোরা' সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। উহাতে যেসব সমস্যা তোলা হইয়াছে তাহা যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখনকার নয়, তাহার অন্তত ত্রিশ বৎসর আগের। কিন্তু ১৯০৭ সনে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার পর হইতে বই আকারে ১৯১০ সনে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সেই প্রশ্নগুলি সজীব ছিল। সুতরাং বইটার আলোচনা জীবনের সহিত জড়িত থাকিত, শুধু সাহিত্য বিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই।

আমি ১৯০৭ সনে পূজোর সময়ে বনগ্রামে সেই মাসের 'প্রবাসী' আসার পর গোরা সম্বন্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আলোচনা শুনিয়াছিলাম তাহা এখনও মনে আছে। তখন আমার বয়স দশ পূর্ণ হয় নাই। আমি নিজে বইটা পড়ি ১৯১০ সনে, বারো বৎসর বয়সে। তখনও আমাকে উপন্যাস পড়িবার জন্য মাতা 'লাইন ক্লীয়ার' দেন নাই, উহার দুই বৎসর পরে লুকাইয়া মশারির পিছনে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতেছি দেখিয়া হাসিয়া অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং 'গোরা' অবশ্য লুকাইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার এক মামা কলিকাতায় আমাদের সার্পেণ্টাইন লেনের বাসায় থাকিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন নায়কের মত ছিলেন, অর্থাৎ প্রচুর সাহিত্যালোচনা করিতেন, কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় ফেল হইতেন। তবে তাঁহার সাহিত্যিক রুচি বা জ্ঞানের অভাব কখনও দেখি নাই। বাংলা সাহিত্যের সব উল্লেখযোগ্য বই তাঁহার একটা বাস্কেটে ছিল। তিনি কলেজে গেলে আমি বাহির করিয়া পড়িতাম।

একদিন বিকালে জানালার আলিসার উপর চড়িয়া 'গোরা' পড়িতেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মামা আসিয়া পড়িলেন। আমি চট্ করিয়া বইটার উপর বসিয়া পড়িলাম। তারপর তিনি হাতমুখ ধুইতে যেই গেলেন তখনই আবার বাক্সে পুরিয়া রাখিলাম।*

কিন্তু বইটা বুঝিতে আমার কোনও কষ্ট হয় নাই। 'গোরা'তে যে ধরণের

* সেই জানালা ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা গিয়া আবার আটান্ন বৎসর পরে দেখিয়া আসিয়াছি।

আলোচনা আছে উহা শৈশব হইতে শুনিয়া অভ্যস্ত ছিলাম। কাঁচাভাবে সমপাঠীদের সঙ্গে আমিও এইসব প্রশ্নের আলোচনা করিতাম। তাই গুরুজনদের মধ্যে আলোচনাও কান পাতিয়া শুনিতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় খাওয়ার পর বাবা, মা এবং মামার মধ্যে কথা উঠিল যে, ললিতার যা বয়স তাহাতে সে এত পাকা কথা বলিতে পারে কিনা।

মনে রাখিতে হইবে ললিতার বয়সের হিসাব বর্তমান সংস্করণের বয়স দিয়া করিলে হইবে না। গোড়ার দিকে যেখানে সুচরিতার বয়সের উল্লেখ আছে তাহাতে এখন পাই—"গাড়ী হইতে সতেরো-আঠারো বৎসরের একটি মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে।" উহা প্রথম সংস্করণে ছিল (যতদূর মনে পড়ে) চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, অর্থাৎ তিন বৎসরের তফাৎ। সে-বয়সে তিন বৎসরের তফাৎ অনেক তফাৎ।

তাই সুচরিতার বয়স দিয়া—লাবণ্য সুচরিতার অল্প ছোট ও ললিতা তাহার পর, এই হিসাব করিয়া মা ললিতার বয়স বড় জোর বারো-তেরো ধরিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ললিতার কথাবার্তা সম্বন্ধে প্রশ্নটাও তুলিয়াছিলেন। আমার মামা উত্তর দিয়াছিলেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানসিক পরিণতি আগেও হইতে পারে, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজে। কিন্তু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ পরে এত কম বয়স রাখা সঙ্গত মনে করেন নাই। প্রথমে উপন্যাসের ঘটনাকালের কথা মনে রাখিয়া তিনি বয়সটাকে কমই করিয়াছিলেন।

কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাকাল কি? এ প্রশ্নটা বিচার করিবার প্রয়োজন আছে।

নিজের রচিত উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও তারিখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটু বেহিসাবী ছিলেন। 'নৌকাডুবি'-তে সময়ের হিসাবের একটা গুরুতর ভুল আছে। 'গোরা'তেও ব্যাপারটা গোলমেলে। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' লেখেন পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে, কিন্তু 'গোরা'র সমস্ত ব্যাপার—ঘটনা ও চিন্তা-ভাবনা তাঁহার যৌবনকালের, অর্থাৎ ১৮৮০ সনের কাছাকাছি সময়ের। ইহার আগেকার নয়, কিন্তু ১৮৮৫ সনের পরেকারও নয়। 'গোরা'র ঘটনাকালও এর মধ্যে ফেলা উচিত, কিন্তু ঠিক কবে ইহা লইয়া গণ্ডগোল আছে। হিসাবটা দিব। ঘটনার কালের ইঙ্গিত কয়েকটা উক্তিতে আছে। একটা একটা করিয়া ধরি—

(১) প্রথম দিন বিনয়কে দেখিয়া বরদাসুন্দরী বলিলেন, "মনে হচ্ছে,

আপনাকে যেন দুই-একবার সমাজে দেখেছি ?" বিনয় অনাবশ্যক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল, "হাঁ, আমি কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।"

কেশববাবুর সহিত কুচবিহার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজের এক অংশের সহিত বিরোধ হয় ১৮৭৮ সনে। ইহার পর ব্রাহ্মসমাজ 'সাধারণ' ও 'নববিধান' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পরেশবাবুর পরিবার নববিধানভুক্ত হইতে পারে না, উহা স্পষ্ট। সুতরাং কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিবার সময়ে বরদাসুন্দরীর পক্ষে বিনয়কে দেখা সম্ভব হইতে পারে শুধু ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হইবার আগে। আর এক জায়গায় এও আছে যে, পরেশবাবুদের ঘরে একদিকে যীশুর ছবি ও অন্যদিকে কেশববাবুর ছবি। তিনি হিন্দুমতে মেয়ের বিবাহ দিবার পর বরদাসুন্দরী নিশ্চয়ই কেশববাবুর ছবি ঘরে রাখিতেন না। সুতরাং 'গোরা'র প্রারম্ভ ১৮৭৮ সনের আগে হওয়া উচিত।

তখন গোরার বয়স হইবে একুশ বৎসর, কারণ তাহার জন্ম মিউটিনির প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৮৫৭ সনে। বিনয়ের বয়সও সমান বলিতে হয়। তাহাদের যে আচরণ ও কার্যকলাপ উপন্যাসে দেখানো হইয়াছে গোরা বা বিনয়ের পক্ষে একুশ বৎসর বয়সে তাহা অসম্ভব নয়, তবে বয়স যেন একটু কম—২৪।২৫ হইলে ভাল হইত মনে হয়। ইহা ছাড়া অন্য মুশকিলও আছে।

(২) সতীশ একদিন বিনয়ের সম্মুখে বলিল, "মাসিমা, জান ? রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে। ভারি মজা হবে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কার দলে ?"

সতীশ কহিল, "আমি রাশিয়ানদের দলে।"

বিনয় কহিল, "তাহলে রাশিয়ানদের আর ভাবনা নাই।"

ভারতবর্ষের উপর রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা কবেকার কথা ? ১৮৭৮ সনের শেষে আফগানিস্থানের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের যুদ্ধ আরম্ভ হয়—উহা দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। এই যুদ্ধ রুশ প্রভাব বিস্তার উপলক্ষেই হইয়াছিল, সুতরাং এটাকে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা বলিয়া ধরা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু আসলে তখন রুশিয়ার দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রমণের কথা উঠে নাই, এই কথা উঠিয়াছিল ১৮৮৪ সনের শেষে পেঞ্জদে দখলের পর। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ বৎসর, তাই এই ঘটনাটার কথা মনে করিয়াই সতীশের মুখে উক্তিটা বসাইয়াছিলেন এটা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৭৮ সনে রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো, সুতরাং আগেকার ব্যাপারটা এত প্রবলভাবে অনুভব না করিয়া থাকিতে

পারেন। কিন্তু ১৮৮৪ সন ধরিলে গোরা ও বিনয়ের বয়স সাতাশ হইয়া যায়—উহা একটু বেশী। আর কেশববাবুর সহিত সঙ্গতি তো হয়ই না।

(৩) 'গোরা'র কাল সম্বন্ধে আর একটা ইঙ্গিত যে আছে, সেটা আরও গোলমেলে। ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে বিনয়ের যেসব আপত্তি ছিল তাহার মধ্যে একটা এই,—"কিছুকাল হইল সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে। সে-সময়ে গোরা ও বিনয় কাগজে ওই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছে। আজ সেই সিভিল বিবাহ স্বীকার করিয়া বিনয় নিজেকে 'হিন্দু নয়' বলিয়া ঘোষণা করিবে, এও তো বড় শক্ত কথা।" এই আইন ১৮৭২ সনের তিন আইন (Act III of 1872)। তখন গোরার বয়স পনেরো। সুতরাং গোরা ও বিনয়ের পক্ষে কাগজে এ বিষয়ে লেখা সম্ভব নয়। তবে ১৮৭৮ সনে কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে এই আইনের আলোচনা আবার উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে দুইটা আলোচনা মিশিয়া গিয়া থাকিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সনের মাঝামাঝি হইতে ১৮৮০ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন না, আইন পড়িবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ ও নববিধানের ঝগড়ার কথা তিনি ফিরিয়া আসিয়া শুনিয়া থাকিবেন, এবং সেজন্য ঘটনাগুলির কালক্রম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা একটু অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে পারে।

মোটের উপর বিশেষ উক্তি বা ঘটনার কথা না ভাবিয়া যদি 'গোরা'র কালকে ১৮৮০ হইতে ১৮৮২ সনের মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলে চিন্তাভাবনা, তর্কবিতর্ক, সমস্যা ও সমাজের সংঘাত—সকলের সঙ্গেই খাপ খায়।

এই যুগটা বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সংঘাতের কাল। এই সংঘাতের একদিকে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপন্থী হিন্দু, অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু। এই হিন্দুরা কিন্তু গতানুগতিক পুরাতন পন্থা অবলম্বনকারী হিন্দু ন'ন। ইঁহারা নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবির্ভাবে যে হিন্দু কাউণ্টার-রিফর্মেশন আসিয়াছিল সেই পথের হিন্দু। সুতরাং দুই দিকেই একটা করিয়া স্পষ্ট থিওরি ছিল। পরেশ-বাবু নূতন ব্রাহ্মমতের প্রতিনিধি (ব্রাহ্ম সমাজের নন), গোরা নূতন হিন্দুমতের প্রতিনিধি, কিন্তু পুরাতন হিন্দু সমাজের নয়। এই দুই উপলব্ধিই গল্পটার কাঠামো জুটাইয়াছে।

কিন্তু 'গোরা'র প্রকৃত বিষয় বুঝিতে হইলে এই দুইটি উপলব্ধির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তাহার প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করা দরকার। নব্য হিন্দুত্বের মধ্যে একটা অত্যন্ত

ছেলেমানুষি দিক ছিল। উহাকে একেবারে বুজরুকি বলা যাইতে পারে। এই হিন্দুত্ব টিকি রাখার ও একাদশী পালনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি বাহির করিয়াছিল। এই দলের নেতা ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি এবং উকীল ছিলেন তাঁহারা যাঁহাদের রবীন্দ্রনাথ হিং টিং ছট্ কবিতা লিখিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। অবিনাশের হিন্দুত্ব অনেকটা সেই পর্যায়ের। এই হিন্দুত্ব শুধু ধর্মের ব্যাপার কখনই ছিল না। নূতন হিন্দুত্ব সব স্তরেই ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তাই অবিনাশ বলিয়াছিল, "পৃথিবীতে কেবল আমাদের দেশেই ষড়ঋতু আছে, আমাদের দেশেই কালে কালে অবতার জন্মেছেন এবং আরও জন্মাবেন।"

শশধর তর্কচূড়ামণির জাতীয় ধর্ম প্রচার আরও উগ্র ছিল। তিনি বক্তৃতা করিতে গিয়া হিন্দুর ভগবানের সহিত খ্রীষ্টানের ভগবানের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তারস্বরে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিতেন, "খ্রীষ্টানের ভগবানের কি নাম, আপনারা বলুন।"

শ্রোতারা চিৎকার করিত,—"GOD."

তর্কচূড়ামণি বলিতেন, "উহা উল্টান্।"

শ্রোতারা বলিত, "DOG."

শশধর বলিতেন, "তবে! এইবার আমাদের ভগবানের নাম বলুন।" পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত দু-চারজন শ্রোতা বলিতেন,—"নন্দনন্দন!"

শশধর বলিতেন, "আবার উল্টান। কি হইল?"

চতুর্দিক কাঁপাইয়া ধ্বনি উঠিত, "নন্দনন্দন!"

শশধর আবার বলিতেন, "তবে!"

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইত।

গোরার নব্য হিন্দুত্ব এই পর্যায়ের হিন্দুত্ব নয়, কিন্তু উহাও জাতীয়তা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মবোধের উপর নয়। সত্যকার ধর্মবোধ গোরার ছিল না। হিন্দুধর্মের উপর গোরার যে শ্রদ্ধা উহা জাতীয় ধারার উপর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হইতে ব্রাহ্মমতের উপর তাহার যে বিদ্বেষ দেখা দিল, উহা জাতিকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইতে প্রসূত। পাশ্চাত্ত্য সংঘাত, পাশ্চাত্ত্য অবজ্ঞা হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে আগে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবে ইহাই গোরার প্রথম কথা। এই সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, উহার যে সব প্রথা বা বিশ্বাসকে খারাপ বলা হইত তাহারও সমর্থন করিতে হইবে, ইহাই দাঁড়াইল গোরার যুক্তি। বইটার সর্বত্র

এইটা একেবারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। আমি দুইটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিব। সে হারাণবাবুকে বলিতেছে,—

"আপনি যাকে কুপ্রথা বলছেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলছেন; নিজে ও-সম্বন্ধে কিছু জানেন না। ইংরেজের সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারবেন তখন এ সম্বন্ধে কথা কবেন।"

আর একটা উক্তি পরের ঘটনা সম্বন্ধে। বিনয় আসিয়া ললিতার সহিত তাহার হিন্দুমতে বিবাহ সম্বন্ধে পরেশবাবুর সম্মতি আনিয়া যখন বলিল, "পরেশবাবু তাঁর দিক থেকে যেমন সম্মতি দিয়েছেন, তেমনি তোমার দিক থেকেও গোরা, তোমাকে সম্মতি দিতে হবে।" তখন গোরা উত্তর দিল,

"পরেশবাবু সম্মতি দিতে পারেন, কেন-না নদীর যে-ধারা কূল ভাঙছে সেই ধারাই তাঁদের। আমি সম্মতি দিতে পারি নে, কেন-না আমাদের ধারা কূলকে রক্ষা করে। আমাদের এই কূলে কত শতসহস্র বৎসরের অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে, আমরা কোনোমতেই বলতে পারব না, এখানে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করতে থাক্। আমাদের কূলকে আমরা পাথর দিয়েই বাঁধিয়ে রাখব—তাতে আমাদের নিন্দাই কর আর যাই কর।"

আরও পরে সে পরেশবাবুকে বলিল,

"আমার কথাটা এই যে, আগে সমাজকে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চললে তবেই সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করলে তাকে যে কেবল বাধা দিই তা নয়, তাকে ভুল বুঝি।"

সুতরাং যদি হিন্দুসমাজ অচলায়তনও হয়, তাহা হইলে জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজ্‌ম্ এবং পেট্রিয়টিজ্‌ম্-এর খাতিরে, উহার মধ্যেই থাকিতে হইবে, ভাঙিয়া বাহির হইবার অধিকার নাই, ইহাই হইল গোরার নিজের কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালী জাতির মানসিক জীবনে নব্য হিন্দুত্বের দুইটা ধারার মধ্যে, অর্থাৎ রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক হিন্দুত্বের মধ্যে, যে সংঘাত চলিতেছিল, 'গোরা' উপন্যাসে তাহার একেবারে খাঁটি বিবরণ আছে। কিন্তু উপন্যাসটিতে দুই পন্থারই উচ্চতম রূপ দেখানো হইয়াছে। গোরার কথা ও কার্যকলাপের মধ্যে যাহা পাই তাহা রক্ষণশীল হিন্দুত্বের উচ্চতম আদর্শ, আবার পরেশবাবুর মধ্যে যাহা পাই তাহা ব্রাহ্ম পন্থার উচ্চতম আদর্শ। এই

বইটিতেই একদিকে অবিনাশ ও অন্যদিকে হারাণবাবুর মধ্যে দুই ধারারই সঙ্কীর্ণতম রূপ দেখানো হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মানসিক জীবনের ইতিহাস লিখিবার একটা উপাদান এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই দিক হইতে 'সোর্সবুক' হিসাবে 'গোরা'র মূল্য খুবই বেশী।

কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে একটা উপন্যাসের মূল্য যতই হউক না কেন, উহা সাহিত্যবিচারের দিক হইতে যথেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রাসঙ্গিকও নয়। উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে উৎরাইতে হইবে। 'গোরা' উপন্যাস উৎরাইয়াছে কি ? যতদিন আমি মনে করিতাম যে গোরার পন্থা ও পরেশবাবুর পন্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অবশেষে অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরেশবাবুর পন্থার জয়—এই দুইটি ব্যাপারই 'গোরা' উপন্যাসের বিষয়, ততদিন আমি বইটাকে উপন্যাস হিসাবে বড় বলি নাই—বরঞ্চ বলিয়াছি যে, এটা একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

বহু বাঙালী পাঠক এটাই 'গোরা' উপন্যাসের বিষয় মানিয়া লইয়া বা বিশ্বাস করিয়া বইটাকে অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি মনে করেন। জীবনকে ছাড়িয়া তত্ত্বকে ধরিবার যে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আমাদের আছে, ইহা তাহার ফল। সেজন্য আমি এইদিক হইতে বইটাকে কেন অসার্থক বলি তাহার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

দুই আদর্শ, দুই ধর্ম বা দুই মতবাদের সংঘাত এবং এ দুই-এর একটির জয় যদি উপন্যাসে গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে যে, লেখক যাহাকে উচ্চতর পন্থা মনে করেন তাহার জয় স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছে, অর্থাৎ যে নায়ক বিরোধী পন্থার সহিত যুদ্ধ করিতেছে সে পরে নিজের অনুভূতি এবং যুক্তি দিয়াই অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। 'গোরা' উপন্যাসে অবশ্য নায়ক শেষ পর্যন্ত পরেশবাবুর কাছেই আসিয়াছে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার এই সব পরিবর্তন অনিবার্য মানসিক কারণে হয় নাই।

হইয়াছে একটা সম্পূর্ণ বাহ্যিক কারণে—গোরা হিন্দু নয় বলিয়া, গোরা আইরিশ পিতামাতার সন্তান বলিয়া, হিন্দুসমাজে আর তাহার স্থান নাই বলিয়া। ইহা গোরার আগেকার হিন্দুত্বের পরাজয় মোটেই নয়। কারণ গোরা কখনই বলে নাই যে, হিন্দুর ধর্ম সকলের ধর্ম। একমাত্র হিন্দুর কাছেই হিন্দুপন্থা শ্রেষ্ঠ, ইহাই সে বলিয়াছে। সুতরাং অহিন্দু বলিয়া প্রমাণিত হওয়া মাত্র যদি সে পরেশবাবুর কাছে গিয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা হইয়াছে অবস্থার চাপে, নিজের অনুভূতির

বা যুক্তির জোরে নয়। এই ভাবে সঙ্কটের সমাধানকে প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকেরা Deus ex machina বলিতেন। সুতরাং এই কথা বলিতে পারি, যে উপায়ের দ্বারা গোরাকে রবীন্দ্রনাথ পরেশবাবুর কাছে হার মানাইয়াছেন, উহা গোঁজামিল। গল্প বা নাটকের সঙ্কটমোচন যখন গোঁজামিলের দ্বারা হয়, তখন তাহাকে বড় সাহিত্যসৃষ্টি বলা চলে না। তাই আমিও হিন্দু রক্ষণশীলতা ও হিন্দুর উদারতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'-কে বড় কিছু মনে করি নাই।

এই ধারণা আমার বহুদিন ছিল। কিন্তু বৎসর কয়েক আগে আমি আবার পরিণত বয়সে 'গোরা' পড়িতে আরম্ভ করি। এর পর আজ পর্যন্ত প্রায় বার পঞ্চাশেক পড়িয়াছি। এ পড়ার ফলে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, 'গোরা'র বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অন্য, অর্থাৎ হিন্দুরক্ষণশীলতা ও হিন্দু উদারতার সংঘাত নয়, আর একটা ব্যাপার। আসলে 'গোরা'র বিষয়বস্তু দেশপ্রেমের সহিত নারীর প্রতি প্রেমের সংঘাত। অর্থাৎ 'গোরা' একটা প্রেমের গল্প। ধর্মগত সংঘাত উহার কাঠামো মাত্র।

যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ধর্মগত সংঘর্ষের পিছনে, দেশপ্রেম এবং প্রেমের সংঘর্ষের পিছনে সেই ইউরোপীয় প্রভাবই ছিল, কারণ দেশপ্রেম ও নারী-সম্পর্কিত প্রেম দুইটা বিষয়ই বাঙালী ইউরোপীয় সভ্যতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। সংঘাতটা কেন ঘটিল, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সনাতন হিন্দু ধর্ম (অর্থাৎ সমগ্র হিন্দু পন্থা) সম্বন্ধে গোরার যে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং ভক্তি দেখা যায়, তাহা যে তাহার দেশপ্রেমের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যুগের বাঙালী যখন দেশপ্রেম তীব্রভাবে অনুভব করিত তখন সে হিন্দুধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইত, হিন্দুপন্থাই ধরিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই যোগাযোগের সর্বোচ্চ রূপ দেখা গিয়াছিল। সাধারণ বাঙালীর মধ্যেও উহা দেখা যাইত। পক্ষান্তরে এটাও দেখা গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুর সনাতন ধর্ম ছাড়ার ফলে দেশের প্রতি ভালবাসাও এত তীব্রভাবে অনুভব করেন নাই, তাঁহারা ইংরেজের জীবনযাত্রাকে উচ্চতর বলিয়া মানিতেন। ইহাকে যদি বিশ্বজনীনতা বলা যায়, তাহা হইলে দেশপ্রেমের সহিত বিশ্বজনীনতার একটা বিরোধ আছে বলিতে হইবে। নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্মদের আচরণ ও মতামতের মধ্যে এই বিরোধ কার্যক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজকে অচলায়তনই বলুন কিংবা আর যা কিছুই বলুন না কেন দেশপ্রেমিক নব্য হিন্দু মনে করিত

এই অচলায়তন হইতে বাহির হইবার অধিকার তাহার নাই ; যদি অচলায়তনের কোন জিনিস তাহার কাছে অবাঞ্ছনীয় মনে হয়, তবে শুধু উহা সরাইয়া অচলায়তনকে নির্মল করিতে হইবে ; যে জিনিস একেবারে বাহিরের তাহাকে এই অচলায়তনের মধ্যে আনা যাইবে না।

ওই বিশ্বাসের জন্য নব্য হিন্দুরা মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, তাহাদের নূতন অচলায়তনেও ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের স্থান নাই। ইহাও তখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে এদেশে দেখা দিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নব্য হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সম্পর্কের এই নূতন অনুভূতিরও প্রবর্তনকর্তা। তিনিই বাঙালী জীবনে রোমান্টিক প্রেমের জোয়ার প্রথমে আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে নব্য হিন্দুত্ব ও রোমান্টিক প্রেমের বিরোধের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সাধারণ বাঙালীর মনে একটা ধারণা ছিল যে রোমান্টিক প্রেমটা খুব কাম্য ব্যাপার নয়।

উপন্যাস সম্বন্ধে নীতিবাদীদের যে একটা বিরূপ ভাব ছিল, উহা আসিয়াছিল এই অনুভূতি হইতেই। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের একটি হাস্যরসাত্মক গল্প আছে, তাহাতে এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গল্পে বৃদ্ধ রায়বাহাদুরকে বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী বলিয়া দেখানো হইয়াছে। রায়বাহাদুর বলিলেন, "বঙ্কিমকে বলতুম দেশের ভালর জন্যে কিছু লেখো, না তার বই-এ খালি লভ্ আর লড়াই। (স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিলাম, কারণ বইটা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তবে তাৎপর্য ঠিক আছে।)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমের গল্প যে রক্ষণশীল বাঙালী ভাল চোখে দেখে নাই, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। কবি নবীন সেন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই অভিযোগ করেন যে, প্রেমের অবাধ প্রচারের দ্বারা তিনি দেশের অহিত করিয়াছেন ; অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' দ্বারা যে অহিত হয় নাই, কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ রজনী ইত্যাদির দ্বারা সেই অহিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক প্রেমের প্রতি গোরার আপত্তি এত স্থূল না হইলেও তেমনই স্পষ্ট এবং উগ্র। বিনয়কে পরেশবাবুর বাড়ির দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া এই কারণেই সে বন্ধুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। তাহার উক্তি উদ্ধৃত করিব।

"বিনয়। দেখো, গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি—আমাদের শাস্ত্রেও—

গোরা। স্ত্রীজাতিকে যেভাবে ভক্তি করছ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ো না। ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি মারতে আসবে।

বিনয়। এ তুমি গায়ের জোরে বলছ।

গোরা। শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন, পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। তাঁরা পূজার্হা গৃহকে দীপ্তি দেন ব'লে, পুরুষমানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন ব'লে। বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বললেই ভাল হয়।

বিনয়। কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড়ো ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষপাত করা উচিত?

গোরা। বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নাও—আমি বলছি, বিলিতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে-সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্ছে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পূজো করবার জায়গা হল—মা'র ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন—সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয় তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মত তোমার মনটা যে কারণে পরেশবাবুর বাড়ির চারিদিকে ঘুরছে, ইংরিজিতে তাকে বলে থাকে 'লাভ'—কিন্তু ইংরেজের নকল ক'রে ওই 'লাভ' ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে, এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে পেয়ে না বসে!"

দেশপ্রেমিক নব্য হিন্দুর রোমান্টিক প্রেমের প্রতি বিমুখতা এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যাইত না। যতদিন বিনয়ের বিবাহ না হইল, ততদিন গোরা এই আপত্তি বজায় রাখিয়াছিল। প্রেমের জন্য হিন্দু সমাজকে ত্যাগ, এই ব্যাপারটা গোরার কাছে আরও বড় অপরাধ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই সে নিজে বিনয়ের বিবাহে বন্ধুভাবেও যোগ দেয় নাই, মাকেও যোগ দেওয়া হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরে বিনয়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল।

জেলখানা হইতে ফিরিয়া—তখনও বিনয়ের বিবাহ একেবারে স্থির হইয়া যায় নাই—গোরা এই কথা বলিয়াছিল,—

'ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে নিজেকে যে পৃথক করে ফেলতে চাও সেইটেই আমার কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয়। এ কাজ তুমি পার, আমি কিছুতেই পারি নে—এইখানেই তোমাতে আমাতে

প্রভেদ, জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়। আমার প্রেম যেখানে তোমার প্রেম সেখানে নেই। তুমি যেখানে ছুরি মেরে নিজেকে যুক্ত করতে চাচ্ছ সেখানে তোমার দরদ কিছুই নেই। আমার সেখানে নাড়ীর টান।"

এই তর্কের পর গোরার মনে একটা প্রবল অবসাদ আসিল। সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,

"হায়, আমার দেশ কোথায়। দেশ কি কেবল আমার একলার কাছে। আমার জীবনের সমস্ত সংকল্প যাহার সঙ্গে আলোচনা করিলাম সেই আমার আশৈশবের বন্ধু আজ এতদিন পরে কেবল একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার উপলক্ষে তাহার দেশের সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে এক মুহূর্তে এমন নির্ম্মমভাবে পৃথক হইতে প্রস্তুত হইল।"

"কেবল একজন স্ত্রীলোক!" গোরা কি 'ভিতা নুয়োভা' বা 'দিভিনা কম্মোদিয়া' পড়ে নাই?

গোরার আপত্তির উত্তর বিনয় এক নূতন ভাষাতে দিয়াছিল। প্রথম দিন গোরার ব্যঙ্গের পর সে অবশ্য কষাহত-তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ললিতাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিবার পর তাহার আর কোনও সঙ্কোচ ছিল না, প্রেমের মহিমা এবং মূল্য যে কি, নিজের বিবাহের দিনে স্পষ্ট ভাষায় গোরাকে বলিতে সে দ্বিধা করে নাই।

তাহার উক্তি এই,—

"গোরা, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম—যে কারণেই হউক আমাদের মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব দুর্বল, সেই জন্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত, আমাদের কী আছে তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত তাহাকে ব্যয় করা আমাদের অসাধ্য; সেইজন্যই চারিদিকে এমন নিরানন্দ, এমন নিরানন্দ।"

কিন্তু ততদিনে গোরার নিজের মনেও সন্দেহ এবং প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তাই বিনয় যখন বলিল, "কোনো কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় অসামান্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে", তখন গোরা পূর্বের ন্যায় সে কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। গোরা মনে মনে স্বীকার করিল, "তাহা সামান্য মিলন নহে, তাহা পরিপূর্ণতা, তাহার সংস্রবে সকল

জিনিসের মূল্য বাড়িয়া যায় ; তাহা কল্পনাকে দেহদান করে ও দেহকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া তোলে।”

প্রেমের মহিমার এই স্বীকৃতিই ‘গোরা’ বইটার ‘ক্লাইমেক্স্‌’, শেষে গোরা ও সুচরিতার মিলন নয়। কিন্তু তখনও গোরার আত্মসমর্পণ করিবার কোনও আগ্রহ ছিল না। প্রেমের মহিমা স্বীকার করিয়াও হিন্দুত্বের জন্য উহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই সংকল্প তাহার একেবারে শেষ ঘটনার আগেও টলে নাই।

নিজের সহিত নিজের এই যুদ্ধ গোরা চালাইয়াছিল, সেটাকেই ‘গোরা’ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু বলা চলে। যদি শেষের Deus ex machina না আসিত, তাহা হইলে এই দ্বন্দ্বের পরিণাম হইত একটা ট্র্যাজেডি। দ্বন্দ্বটার ধাপ-গুলির হিসাব লওয়া দরকার।

গোরা যেদিন বুঝিতে পারিল যে, সুচরিতার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই দিনই সে নিজের মনকে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বলিল, ‘না, এ-সব কিছু নয় ; এ কোনোমতেই চলিবে না।’ তারপর সে লক্ষ্যহীনভাবে বাংলা দেশের মফঃস্বলে ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। ইহার পর যে তাহার জেল হইয়া-ছিল সে ঘটনা সকলেরই জানা। কিন্তু কারাগার হইতে বাহির হইয়াও সুচরিতা সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল বা আগ্রহ কিছুই কমিল না। বরঞ্চ সে কিছুদিন পর পর সুচরিতার বাড়ী যাইতে লাগিল।

এইখানে গোরা’র কাছে সুচরিতার আকর্ষণ কি তাহা বোঝানো আবশ্যক। আমি ইতিপূর্বে ‘দৃষ্টিদান’ গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, প্রেমের একটা বড় উপাদান দেহানুভূতি, অর্থাৎ দেহবর্জিত প্রেম নাই। গোরার বেলাতেও ঠিক তাহাই দেখিতে পাই। গোরা অবশ্য সুচরিতার মানসিক সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই অনুভূতির সহিত প্রথম হইতেই সুচরিতার দেহের অনুভূতিও একেবারে জড়াইয়া গিয়াছিল। যেদিন প্রথম গোরা বুঝিতে পারিল যে, সুচরিতার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট সেইদিন হইতেই সুচরিতার দেহের অনুভূতিও অন্য আকর্ষণের সহিত একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। দুই-চারিটি উদাহরণ দিতেছি—

(১) “মুখের ডৌলটি কি সুকুমার ? ভ্রূযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ।”

(২) “নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্ব্বে কোনোদিন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা

ধিক্কার ভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরণের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভালো লাগিল। সুচরিতার হাত টেবিলের উপর ছিল, তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল।"

(৩) "গোরার কানে সুচরিতার মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন বড়ো মধুর লাগিল। সুচরিতার বড়ো বড়ো দুইটি চোখের মধ্যে এই প্রশ্নটি আরও মধুর করিয়া দেখা দিল।"

(৪) "সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে ?—এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল, অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।"

আশা করি সুচরিতার সম্বন্ধে গোরার মনোভাবের পরিচয় হিসাবে এই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু সুচরিতার প্রতি আকর্ষণ তাহার যতই বাড়ুক, এই আকর্ষণ যে তার হিন্দু জীবনব্রতের বিরোধী এই জ্ঞান গোরা কখনই হারায় নাই। কিন্তু দুই-এর সমন্বয়ের জন্য সে একটা আত্মপ্রবঞ্চনা আরম্ভ করিল। সে আত্মপ্রবঞ্চনা এই —সুচরিতাকে হিন্দুত্বে দীক্ষা দিয়া শিষ্যা করা। সুচরিতাও তাহাদের দুজনের প্রেমের এই রূপান্তর স্বীকার করিয়া শিষ্যা হিসাবেই অগ্রসর হইয়া গেল। এই অবস্থায় গোরা সহজেই গুরু-শিষ্যা সম্বন্ধের মধ্যে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সম্পর্ককে ছদ্মবেশে লুকাইয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু গোরার এতটুকু সত্যপরায়ণতা ছিল যে, সে এই সম্বন্ধও প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল।

তবু একদিন প্রলুব্ধ হইয়া সে শেষবারের মত সুচরিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল সে নাই। "গোরার একটি সংস্কার তাহার মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়াছিল যে তাহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক নহে, অথবা কেবলমাত্র তাহার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। সে তাহার স্বদেশবিধাতার একটি কোনো অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

তাই সুচরিতার বাড়ী গিয়া যখন শুনিল সে বাড়ী নাই, তখন তাহার মনে হইল, যিনি গোরাকে চালনা করিতেছেন তিনি নিষেধ জানাইলেন যে, এ জীবনে

সুচরিতার দ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ। তাই সে নিজেকে বলিল,—

"বিধাতা আসক্তির রূপটা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন; দেখাইলেন তাহা শুভ্র নহে, শান্ত নহে, তাহা মদের মতো রক্তবর্ণ ও মদের মতো তীব্র; তাহা বুদ্ধিকে স্থির থাকিতে দেয় না, তাহা এককে আর করিয়া দেখায়—আমি সন্ন্যাসী, আমার সাধনার মধ্যে তাহার স্থান নাই।"

গোরা বুঝিল—"সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষের হইয়া দেবতার আরাধনা তাহাকে করিতে হইবে, ভারতবর্ষের হইয়া তপস্যা তাহারই কাজ।" পাশ্চাত্ত্য প্রেম ও পাশ্চাত্ত্য দেশপ্রেমের মধ্যে যে সংঘাত তাহাকে ইহার চেয়ে স্পষ্ট করা যাইত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিম

সর্বশেষে একেবারে গোড়ার প্রশ্নে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই যে নূতন ভালবাসা, যাহাকে বাঙালী জীবনে অঙ্গীভূত করিবার কথা এতক্ষণ পর্যন্ত বলিলাম, উহা কোথা হইতে আসিল, কে আনিল?

কোথা হইতে আসিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। গ্রাম্য মথুরের গ্রাম্য ভাষায় বলা যাইতে পারে—আসিল রাঙামুখোর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া, দু'পাতা ইংরেজী উল্টাইয়া, অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার মারফৎ ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে। আমি কবিত্বের চেষ্টা করিয়া বলি, ইউরোপের স্বর্ণকুন্তলা, নীলনয়না গোলাপবালারা নরওয়ের ফিয়র্ড হইতে উড়িয়া আসিয়া বাংলার গভীর জলের কালিন্দীতে কালিন্দীতে নাহিয়া মেঘকুন্তলা, কৃষ্ণতারকা যূথিকাবালা হইয়া দেখা দিল। কথাটা সোজা ভাষায় আমার ইংলণ্ড সম্বন্ধীয় বইটাতেও বলিয়াছি,—

"The history of love in Bengali Hindu society is fairly well established. It was introduced from the West much later than tobacco or potatoes, but has neither been acclimatized as successfully, nor has taken as deep roots, as those two plants.

"We in Bengal began to deal with love from the literary end. That is to say, at first it was transferred to Bengali literature from English literature, and then taken over from literature to life. As a result of this double transplantation, the plant remains delicate, and a hothouse atmosphere is needed for its survival."

(A Passage to England. P. 115—16)

দশ বৎসর আগে লিপিবদ্ধ এই মত আমি পরবর্তী চিন্তার ফলে খানিকটা বদলাইয়াছি। 'অ্যাক্লাইমেটাইজেশ্যন' সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা আজ আর নাই। কিছুকালের জন্য পূর্ণ 'অ্যাক্লাইমেটাইজেশ্যন' যে ঘটিয়াছিল তাহার পরিচয় আগের তিনটি পরিচ্ছেদেই দিয়াছি। কিন্তু উহা পুরামাত্রায় ব্যাপক এবং গভীর হয় নাই। অনুভূতির যে গভীরতা ও শক্তি থাকিলে নূতন ভালবাসা বাঙালীর একেবারে ধাতস্থ হইয়া চিরস্থায়ী হইতে পারিত,—তাহা বাঙালী চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। তাহার উচ্ছ্বাসপরায়ণতা আছে কিন্তু আবেগের জোর নাই। শুধু ভালবাসা কেন, বাঙালী জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যাহা কিছু বড় জিনিস আসিয়াছিল, যেমন দেশপ্রেম, ধর্মপরায়ণতা বা নৈতিক বোধ, সকলের সম্বন্ধেই এই কথাটা বলা যাইতে পারে। এ সবই আসিয়াছিল একটা প্রবল জাতীয় আয়াসের ও উদ্যমের ফলে, অথচ আয়াসসাধ্য কাজ মাত্রেই বাঙালীর কাছে কষ্টকর ও অপ্রীতিকর।

সুতরাং নূতন ভালবাসা বাঙালী সমাজে তামাক ও আলুর মত ঘরোয়া না হইয়া বাংলা দেশে অর্কিড ফুল ফুটাইবার মত হইয়াছিল। তবে উহাও স্বাভাবিক হইয়াছিল। বাঙালীর বাড়ীতে অর্কিডের গৌরব আমি দেখিয়াছি। চেষ্টা করিলে যত্ন করিলে উহার পূর্ণ সৌন্দর্য যে এখানেও হইতে পারে তাহা আমি জানি। কিন্তু সে চেষ্টা ও যত্ন কোথায়? মানুষের মনের উচ্চতম বিকাশ যে সর্বদেশে সর্বকালে আয়াসসাধ্য তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। বাঙালীচরিত্রের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে গা ভাসাইবার যে একটা দুর্বলতা আছে, তাহার জন্য আয়াস ও যত্নের প্রয়োজন আমাদের মধ্যে আরও বেশী। তাই নূতন ভালবাসা জোয়ারের মুখে যেমনই প্রাণবন্ত ছিল, তেমনই ভাঁটার মুখে যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু উহা লইয়া এখানে তর্ক তুলিব না। ভালবাসার অবসান আমি যে-যুগের কথা বলিতেছি তাহার পরবর্তী যুগের কথা। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে মানসিক জীবনের নূতন সম্পদ সংগ্রহ করিবার শক্তি বাঙালীর উনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছিল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য জগতের ভালবাসাও আমাদের জীবনে বিকশিত হইয়াছিল।

কিন্তু যে রোমান্টিক প্রেমের কথা এই বই-এ বলিতেছি উহা পাশ্চাত্ত্য জগতেও একটা বিশিষ্ট কালের সৃষ্টি এবং বিশিষ্ট ধারা। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় উহা ছিল না। ব্যাপারটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও গ্রীক জীবনে প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্য ও রোমান জীবনে নরনারীর সম্পর্কের যে রূপ দেখিতে পাই উহা সংস্কৃত সাহিত্যের রূপের মতই কামাবলম্বী। ইহার পরিচয় গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্যে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার অতিরিক্ত নরনারীর আকর্ষণ ও আসক্তির আর একটা রূপও গ্রীক সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া অ্যাটিক নাটকে আছে। তাহা এই—নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ একটা বিপজ্জনক, দুঃখজনক ব্যাপার, ইহাতে দুই-এরই জীবন বিষাদে ছাইয়া যায়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে একজনের বা আর একজনের সর্বনাশ হইয়া যায়। নরনারীর আকর্ষণ একটা আসুরিক শক্তি, মানুষের জীবন ইহার আঘাতে টুটিয়া যায়, সুখ ভাসিয়া যায়—এই ধারণাটা গ্রীক সাহিত্যের প্রায় সবটুকু জুড়িয়া আছে। এই ধারণার বশেই গ্রীক চরিত্র লইয়া কাব্য লিখিতে গিয়া সুইনবার্ন লিখিয়াছিলেন,—

"For an evil blossom was born
Of sea-foam and the frothing of blood,
Blood-red and bittter of fruit,
And the seed of it laughter and tears,
And the leaves of it madness and scorn ;
A bitter flowers from the bud,
Sprung of the sea without root,
Sprung without graft from the years."

'আটালাণ্টা ইন্ ক্যালিডনে' এই কবিতাটির সবটুকু পড়িয়া লইতে পাঠককে অনুরোধ করিব, তাহা হইলে গ্রীকের কাছে প্রেমের কি ভীতিজনক মূর্তি ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এই ধারা সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যেও অনুবর্তিত হইয়াছিল। রাসিনের নাটকে প্রেমের সুখদায়ক রূপ নাই, এগুলিতেও প্রেম কষ্ট ও যন্ত্রণার হেতু।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু 'ফিড্রা'রই উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাসিনের নিজের জীবনেও প্রেম সুখের অবলম্বন হয় নাই, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ফ্রান্সে সপ্তদশ শতাব্দী যেমন চতুর্দশ লুই এর রাজসিক আড়ম্বরের যুগ, তেমনই প্রেমেরও যুগ। তখন পুরুষের কাজ ছিল শাসন, যুদ্ধ ও নারীচর্চা; স্ত্রীলোকের কাজ ছিল, রূপচর্চা ও ভালবাসা। কিন্তু এই ভালবাসার আদান-প্রদানে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া লুইজ দ্য লা ভালিয়েরের মত মুগ্ধা কুমারী পর্যন্ত কাহারও জীবনই সুখের হয় নাই। কামনার জ্বালা, মিলনের অসারতা ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা মিলিয়া ভালবাসার একটা 'ইনফার্ণো' সৃষ্টি হইয়াছিল।

তাই সেই যুগ হইতে যে প্রেমের উপন্যাসটি আসিয়াছে, যাহাকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আট-দশটি গল্পের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহাতে প্রেমের দুঃখ ভিন্ন আর কিছু দেখানো হয় নাই—শেষ পর্যন্ত নায়িকা প্রেমের জ্বালা হইতে মুক্তি পাইল প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর কঠিন বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া। যখন সে প্রেমের মোহে অভিভূত তখনই তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায় তাহাকে এই সর্বনাশকারী প্রবৃত্তি হইতে হৃদয়কে ক্ষান্ত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথা কয়টা ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি,—

"মা, তোমাকে ছাড়িয়া, যাইতে হইবে। ইহার যে যন্ত্রণা তাহা আরও বেশী অনুভব করিতেছি এই জন্য যে, তোমাকে ঘোর বিপদে ফেলিয়া যাইতেছি এবং আমাকে তোমার প্রয়োজন আছে। তুমি মসিয় দ্য নেমুরের প্রতি অনুরক্ত। এই কথাটা তোমাকে স্বীকার করিতে বলিব না, কারণ আমার আর সেই অবস্থা নাই যাহাতে তোমার সারল্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে আমি চালাইতে পারি। অনেক দিন হইতেই আমি তোমার এই অনুরাগ বুঝিয়া আসিতেছি। কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে চাই নাই এই ভয়ে যে, উহার ফলে তুমি নিজে এই অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে। এখন তোমার কাছে ব্যাপারটা অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখন ইহা হইতে নিজেকে নিবৃত্ত করিতে হইলে বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হইবে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার যাহা কর্তব্য উহার কথা চিন্তা করিও; তোমার নিজের প্রতি যাহা কর্তব্য উহার কথাও ভাবিও; ইহাও ভাবিও, যে সুনাম তুমি অর্জন করিয়াছ এবং যাহা তোমার হউক এই বাসনা আমি এত করিয়াছি, সেই সুনাম তুমি হারাইতে পার। শক্তি এবং সাহস রাখিও, মা আমার। রাজসভা হইতে চলিয়া

যাইও; তোমার স্বামীকে তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বাধ্য করিও; অতি বন্ধুর ও দুঃখজনক পথ ধরিতে ভয় পাইও না; এই পথ প্রথমে যত ভীতিজনকই মনে হউক না কেন, শেষে দেখিবে উহা প্রণয়ের দুঃখ হইতে সুখজনক। আমি তোমাকে যাহা করাইতে ইচ্ছা করি, তাহা করিতে বাধ্য করিবার জন্য যদি তোমার নিজের সতীত্ব ও কর্তব্যবোধ ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন থাকে তবে এইটুকু মাত্র বলিব, এই সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে আমি যে সুখ পাইব মনে করিতেছি তাহার ব্যাঘাত যদি কোন কিছু করিতে পারে তাহা এই জিনিসটা দেখা যে অন্য নারীর মত তুমিও ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছ; কিন্তু এই দুর্ভাগ্য যদি তোমার হয়ই, তাহা হইলে উহা না দেখিবার জন্য আমি সানন্দে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইব।"

এই কথাগুলি বলিয়া মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ ফিরাইয়া কন্যার কাছ হইতে বিদায় নিলেন। ইহার পর দুইদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের জীবনের একমাত্র সম্বল কন্যাকে আর একবারও দেখিতে চাহিলেন না।

প্রেমের এই ভয়াবহ চিত্র পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মানোঁ ল্যাস্কো'-তেও আঁকা হইয়াছিল।

বাংলাদেশে যে পাশ্চাত্য প্রেম আসিয়াছিল, উহা এই প্রেম নয় তাহা বলাই বাহুল্য। উহা সুখের বন্যার মত আসিয়াছিল। উহার উৎস ইউরোপের আর এক ধারা।

আশ্চর্যের কথা এই, সুখের প্রেমের ধারা দুঃখের প্রেমের ধারার অপেক্ষা ইউরোপীয় জীবনে প্রাচীন। উহার স্পষ্ট সূচনা পাই আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে এক নয় বৎসর বয়স্ক বালক এক রূপসী যুবতীকে দেখিয়া যাহা অনুভব করিয়াছিল, তাহার কথা পরজীবনে কবি হইয়া লিখিয়াছিল,—

> "Incipit vita nova, Ecce deus fortior me,
> qui veniens dominibatur mihi"

(আজ হইতে নবজীবন আরম্ভ হইল। এই দেবতা আমার চেয়ে শক্তিমান, তিনি আসিয়া আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন।)

প্রণয়িনীর সহিত মিলন এই প্রণয়ীর কখনই হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেম তাহার কাছে কখনই দুঃখের কারণও হয় নাই। বরঞ্চ এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যে উহা গৌরবের বস্তু ও দিব্য আনন্দেরই অবলম্বন

হইয়াছিল। ইনি যে দান্তে তাহা বলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। প্রেমের এই নূতন রূপ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের কামাবলম্বী প্রেম যে নয়, উহার ধর্ম যে বদলাইয়াছে, উহা যে আর নরনারীকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করে না, পক্ষান্তরে তাহাদিগকে পবিত্র মানুষিক প্রেমের জগৎ হইতেও ভগদ্ভক্তির জগতে উন্নীত করে, তাহার স্পষ্ট অনুভূতি দান্তের মহাকাব্য 'দিভিনা কম্মোদিয়া' জুড়িয়া আছে। 'পারাদিজো'র অষ্টম সর্গের গোড়াতে দান্তে, ভিনাসের পুরাতন পূজাকে 'antico errore'—প্রাচীন ভ্রম বলিয়াছেন।

বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে ভালবাসা, তাহার লোকোত্তর পরিণতির কথা মনে রাখিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষে গোবিন্দলালের কথা কয়টি বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। ভাগিনেয় শচীকান্ত যখন গোবিন্দলালকে সম্পত্তি ফিরাইয়া নিতে অনুরোধ করিলেন, তখন গোবিন্দলাল উত্তর দিলেন,—

> "বিষয় সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।"
>
> "শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, 'সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?'
>
> "গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, 'কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর, ভ্রমরাধিক ভ্রমর'।"

এই সুর হিন্দু ভক্তিবাদের নয়, আসিয়াছিল মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ হইতে হিন্দুভক্তির বেনামীতে:

রোমান্টিক প্রেমের যে লোকোত্তর রূপ দান্তের মধ্যে দেখিতে পাই, ত্রুবাদুরদের কাব্যে ও গানে উহারই লৌকিক রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং 'শিভাল্‌রি'র মধ্যে উহার কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এই নূতন প্রেম ইউরোপীয় মধ্যযুগের বিশিষ্ট সৃষ্টি।

তাহা ছাড়া ইহার উদ্ভবের মধ্যে হয়ত কোথাও না কোথাও দেশ এবং জাতিগত একটা ধর্মও ছিল। ভূমধ্যসাগরের পারে পারে বায়ুর তপ্ততায় ও আলোর প্রাখর্যে প্রেমের মধ্যে আসিয়াছিল একটা জ্বালা ও অনির্বাণ তৃষ্ণা; উত্তর ইউরোপের তুষার, শৈত্য ও মৃদু আলোতে উহাতে আসিল তৃপ্তি, পূর্ণতা, ও স্নিগ্ধ উচ্ছলতা; তাহারও উপর রহিয়া রহিয়া উহার ভিতর দিয়া 'অরোরা

বোরিয়ালিস'—মেরুদ্যুতির বিভা খেলিয়া যাইতে লাগিল। জাতিগত ধারার কথা বিবেচনা করিলে উহার মধ্যে জার্মান গোষ্ঠীর নারীর প্রতি শ্রদ্ধা—যাহার কথা তাসিতাস লিখিয়াছিলেন—উহাও যে আসিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। টেনিসন, আমার মনে হয়, এই জিনিসটা অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"O Swallow, Swallow, flying, flying south,
Fly to her, and fall upon her gilded eaves,
And tell her, tell her, what I tell to thee,
O tell her, Swallow, thou that knowest each,
That bright and fierce and fickle is the South,
And dark and true and tender is the North."

ইহার সহিত সুইনবার্ণের দক্ষিণের সঙ্গীতের তুলনা করিতে বলিব,

"And the brown bright nightingale amorous
Is half assuaged for Itylus,
For the Thracian ships and the foreign faces,
The tongueless vigil, and all the pain."

দান্তে হইতে শুরু হইয়া প্রেমের নূতন ধারা পেট্রার্ক ও রঁসার প্রভৃতির কাব্যে প্রকাশিত হইয়া সেকস্পীয়রে গিয়া পূর্ণ বিকশিত রূপ ধারণ করিল। তবু ইহার পরেও পুরাতন গ্রীক ও রোমান ধারা আবার কিছুদিনের মত অংশত ফিরিয়া আসিল। ইহার কারণ রিনেসেন্সের একটা বড় দিক। ইহার ফলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনে একটা নূতন 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম' দেখা দিল, এবং এই 'ক্ল্যাসিসিজ্‌মে'র সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া প্রেমের পুরাতন ধারণা ফিরিয়া আসিয়া নূতন ধারণাকে কোণঠাসা করিতে না পারিলেও বেশ খানিকটা ছাপাইয়া উঠিল। রাসিনে যে উহার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার কথা বলিয়াছি। অন্য ধরনের প্রকাশ দেখা গেল চটুল আদিরসাত্মক রচনায়। ভল্‌তের জোয়ান-অফ-আর্ককে লইয়া অত্যন্ত বদ্‌রকমের রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্য আবার রোমান্টিক প্রেমকে ইউরোপীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল।

বাংলাদেশে নূতন প্রেম যে সেক্‌সপীয়র ও রোমান্টিক কাব্য হইতে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার মধ্যে সেক্‌সপীয়রের

প্রতি শ্রদ্ধা স্থপরিস্ফুট। তিনি 'কপালকুণ্ডলা'-র একটি বর্জিত পরিচ্ছেদে সেক্স-পীয়রকে 'সর্বজ্ঞ' সেক্সপীয়র বিশেষণ দিয়াছিলেন, 'বিষবৃক্ষে' প্রেমের কবি হিসাবে বাল্মীকি ও শ্রীমদ্ভাগবৎকারের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরচরিত সম্বন্ধে প্রবন্ধে সেক্সপীয়রের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"সেক্সপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন —কোন্ মহাত্মা না' বুঝেন?"

ইহার অপেক্ষাও বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রদ্ধার বেশী পরিচয় পাওয়া যায় 'রজনী' উপন্যাসের একটি জায়গায়। ইহাতে অমরনাথ একটি বই-এ সেক্সপীয়রের নায়িকাদের চিত্র দেখিয়া শচীন্দ্রনাথকে কি বলিলেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শচীন্দ্র-নাথের জবানীতে কথাগুলি এই,—

"সেক্ষপীয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য, মাধুর্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?"

'সেক্সপীয়র গ্যালারি' উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত, উহাতে সেক্স্‌পীয়রের নাটকের অন্তর্নিহিত মানসিক ঐশ্বর্য প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথের মুখ দিয়া নিজের যে বক্তব্য বলিলেন তাহার অর্থ আরও গুরুতর। কথাটা এই—চিত্র মাত্রই মনুষ্যচরিত্র বর্ণনার ব্যাপারে সাহিত্য অপেক্ষা হীন। ইহা সাহিত্য এবং সেক্সপীয়র, দুইএরই প্রতি শ্রদ্ধাপ্রসূত। সাহিত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা রোমান্টিক ধারার একটা মূলগত ব্যাপার, তাই রোমান্টিক যুগের চিত্রও অনেকাংশে সাহিত্যধর্মী।

চিত্রের মধ্য দিয়া যে সেক্‌সপীয়রের নাটকের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা যায় না, উহা আমি নিজেও স্ট্রাটফোর্ড-আপন্-এভনএর মিউজিয়ামে নাটকগুলির ঘটনা ও চরিত্র লইয়া যে চিত্রাবলী আছে, সেগুলি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। এই গ্যালারিতে স্যর জস্যুয়া রেনল্ডস্ ও রমনে হইতে আরম্ভ করিয়া ফোর্ড ও মিলে পর্যন্ত বহু

বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র ছিল। কিন্তু নাটকে যে মনোজগতের পরিচয় আছে তাহার তুলনায় উহার চিত্রে প্রকাশ আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে-যুগে মানুষের মনের অপরিসীম বিস্তার ও গভীরতার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন সেই মনোজগৎকে তাঁহার কাছে 'সেক্‌পীয়র গ্যালারি'র চিত্রের মত চিত্রে দেখাইবার চেষ্টাকে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ভালবাসার সন্ধান যে সেক্‌সপীয়র হইতে প্রধানত পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই শ্রদ্ধা ছাড়া অন্যত্রও আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'-র শেষে যেখানে গোবিন্দলালের শুকানো বাগান আবার প্রস্তুত করিবার কথা আছে সেখানে দুই-চারিটি গাছের নাম আছে যাহার এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য আছে। শচীকান্ত মাতুলের জীবনের দুঃখময়ী কাহিনী শুনিয়া গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান আবার তৈরী করিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন,—

"আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।"

বাঙালী জমিদারের বাগানবাড়ীতে (বাগানবাড়ী—যাহার সহিত কলিকাতার বাঙালীর মনের কোন্ ইতরতা জড়িত নাই ?) সাইপ্রেস ও উইলো গাছকে দুঃখের প্রতীক হিসাবে আনিবার ধারণা কোথা হইতে বঙ্কিম পাইলেন ? পাইয়াছিলেন সেক্‌সপীয়র হইতে ; সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

সাইপ্রেস সম্বন্ধে এই গানটি 'টুএল্‌ফ্‌থ নাইটে'র দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে আছে,—

"Come away, come away death,
And, in sad cypress let me be laid ;
Fly away, fly away, breath ;
I am slain by a fair cruel maid,
My shroud of white, stuck all with yew,
O ! prepare it,
My part of death, no one so true
Did share it."

আর উইলো সম্বন্ধে ডেসডিমোনার গান সকলেরই জানা,—

"The poor soul sat sighing by
a sycamore tree,
Sing all a green willow ;
Her hand on her bosom,
her head on her knee,
Sing willow, willow, willow :
The fresh streams ran by her,
and murmur'd her moans ;
Sing willow, willow, willow :
Her salt tears fell from her.
and soften'd the stones ;—
Sing willow, willow, willow," —ইত্যাদি।

কোথা হইতে নূতন ভালবাসা আসিল তাহার খানিকটা আভাস দিলাম। এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। কে আনিল? আনিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যুবক বঙ্কিমচন্দ্র, পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স্ক বঙ্কিম, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ তিলমাত্র নাই। এই তরুণ যুবা প্রায় রাতারাতি বাঙালীর মনে এই ভাববিপ্লব কি করিয়া আনিল তাহা মনে করিলে বিস্ময় বোধ হয়। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই ভাববিপ্লবের নূতনত্ব ও গৌরব বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহনের স্ত্রী' ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত হয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় পরের বৎসর ১৮৬৫ সনে। প্রথম বইটিতে স্ত্রীলোকের রূপ সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাহার পরিচয় পাইয়াছি। দ্বিতীয় বইটি খুলিলেই দেখা যায়, এক বৎসরের মধ্যে কি নূতন ধারণা দেখা দিয়াছিল। তিলোত্তমার রূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন,—

"তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা কোমলপ্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভবয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃপুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণপথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে

স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন।"

ইহার পর আর ভারতচন্দ্রের ধারায় রমণীর রূপ বর্ণনা করা—"কে বলে শারদ শশী এ মুখের তুলা, পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা", বা "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া", এই সব অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ছড়ানো হাস্যরসের অবতারণা করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে করা সম্ভব রহিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই স্টাইলে শুধু যে আশমানির রূপ বর্ণনাই করিলেন তাই নয়, পুরাতন সরস্বতীর এই ব্যাজস্তুতিও করিলেন—

"হে বাগ্‌দেবি!...হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণনা করিব। সমাসপটল, সন্ধিবেগুণ, উপমা-কাঁচকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব।...হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ, যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তররাম-চরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়া-ছিলেন, যে প্রকৃতি-প্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছে, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপ বর্ণনা করিব।"

এই কথা কয়টি পড়িয়া মনে হয় তাঁহার কাছে বাংলাদেশের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে একটি বুক্‌নী বেরসিকের উক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই উহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। উক্তিটি এই—"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব চ মাঘঃ ক্ব ভারবি?"

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে রমণীর রূপ নূতন চক্ষে দেখিতে শিখাইয়াছিলেন, সেই রূপকে নূতনভাবে পূজা করিতেও শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন রূপোন্মাদে যেমন সুখ আছে, তেমনই দুঃখ এবং বিপদও আছে। নবকুমার, প্রতাপ, ভবানন্দ রূপের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছিল। রূপোন্মাদের ভয়াবহ রূপ যে কি, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ভবানন্দের মুখ দিয়া যেভাবে বলাইয়াছেন, এত স্পষ্ট করিয়া আর কোথাও নিজে বলেন নাই। ভবানন্দ কল্যাণীকে

বলিতেছেন—

"দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন—চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ! যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি, দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?"

ইহার পরিণাম দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রমণীর রূপকে ভয়ের বশে ধিক্কার দিয়াছিলেন। কোন্ পুরুষের, সে যদি মানুষ হয়, রূপের ভয় নাই? ভয় কি শুধু পরপুরুষেরই, নারীর কি নাই? এই যন্ত্রণার কথাও বঙ্কিম রমণীর মুখে দিয়াছেন,—

"বহুমূর্তিময়ি বসুন্ধরে! বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে, থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে নারী জন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট-পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?

"না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয় মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

"আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।"

আমি অবাক হইয়া ভাবি, বঙ্কিমচন্দ্রকে এই অনুভূতি কে দিয়াছিল। শুধু

ইউরোপ হইতে আসিয়াছিল বলিলেই চলিবে না—গ্রহণের, আয়ত্ত করিবার, একেবারে নিজের করিয়া লইবার জন্য অসামান্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি বাঙালীর ক্ষুদ্রপরিসর, অগভীর, গতানুগতিক, সাধারণ মানসিক জগতে এক-জনের মধ্যে কি করিয়া আসিল? বৈষয়িক ব্যক্তিরা জড়চেতন ব্যক্তিরা বলিবে, ইহা কল্পিত অনুভূতি, মিথ্যা অনুভূতি। মূর্খের দল! লোকোত্তর অনুভূতি আর মিথ্যা অনুভূতি এক নয়। যদি আমরা মানসিক জীবনে আটপৌরেকে ছাড়াইয়াই না উঠিতে পারিলাম, তাহা হইলে দেহের উপর পোশাকী শাড়ী ও ফিনফিনে ধুতি চাপাইবার মূঢ়তা কেন? বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী হইয়া মানসিক জীবনে রূপের যে অনুভূতি আনিয়াছিলেন, তাহা যদি সমস্ত বাঙালী, এমন কি ছয় আনা বাঙালীও গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে বাঙালী জীবনের মানসিক কাঠামো চিরতরে বদলাইয়া যাইত।

রূপের পূজা বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে বাঙালী জীবনে আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা বজায় থাকে নাই, তাঁহার যুগেও অন্যের দ্বারা একান্তভাবে অনুভূত হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। আমি অনেক সময়েই ভাবি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জন্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সত্যকার গ্রহীতা তাহাদের মধ্যে ছিল কিনা। কিন্তু বাঙালী জীবনে রূপপূজার অস্থায়িত্বের কাহিনী পরযুগের ইতিহাস। এই বই-এ তাহার আলোচনা করিব না। এখানে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের রূপানুভূতির আর দুই-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। একটি তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'আনন্দমঠ' হইতে। তিনি শান্তির রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই,—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ তেমনই রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নত ভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি।"

ইহাকে এই বই-এর ৮৪।৮৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত নারীদেহের বর্ণনার সহিত তুলনা করিতে বলিব; তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র রূপানুভূতিকে কোথা হইতে কোথায় তুলিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এই রূপানুভূতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসে আছে। এখানে শুধু আর এক ধরনের দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়া রূপপূজার প্রবর্তন করিলেন সে প্রসঙ্গ শেষ করিব। এ পর্যন্ত যে কয়টি উপন্যাস হইতে রূপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলিকে সমসাময়িক বাঙালী জীবনের কাহিনী বলা যায় না। 'রজনী' সমসাময়িক জীবনের আবেষ্টনীতে স্থাপিত হইলেও নায়িকার অন্ধতার জন্য অন্য রকমের কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য বাঙালী জীবনে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যে ঘৃণ্যতম রূপের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ভালবাসার গৌরব দেখাইয়াছিলেন (৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), সেই কাঠামোর মধ্যেই রূপানুভূতির গৌরবের দৃষ্টান্তও দিব। এই গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র রূপের নূতন উপাসনাকে এমনভাবে দেখাইলেন, এমন জায়গায় রূপপূজার প্রতিষ্ঠা করিলেন, যেখানে এই ব্যাপার কল্পনা করাও কঠিন।

ইন্দিরা ডাকাতির পর আশ্রয়হীন হইয়া রামরাম দত্তের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি করিতেছে। এক সন্ধ্যায় পরিবেশন করিতে আসিয়া অপরিচিত স্বামীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, পরে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানাইয়া পত্রও লিখিল। তাহার স্বামীও পাচিকা মাত্র ভাবিয়া তখনকার দিনের রেওয়াজ মত এই প্রস্তাব গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। তিনি ইন্দিরার রূপের একটা আভাস পাইয়াছিলেন।

কিন্তু সে যখন রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেখা গেল কমিস্যারিয়্যাটের ঠিকাদারের রূপমোহও ঠিক পুরানো ঠিকাদারী স্টাইলের নয়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে শিখযুদ্ধে বাঙালী কনট্র্যাক্‌টরের মুসলমানী তবায়িফ-সাধনার ছোঁয়াচ-মাত্র নাই।

ইন্দিরা বলিতেছে,—

"বড় বড় কথায়, উত্তর দিবার তাঁহার অবসর দেখিলাম না। আমি উপযাচিকা, অভিসারিকা হইয়া আসিয়াছি,—আমাকে আদর করিবারও তাঁহার অবসর দেখিলাম না। তিনি সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একবার মাত্র বলিলেন, 'এমন রূপ ত মানুষের দেখি নাই'।"

তারপর ইন্দিরা যখন চলিয়া যাইতে উঠিল, স্বামী তাহার মল্লিকাকোরকের বালা পরা হাতখানা ধরিয়া যেন বিস্মিতের মত হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "দেখিতেছ কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "এ কি ফুল? এ ফুল ত মানায় নাই। ফুলটার অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।"

তাহারও পরে ইন্দিরা যখন চলিয়া যাইতে সত্যই উদ্যত হইল, তখন স্বামী—আপাতদৃষ্টিতে জার বা উপপতি হইয়াও হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—

"আমার কথা রাখ, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই। আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।"

আমাদের সমাজের পুরাতন পরিচারিকা-প্রীতির এই রূপান্তর কি কেহ প্রত্যাশাও করিতে পারিত? কিন্তু দেখিবার পর সকলেই কি এই নায়কের মত বলিবে না, "এমন কখনও দেখি নাই, এমন আর দেখিব না?"

বাঙালীর মানসিক জগৎ বঙ্কিমচন্দ্র রূপের বিভায় এমনও বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে সে তখন বলিতে পারিত,—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন প্রেমানুভূতির কথা বলিতে হয়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত 'ইন্দিরা' উপন্যাস হইতেই ইতিপূর্বে দিয়াছি, আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি 'রাধারাণী' হইতে। (এ দুইটির জন্য ৪৬/৪৭ পৃষ্ঠা দেখিবেন) কিন্তু ইহার উপরও একটু বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক আছে।

প্রকৃত ভালবাসা শ্রদ্ধা ভিন্ন আসিতে পারে না। প্রণয়ী বা প্রণয়িনী মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে যে, অন্য পক্ষের মধ্যে নীচতার আভাসমাত্র দেখিলেও প্রেম যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উপর শ্রদ্ধা ছাড়াও ব্যষ্টি-মুখীন শ্রদ্ধারও প্রয়োজন আছে। ভালবাসিবার জন্য, এমন কি ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্যও পুরুষের দিক হইতে নারীকে শ্রদ্ধা করিবার একান্ত আবশ্যক আছে। ইহা ছাড়া প্রেম বা প্রেমের অনুভূতি আসিতে পারে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই শ্রদ্ধা পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

প্রচলিত ধারণা এই যে, ব্রাহ্মসমাজই বাঙালী সমাজে নারীজাতি সম্বন্ধে নূতন শ্রদ্ধা আনিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মূলত রক্ষণশীল এবং হিন্দুভাবাপন্ন, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর নবহিন্দুত্বের স্রষ্টা হইলেও যেভাবে এই শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন ও প্রথাগত বাঙালী সমাজে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ছিল তাহার কঠিন সমালোচনা করিতে বঙ্কিম কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। এই সমালোচনার আরও উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, উহার লক্ষ্য হইয়াছিলেন যিনি, তিনি তাঁহারই নিজের

সাহিত্যগুরু, ঈশ্বর গুপ্ত। গুপ্ত কবির কবিতা সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় কথা কমই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, এবং উহার কারণ দিয়াছিলেন এই,—

"অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য ভাষা ব্যবহার না করিলে গালি পুরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।"

ইহার কারণ কি, বঙ্কিম সে-প্রশ্নেরও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদিগের আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক-একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়।"

কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছ হইতে পুরুষ সভ্য আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারে, এই ধারণাই বা বঙ্কিমচন্দ্র কোথা হইতে পাইলেন? বাঙালী সমাজে উন্নত চরিত্রের স্ত্রীলোক সেকালে ছিল না, এ কথা কেহই বলিবে না। কিন্তু সে সব চরিত্রে গুণ থাকিলেও বৈদগ্ধ্য ছিল না, আর সাধারণ বাঙালী নারীর চরিত্র অতিশয় রুক্ষ এবং অমার্জিত যে ছিল তাহাতেও সন্দেহ করা চলে না।

ইহার একটি চমৎকার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথে আছে। ফকিরচাঁদ মাখনলালের দুই স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করিল, "অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা পরা হাত খড়্গের মত খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, 'ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে'?" আর একটি কণ্ঠও "আরও দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্। তোর মরণ হয় না'?" এই ধরনের স্ত্রীলোকের কাছ হইতে পুরুষের শিক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। তবে ফকিরচাঁদও বিভিন্ন রকমের স্ত্রীলোক দেখিয়াছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপই চলিত বাংলা শোনা [ফকিরের] অভ্যাস ছিল না।" ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের স্ত্রীলোক।

"সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুসী ভালবাসে; এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সে-ও তেমনই এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর ও হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।"

আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোককে শ্রদ্ধা করিতে হইবে এই ধারণা, এবং স্ত্রীলোককে যে শ্রদ্ধা করা যায় এই ধারণা, দুইটি নূতনত্বের আবির্ভাব বাঙালী সমাজে প্রায় একই সঙ্গে হইয়াছিল। এই আবির্ভাবের মূলে অন্যেরা থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র একাই যে উহার পুরোধা তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা বাঙালী জীবনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তারের ফলে আসিয়াছিল।

সভ্যতা যে স্বয়ম্ভু নয়, এই কথা সত্য হইবার পর সভ্য নরনারীরা সহজেই ভুলিয়া যায়। আজকাল যে সকল তরুণীরা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদের অনেকেই জানেন না যে, দেড়শত বৎসর আগে তাঁহাদের সমবয়স্কারা শুধু যে মাতা হইয়া সাত দিকে সাত বেটাকে ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া ঘুরিতে দেখিতেন তাহাই নয়, নিজেরাও মাটির হাঁড়ির মত কালিমাখা রূপ লইয়া উনুনের উপর চড়িয়া থাকিতেন। তাঁহাদের লেখাপড়া সম্বন্ধে সেই যুগের একটি মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে—এই মদ্দা ঢেঁঠি ছুঁড়ি বেটাছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনই এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।"

আমার বাল্যকালেও এই পুরাতন ধারণা লোপ পায় নাই। কিশোরগঞ্জে আমাদের বাহিরের অঙ্গনে একদিন আমার ছোট বোন আমাদের সহিত ব্যাড-মিণ্টন খেলিতেছিল। পাশের রাস্তা দিয়া কয়েকটি স্কুলের ছেলে যাইতেছিল। তাহারা ব্যাপার দেখিয়া গাহিয়া উঠিল—

"মদ্দা মাগী, বেজায় ঘাঘী
বেহদ্দ বেল্লিক।"

ইহারা অবশ্য নারী সম্বন্ধে ধ্যানধারণা রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'খাস-দখল' হইতে পাইয়াছিল। নূতন ধারা কোথা হইতে আসিয়াছিল তাহার ইঙ্গিতও আছে, যে পুরাতন বাংলা বই হইতে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমতটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই। একটি শিক্ষার্থিনী মেয়ে বলিতেছে,—

> "তবে মন দিয়া শুন, দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।"

বইটি ১৮২২ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যে নূতন ধারা গ্রাম্যজীবন হইতে অতি গ্রাম্যভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণ বিকশিত রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল।

স্ত্রীজাতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা কিরূপ ছিল তাহার আরও ভাল পরিচয় পাই, ঈশ্বর গুপ্তের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যে। পনের বৎসর বয়সে দুর্গামণি দেবীর সহিত ঈশ্বরের বিবাহ হয়। বধূ তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি দেখিলেন, কন্যাটি হাবা-বোবার মত, প্রতিভাশালী কবির স্ত্রী হইবার উপযুক্ত নয়। তাই ঈশ্বর তাহার সহিত কথাও কহিলেন না, কিন্তু আর একবার বিবাহও করিলেন না। স্বামীগৃহেই দুর্গামণির সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন; দুর্গামণিও সচ্চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। এই সার্থকতাহীন দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের উক্তি অপরূপ। তিনি বলিলেন,—

> "এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেকে দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই।...
>
> "এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।"

স্ত্রীলোকের প্রতি কি শ্রদ্ধা থাকিলে এই ধরনের কথা বলা যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, শুধু নারীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়াই পুরুষের দুর্ভাগ্য নয়, ইহার উপরেও আর একটা দুর্ভাগ্য আছে—তাহা ভালবাসিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হওয়া।

নইলে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের জন্যই বেশী দুঃখ করিতেন না।

ইহা ছাড়া এই শ্রদ্ধা প্রকাশের মধ্যেই প্রসঙ্গত আর একটা ইঙ্গিতও ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ইঙ্গিত ভালবাসার তীব্রতম অনুভূতির। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই অনুভূতির পরিচয় দিবার আগে আর একটা প্রশ্নের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুভূতি কি করিয়া পাইলেন? এই ধরনের অনুভূতি স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া তাহাকে না ভালবাসিলে কাহারও সাধারণত আসিবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা যৌবনে হইয়াছিল, তাঁহার জীবনীতে এই ধরনের কোন্ সংবাদ নাই।

বঙ্কিমের সামাজিক ও বিবাহিত জীবন সেকালের গতানুগতিক ধারার বাহিরে যায় নাই। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় ১৮৪৯ সনে, নিজের এগার বৎসর বয়সে, এবং পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ের সহিত। এই পত্নী ১৮৫৯ সনের শেষের দিকে পনের বৎসর বয়সে মারা যান। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স একুশ। ইহার পর পত্নীবিয়োগের ছয়-সাত মাসের মধ্যেই, ১৮৬০ সনের জুন মাসে তিনি আবার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর সহিতই বঙ্কিমের প্রকৃত দাম্পত্য জীবন যাপিত হইয়াছিল। ইঁহার কথা পরজীবনে বঙ্কিম এইভাবে লিখিয়াছিলেন,

> "আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।"

এই বিবরণ সুখী ও সার্থক বিবাহিত জীবনের বিবরণ। কিন্তু ইহাতে পতিপত্নীর মধ্যে একাত্মতা, স্নেহ ও পরস্পর-নির্ভরতা যতই থাকুক না কেন, ভালবাসার অবকাশ, যে-ভালবাসাকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বাঙালীর জীবনে ও অনুভূতিতে আনিয়াছিলেন সেই ভালবাসার অবকাশ আছে কিনা তাহা প্রশ্নের বিষয়। এমন কি ইহাও আমি বলিব, এই স্তরের দাম্পত্য জীবনেও যদি উহা প্রথাগত ধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে, পাতিব্রত্যের নূতন অনুভূতি পর্যন্ত আসিতে পারিত কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। পাতিব্রত্যের এই অনুভূতিও বঙ্কিমচন্দ্রই যে বাঙালী জীবনে আনিয়াছিলেন ইহা আমি বলিয়াছি। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী চরিত্রে উহার প্রথম প্রকাশ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সূর্যমুখী চরিত্র তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীকে দেখিয়াই আঁকিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নয়, কারণ বঙ্কিম যখন

'বিষবৃক্ষ' লেখেন, তখন তিনি দশ-বারো বৎসর দ্বিতীয়া স্ত্রীর সহিত গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সম্ভব যে, রাজলক্ষ্মী দেবীকে সূর্যমুখী অনুরূপ বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজের চেষ্টায় কল্পনার আদর্শ পত্নী ও সংসারের জীবিত পত্নীকে এক করিয়াছিলেন। যে সূর্যমুখী সত্যভামার তুলাব্রতের ছবির নীচে এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছিল,—"যেমন কর্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে সোনারূপার তুলা?"—সেই সূর্যমুখীর পাতিব্রত্য সেকালের বাঙালী সমাজে প্রচলিত পাতিব্রত্যের গতানুগতিক ধারা হইতে আসে নাই।

যে সমাজে বঙ্কিম বড় হইয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বাস করিতেন, তাহাতে যদি হিন্দু পাতিব্রত্যের অনুভূতিই না থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে নূতন ভাল-বাসার বীজ পর্যন্ত থাকিবার কথা নয়। তাহার উপর ইহাও মনে রাখা দরকার, স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়া হইয়াছিল। এই ধরনের বিবাহের ভিতর দিয়া দাম্পত্য জীবন যেভাবে গড়িয়া উঠিত, তাহাতে প্রেম দেখা দিবার অবকাশ যে কত কম, তাহা রবীন্দ্রনাথ 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—নিবারণচন্দ্র "যখন প্রথম বিবাহ করিয়া ছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভাল-বাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।" অথচ এই সচেতন সঞ্চারই প্রেমের সুখের প্রধান অবলম্বন।

ইহা ছাড়া বাল্যবিবাহের ফলে প্রেমের সঞ্চারে বাধা ঘটিবার একটা মূলগত কারণও ছিল। ইহার কথা বলিলে পাঠক-পাঠিকা হয়ত আশ্চর্য হইবেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা অসঙ্গত নয়। প্রথম পরিচ্ছেদে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, কাম ও প্রেম অবিচ্ছেদ্য, কামই প্রেমের প্রকাশে দৈহিক বা জৈব প্রেরণা। কিন্তু এই প্রেরণার ধাক্কায় কাম আর নির্জলা কাম থাকে না, আরও গভীর, আরও বড়, আরও মধুর একটা জিনিসে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের জন্য দেহকে দৈহিক উপভোগ হইতে কিছুকাল বঞ্চিত থাকিতে হয়। কিন্তু বাল্যবিবাহে দেহ বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপ-ভোগের জন্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া যায়। তাই প্রেমের প্রেরণা যোগাইবার আগেই উহা কামের অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে বিবাহিত জীবনে সত্যকার প্রেমানুভূতির পথে বাধা জন্মে বা জন্মিতে পারে।

বাঙালী জীবনে ভালবাসার পরবর্তী ইতিহাস বিবেচনা করিলে এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। উহাতে ভালবাসা যে দেখা দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। অথচ এই ভালবাসা বিবাহিত জীবনেই, অর্থাৎ বিবাহ হইবার পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল, দেহসম্পর্ক-বর্জিত পূর্বরাগের মধ্যে হয় নাই। এটা কি করিয়া সম্ভব হইল ? দেহের উপভোগ গোড়া হইতে হইলে যদি ভালবাসার পথে বাধাই জন্মে, তাহা হইলে বাঙালীর বিবাহিত জীবনে দেহভোগের সম্পূর্ণ অবকাশ ও স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া সেই ভালবাসা, যাহা পূর্ণ বিকশিত হইবার জন্য বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছিন্ন থাকার অপেক্ষা রাখে, তাহার আবির্ভাব সম্ভব হইল ?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে নবযুগের বাঙালীর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যতটা সাক্ষ্য ও স্পষ্টোক্তি থাকিলে এ বিষয়ে আলোচনাও সম্ভব হইত তাহা নাই, পাওয়াও যাইবে না। উপন্যাসে এবং গল্পেও এই প্রসঙ্গের, অর্থাৎ সহবাসের সহিত ভালবাসার সংঘাত বা মিল এই প্রশ্নের, অবতারণা করা হয় নাই। সাধারণত বিবাহের পরবর্তী ভালবাসাকেও পূর্বরাগ বা 'কোর্টশিপে'র মতই দেখানো হইয়াছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর একরাত্রি একসঙ্গে যাপন করিয়াছিল। প্রফুল্লের বয়স তখন আঠারো, ব্রজেশ্বর বাইশ। দুইজনের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর, এক-পক্ষে পূর্ণ আসক্তি আছে, আর এক পক্ষে আসক্তির সঞ্চার হইতেও দেরি হয় নাই। এ অবস্থায় দুই পক্ষের একত্র রাত্রিযাপন কতদূর গিয়াছিল ? পরবর্তী যেসব কথা আছে, দুইজনের ভালবাসার যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে এই অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে সহবাস হয় নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' হইতে। রমেশ যখন কমলাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া জানিয়াই বাড়িতে লইয়া আসিল, তখন কমলা বালিকা নয়। তাহাদের দুইজনের ব্যবহারও স্বামী-স্ত্রীর মত। যেমন, "রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে",—ইত্যাদি। এই আচরণ কতদূর গিয়াছিল ? যদি 'কোর্টশিপে'র সীমা অতিক্রম করিত, তাহা হইলে কমলার আসল পরিচয় পাইবার পর তাহাকে পত্নীভাবে না দেখিবার চেষ্টা রমেশ নিশ্চয়ই করিত না, কমলার প্রকৃত স্বামীকে বাহির করিবার চেষ্টাও করিত না, কর্তব্যবোধে দুর্ঘটনার ব্যাপারটাকে অবান্তর মনে করিয়া

কমলাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লইত। কিন্তু এই প্রশ্নের আভাসমাত্র বইটার এই স্থলে রবীন্দ্রনাথ দেন নাই, রমেশ ও কমলার সম্পর্ককে স্পষ্ট ভাষায় কোর্টশিপের মত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবনের হিসাব লইলে বিবাহিত জীবনের মধ্যে ভালবাসার অনুভূতির প্রশ্নটা আরও জটিল হইয়া উঠে। তিনি এগার বৎসর বয়সে পাঁচ বৎসরের যে বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে যখন মারা যায় তখন তাহার বয়স পনের, বঙ্কিমের একুশ। এই বয়সে দাম্পত্য জীবনে সহবাস না হইবার কথা নয়। বাঙালী জীবনের যে ধারা ছিল তাহাতে উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হইত। আঠারো বৎসরের স্বামী ও তেরো বৎসরের স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সংবাদ আমিও জানি। কিন্তু বঙ্কিমের প্রথম বিবাহিত জীবনে কি প্রেমের অনুভূতিও ছিল? আমি এই কথা বলিব, প্রথম পত্নীর প্রতি তীব্র ভালবাসা জন্মিয়া থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের মধ্যেই আর একবার বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে এগার বৎসর হইতে বিবাহিত জীবনে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিম প্রেমের অনুভূতি কোথা হইতে কি ভাবে পাইলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহিত জীবন হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার কোনও উপায় নাই, মানসিক জীবনের ইতিহাস হইতে হয়ত পাইতাম, কিন্তু সেই ইতিহাস অলিখিত রহিয়া গিয়াছে—বঙ্কিম রুশোর মত 'কনফেশ্যন্স্' লেখেন নাই।

তবু বিবাহ, এমন কি বাল্যবিবাহ সত্ত্বেও ভালবাসা যে আসিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। গল্পে বিবাহের পরে উহাকে আনিবার জন্য পূর্বরাগের বদলে একটা 'উত্তররাগ' আনা হইয়াছিল। আমি আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে উহাকে Post-marital courtship বলিয়া বর্ণনা করি। উহার মধুরতম বিবরণ আমি 'নৌকাডুবি'তেই পড়িয়াছি। তাহা উদ্ধৃত করিব।

> "এই সকল কাজকর্মের অবকাশে রমেশ প্রণয়চর্চ্চায় অমনোযোগী ছিল না। যদিও পূর্ব্বে যেমন শুনা গিয়াছিল বধূ তেমন বালিকা নয়, এমন কি গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিকবয়স্ক বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল, তবু ইহার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাস-করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে-উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট

মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রমেশ এই কারণে তাহার বালিকা পত্নীকে "উপলক্ষ মাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে, কল্যাণীকে পূর্ণ মহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।" আমি যাহাকে 'উত্তররাগ' বলিয়াছি, তাহার স্বরূপ ইহার অপেক্ষা গভীর ভাবে ও মর্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করা যাইত না।

এই 'উত্তররাগ' বাস্তব জীবনেও যে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। Post-marital courtship বলিয়া জিনিসটাকে আমাদের আধুনিক বিবাহিত জীবনের অঙ্গ বলিয়া মানিতে হইবে। হয়ত বা উহাতে বা বাস্তবক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভের অভাব থাকাতে রোমান্টিক প্রেমের পূর্ণ জোয়ার আসিত না, তবু একটা না একটা জোয়ার যে আসিত তাহা নিশ্চিত।

কিন্তু আমার কাছে ইহাও প্রায় নিশ্চিত যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রবর্তিত প্রেমের ধারণা স্বকীয় বিবাহিত জীবন হইতে পান নাই। তবে কোথা হইতে পাইলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পগুলিতে প্রেমের, বিশেষ করিয়া ব্যর্থ প্রেমের তীব্র অনুভূতি দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, তাঁহার জীবনে দাম্পত্য জীবনের বাহিরে কাহারও প্রতি প্রণয় জন্মিয়াছিল, এবং ইহার ফলে প্রবৃত্তি ও কর্তব্য এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিয়া তিনি প্রেমের সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবনে এক-আধটা অপরাধ বা দোষ সম্বন্ধে ইঙ্গিত বঙ্কিম নিজেও করিয়াছেন। কিন্তু এই দোষ নারী-সংক্রান্ত তাহা মনে করিবার বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি আছে। প্রথমত, দাম্পত্য কর্তব্য সম্বন্ধে—তা সে স্ত্রীর দিক হইতেই হউক বা স্বামীর দিক হইতেই হউক—বিবেকবুদ্ধি এত দৃঢ় ছিল যে, পরনারী সম্বন্ধে আত্মসংযম করিতে না পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয়ত, তিনি বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল; তৃতীয়ত, তখনকার বাঙালী সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার সুযোগ এত কম ছিল যে, তাহাতে নিতান্ত কামজ পদস্খলন ছাড়া প্রণয়ের ব্যাপার ঘটিবার কথা নয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন হইতে তাঁহার প্রেমানুভূতির সূত্র বাহির করা কঠিন।

কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই উহার উৎস খুঁজিবার কোনও কারণ আছে কি ? মনে প্রেমের ধারণা, এমন কি প্রেমের অনুভূতি পর্যন্ত আনিবার জন্য শরীরী পাত্র ও শরীরিণী পাত্রীর একান্তই আবশ্যক, এই কথা কেন বলিতে হইবে ? মানুষের ভালবাসা ও ভক্তির গভীরতম, তীব্রতম এবং সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অনুভূতি হইয়াছে যাঁহার সম্বন্ধে তিনি তো ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, তিনি ভগবান। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষিক প্রেমই অমানুষিক ঈশ্বরপ্রেমকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যদি হয় তবে নরনারীর প্রেমের তীব্রতম অনুভূতির জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্যক, এই যুক্তি কেন মানিতে হইবে ? জৈব প্রয়োজনে যেদিন হইতে জীব স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয় হইয়াছে, সেদিন হইতেই পরস্পরের দেহের অনুসন্ধানও তাহার ধর্ম হইয়াছে। এই ধর্ম জৈবস্তরে দেহকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু মানুষের মন থাকাতে উচ্চতম মানসিক স্তরে উহা দেহ-নিরপেক্ষ নারী বা পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায় পরিণত হইয়াছে। আমরা আসলে এই দেহোত্তর সত্তাকেই ভালবাসি, আর আমাদের দেহাবলম্বী লৌকিক ভালবাসা শুধু সেই দেহোত্তর ভালবাসাকেই একটুখানি দেহাবলম্বী করিয়া বুকে চাপিয়া রাখিবার প্রয়াস মাত্র। আসল ভালবাসা মনে, দেহ শুধু উপলক্ষ। তাই গভীরতম প্রেম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও হইতে পারে।

কিন্তু এইভাবে প্রেমকে অনুভব করিতে হইলে মানসিক শক্তি বা প্রতিভার আবশ্যক আছে। প্রতিভা বলিতে লোকে সাধারণত বুদ্ধি বুঝে, কল্পনা বা আবেগের শক্তিকে হিসাবের মধ্যে আনে না, আংশিকভাবে আনিলেও খুব বেশী জোর দেয় না। কিন্তু আমি বলিব, এই দুই-এর শক্তিও বুদ্ধির প্রখরতার মতই প্রতিভা।

এখানে কিন্তু বাংলা (বা সংস্কৃত) 'কল্পনা' ও 'আবেগ' এই দুইটি শব্দ উপযুক্ত নয়। আমার মনে যে বৃত্তি-দুইটির ধারণা আছে তাহার জন্য প্রকৃত শব্দ ইংরেজী 'imagination' ও 'passion'। বাংলায় 'কল্পনা' সাধারণত অলীক ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, আর 'আবেগ' বলিলে একটা সাময়িক মানসিক উত্তেজনা বা ঝোঁক বোঝায়। ইংরেজী কথা দুইটি যে বৃত্তির সূচক সেগুলি আরও উচ্চ, শক্তিমান ও স্থায়ী। এই 'imagination' ও 'passion'-এর কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটিতে সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়—এমন তফাৎ যে, এই দুই শক্তির মাপে বড় ও ছোটকে সম্পূর্ণ দুই স্তরের মানুষ বলিয়া মনে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বুদ্ধিতে

প্রতিভাশালী, 'imagination' এবং 'passion'-এও তেমনই প্রতিভাবান ছিলেন। মানুষের চরিত্রে এই দুইটা জিনিসের একত্র সমন্বয় কম হয়। তাঁহার ক্ষেত্রে হইয়াছিল ; তাহাও অতি উচ্চস্তরে।

এইসব কথা বিবেচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমানুভূতি সম্বন্ধে আমি একটা থিওরি খাড়া করিয়াছি, আমার কাছে উহাকে গোঁজামিল বলিয়া মনে হয় না। সহজ কথায় বলিতে গেলে, ব্যাপারটা আমার মতে এইরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রেমের প্রথম ধারণা আসিয়াছিল ইংরেজী সাহিত্য হইতে ; তাঁহার passional potential অতি বিস্তৃত ও শক্তিমান হওয়াতে এই ধারণা অনুভূতিতে ও অনুভূতি প্রেমের তৃষ্ণাতে পরিণত হয়। কিন্তু অন্যদিকে একটা ব্যর্থতার অনুভূতিও আসিয়াছিল। বাঙালী সমাজ যেরূপ ছিল, এবং বঙ্কিমের বিবাহিত জীবন যেরূপ ছিল, তাহাতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই তৃষ্ণা মিটাইবার কোনও উপায়ই ছিল না। জীবনে ভালবাসা আনা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, এবং এই না পাওয়ার জন্যই তাঁহার ভালবাসার অনুভূতি বাধা-পাওয়া জলের স্রোতের মত আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সংক্ষেপে বলিব, এই অনুভূতি শুধু ভালবাসাকে লইয়া চিরজীবনের পূর্বরাগ ও চিরজীবনের বিরহ। পূর্বরাগের সুখ ও বিরহের যন্ত্রণা—এই দুইই বঙ্কিমের ভালবাসিবার অনুভূতিকে ব্যাপিয়া আছে। দান্তে দেখিয়া ও ভালবাসিয়া, কিন্তু ভালবাসার পাত্রীকে না পাইয়া 'ইনফার্ণো', 'পুরগাতোরিও' ও 'পারাদিজো'—এই তিনকে সম্বন্ধ করিয়া মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসার পাত্রীকে না দেখিয়াই শুধু ভালবাসাকে ভালবাসিয়া উহাকে না-পাইবার দুঃখ হইতে প্রেমের তেমনই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা যে সম্ভব তাহা বিশ্বাস করাইবার জন্য পাঠককে শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দিব। প্রেমের প্রকাশ তাঁহার কাব্যে যেভাবে হইয়াছে, সেই প্রকাশকে সেক্‌স্‌পীয়র, দান্তে, রাসিনের বর্ণনাও ছাড়াইয়া যায় নাই। তবু একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে এই ধরনের ভালবাসাকে পান নাই। তাঁহার বিবাহ হয় বাইশ বৎসর সাত মাস বয়সে বারো বৎসর বয়সের একটি বালিকার সহিত। ইহার পাঁচ বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত করেন—'মায়ার খেলা' নিরাশ ও ব্যর্থ প্রেমের কাব্য ও গান। প্রেম না পাওয়ার দুঃখই উহার সমস্তটা জুড়িয়া আছে। উহার শেষ ও চরম উক্তি এই—

"কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে।"

*　　　*　　　*

হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও—
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে—
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।"

সাতাশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের এই যে দুঃখ ও ব্যর্থতার এই যে অনুভূতি তাহা সারাজীবন ব্যাপিয়া ছিল। সারাজীবন ধরিয়া তিনি শবরীর প্রতীক্ষার মত প্রতীক্ষা করিয়া ভালবাসার জন্য বসিয়াছিলেন, সে ভালবাসা তাঁহার জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত আসে নাই। বৎসরের পর বৎসর তিনি গাহিয়াছিলেন,

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে—"

আর ফিরিয়া ফিরিয়া ইহাই অনুভব করিয়াছেন.

"আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে আছি রে।"

সুতরাং ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই ভালবাসার তীব্রতম অনুভূতি আসিতে পারে, এই কথাটা অবিশ্বাস্য মোটেই নয়। কিন্তু প্রেমের অনুভূতি যে ভাবেই আসিয়া থাকুক, প্রেমের প্রকাশ যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বন্যা বাঙালীর জীবনে আগে কখনও আসে নাই, বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াও নয়। ইহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ভালবাসার অপরাজেয়, নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাদায়ক শক্তির কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই আছে। প্রথমেই তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' (পুস্তকাকারে ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত) হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিব। সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী শ্রীর স্বামী-পরিত্যক্ত জীবনেও স্বামীর প্রতি ভালবাসার পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"জয়ন্তী। তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা-সাক্ষাৎ নাই বলিলেই হয়—এত ভালবাসিলে কিসে ?

"শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয়দিন ঈশ্বরের সহিত তোমার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে ?

"জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি।

"শ্রী। যেদিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।"

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল,

"যদি একত্র ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর-প্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর, জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।

"শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।"

ইহা পড়িবার পর কে বলিবে—প্রেমের যে মহিমা বিরহে, মিলনের সুখ তাহার কাছেও যাইতে পারে? বাঙালী মেয়ের মুখে এই সব কথা দিয়ে যিনি পাঠককে বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের বিশ্বাস কত দৃঢ়!

ইহার পর প্রেমের দুর্নিবার শক্তির অনুভূতি দেখাইবার জন্য বঙ্কিমের আর একটি উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত করিব। এটিকে কেহই তাঁহার বড় উপন্যাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাইবে না, তবু ইহাতেই প্রেমের কি প্রকাশ পাই! তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স একত্রিশ বৎসর। প্রেমের এই প্রকাশ হইয়াছে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথাবার্তায়। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অসতী মনে করিয়া রাগে-দুঃখে অধীর হইয়া বসিয়া আছেন। মনোরমা তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিছুক্ষণ এই প্রশ্ন এড়াইবার চেষ্টা করিয়া মনোরমাকে

নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন,

"আমার দুঃখ কি ? দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছি।"

মনোরমা বলিল,

"বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেমচন্দ্র উত্তর দিলেন,

"ভালবাসিতাম।"

বর্তমানের পরিবর্তে অতীত কাল ব্যবহার করাতে মনোরমা বিরক্ত হইল, বলিল,—

"ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।"

হেমচন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি প্রতারণা করিলাম ?"

মনোরমা কহিল,

"ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন ? কি ? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে ? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে।'

বলিতে বলিতে আরও উত্তেজিত হইয়া মনোরমা কহিতে লাগিল—

"এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার ঝরিয়া আগুন নিবান যায় ? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক!"

মনোরমা হেমচন্দ্রকে আরও বুঝাইতে লাগিল,—

"তুমি পুরাণ শুনিয়াছ ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন ; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি ? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ ; ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটাবিহারিণী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দন্তের

অবতার স্বরূপ! সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।"

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?"

মনোরমা উত্তর দিল—,

"পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না প্রণয় অমূল্য! ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।"

মনোরমার মুখে এই সব কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের সন্দেহ হইল সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছে এবং সে ভালবাসা সমাজ ও নীতিবিরুদ্ধ। তাই হেমচন্দ্র মনোরমাকে সতীত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভালবাসার পাত্রকে ভুলিতে বলিলেন। ইহাতে মনোরমা উচ্চহাস্য করিয়া পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল। রাজপুত্র কিছু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন?"

ইহার পর যে কথাবার্তা হইল তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিব।

"মনোরমা কহিলেন, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।"

"হে। কেন?"

"ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন?"

"হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।"

"ম। আর, সে যদি দংশন না করিত? তবে কি তাহাতে ভুলিতে?"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিল—

"তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু তুমি ভুলিতে পারিতেছ না, আমি, আমি ত পাগল—আমি আবার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব?"

প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভূতির এর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম

না ; যদিও একটি দৃষ্টান্তের জায়গায় আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত অতি সহজেই দিতে পারিতাম। বাঙালী জীবনে রমণীর আবির্ভাবের কাহিনী শেষ করিলাম। ইহার পরের ইতিহাস বলিতে পারিব কিনা জানি না। তবে শুধু আবির্ভাবের কথা বিবেচনা করিয়াই বলিব, উহাতে যেন আগমনীতেই বিসর্জনের সুর বাজিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কাহিনীর শেষ কথা যা, প্রেমের কাহিনীর শেষ কথাও তাই—"বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত বুঝিয়াছিলেন, যে-শক্তি থাকিলে ভালবাসাকে জীবনে আনা যায়, সেই শক্তি বাঙালী-চরিত্রে নাই। "বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা কখনও বাঙালীর বশীভূত নয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমের নাটক বিয়োগান্ত নাটক। প্রমেথিয়ুস মানুষের জন্য আগুন আনিয়া দিয়া যেমন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর জীবনে প্রেমের আগুন আনিয়া নিজেও সেই যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

প্রেম—সাহিত্যে ও জীবনে

এই বই-এ যাহা বলা হইল তাহা পড়িয়া অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন—ইহা কি জীবনের কথা, না সাহিত্যের কথা? বাঙালীর জীবনে রমণীর কথা বলিতে গিয়া শুধু এক ধরনের সাহিত্যিক আলোচনা করার সার্থকতাই বা কি? সাহিত্য কল্পনা-জগৎ সৃষ্টি করে, সাহিত্যে যাহা থাকে জীবনে তাহা নাও থাকিতে পারে; সাধারণ লোকে তাহাদের মামুলী বুদ্ধিতে সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্বন্ধই বুঝিতে পারে না; তাহারা বলে দৈনন্দিন প্রথাগত জীবনই বাস্তব, উহাই সত্য, বাকী সব মানসিক বিলাস। একদল লোক আবার আরও দূরে যান; তাঁহারা বলেন, যাহা কিছু কুৎসিত, কলঙ্কিত ও কদর্য তাহাই বাস্তব; যাহা কিছু সুন্দর, পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় তাহাই কল্পিত। তাই নরনারীর প্রসঙ্গে রিরংসার উদ্দীপক গল্পই তাঁহাদের কাছে একমাত্র সত্য।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই নরনারীর সম্পর্কের এই রূপ লইয়াই বেশী আলোচনা হয় এবং রচনা প্রকাশিত হয়। এই বাস্তববাদ বাংলা সাহিত্যেও দেখা গিয়াছে। এই সব গল্প-উপন্যাসের লেখকেরা যদি বলিতেন যে, তাঁহারা এই সব বর্ণনা সরবরাহ করিয়া পয়সা করিতে চান, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তিই হইত না। নিজের ব্যবসা চালাইয়া পেট গুজরান বা টাকা করিবার অধিকার বেশ্যার আছে, এ কথা আমি মানি। সুতরাং আমি আমাদের ছুঁৎমার্গীয় কংগ্রেসী নীতিবাদীদের উদ্দেশে বলি,—

বেশ্যাবাড়ী ধ্বংস ক'রে
করছে এ কি কংগ্রেসী?
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

তেমনই লেখক-বেশ্যাদেরও ব্যবসা চালাইবার অধিকার আছে, এই কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব। তাঁহারা যত চান তত সাক্ষাৎ বা ইঙ্গিতমূলক নরনারীর সঙ্গমের বর্ণনা দিতে থাকুন। ইহারা যেমন বিক্রেতা, তেমনই খরিদ্দারও থাকুক।*

---

* লেখক নানা স্তরের, পাঠকও নানা স্তরের। সুতরাং এক স্তরের আর এক স্তরের সহিত ঝগড়া করা উচিত নয়। বহু কাল আগে লর্ড চেস্টারফিল্ড লিখিয়াছিলেন,

"Let blockheads read what blockheads wrote."

মুশকিল হয় এক স্তর আর এক স্তরের অধিকার অস্বীকার করিলে। সাধারণত ছোটলোক ভদ্রলোক সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়, ভদ্রলোকের এই অনুদারতা দেখানো উচিত নয়!

কিন্তু আমি প্রবল আপত্তি করিব যদি এই সব কাহিনীর লেখকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সরল অন্তঃকরণে স্বীকার না করিয়া সমাজতত্ত্ব, দর্শন বা আর্টের ভড়ং চালান। আমি ধাপ্পাবাজি ভালবাসি না। অথচ এই রচনার সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহার প্রায় সবটুকুই ধাপ্পা। সাধারণত এই ব্যাপারে দুইটা সাফাই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম সাফাই এই যে, এই শ্রেণীর লেখকেরা নরনারীর সম্পর্ক লইয়া অলীক ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে চান না, শুধু সত্যপ্রচার করিতে চান। দ্বিতীয় সাফাই এই যে আর্টে সঙ্গমের বর্ণনার স্থান আছে; শুধু তাই নয়, ইহাই আর্ট, সুতরাং তাঁহারা আর্টের পূজারী।

দুইটা দাবিই বড় রকমের দমবাজী, তাহা সে-দাবি যাহারই মুখ হইতে আসুক না কেন। আমি পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহিত্যিক মহারথীদের নাম করিলেই ভয় পাইবার লোক নই। নরনারীর সম্পর্কের বর্ণনা ও বিবরণ কি ভাবে সাহিত্যে দেওয়া যাইতে পারে এবং কার্যত কিভাবে কেন নানা ধরনের বর্ণনা ও বিবরণ দেওয়া হয়, তাহা আমি জানি। এই নূতন ফ্যাশন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

তবে আমার বক্তব্য নূতন নয়, চল্লিশ বৎসর পুরাতন। যে জিনিসটাকে চলিত ভাষায় সাহিত্যে 'অশ্লীলতা' বলা হয় উহা বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যেও নূতন নয়। অভদ্র সাহিত্যে উহা বরাবরই ছিল, কিন্তু ভদ্রসাহিত্যে উহা আধুনিক কালে মোটেই দেখা যাইত না। ভদ্রসাহিত্যে আর্টের নামে বাংলা দেশে উহা সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৬-২৭ সনে। কয়েকজন অল্পবয়স্ক বাঙালী লেখক হঠাৎ এ বিষয়ে অর্ধ-খোলাখুলি ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন।* তাঁহাদের অনেকেই এখন প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছেন, সুতরাং সেই ধরনের লেখা আর লিখিতে পারেন না, আর লিখিলেও তাহাতে সেই জোর থাকিবার নয়। তাই তাঁহারা তাঁহাদের সেই সব লেখাকে বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন যুগ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। নারী সম্বন্ধে অল্প বয়সের উগ্র জাগরূকতা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু বার্ধক্যের ওকালতি আমার কাছে হেয় মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের সেই যুগে আমিও যুবকই ছিলাম, সুতরাং সেই সব লেখা পড়িয়া আমারও আমেজ আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেই বয়সেও আমি উহার-

---

* 'অর্ধ-খোলাখুলি' বলিলাম এই জন্য যে, ইঁহাদের কেহই পয়সার জন্য এই সব বর্ণনা দেন নাই, দিতেন অমানুষিক ও আন্তরিক কামজ উত্তেজনা হইতে, সুতরাং একেবারে কাপড় ছাড়িতে পারেন নাই। পেশাকর না হইলে কেহই স্বাভাবিক হায়া-লজ্জা ষোল আনা কাটাইয়া উঠিতে পারে না।

নূতনত্ব লইয়া অভিভূত হইয়া পড়ি নাই। তাই উহার ওকালতিতে বিশ্বাস না করিয়া, উহার দাপটে ভীত না হইয়া, একটি প্রবন্ধে এই ঢং লইয়া একটু হাসি-তামাশাই করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৩৩৪ সনের চৈত্র সংখ্যা "শনিবারের চিঠি"তে। তখন আমিই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। এই লেখাটির বক্তব্য ও ধরন-ধারন আজও হয়ত সময়োপযোগী মনে হইবে। তাই তামাদির ভয় না করিয়া উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রত্যেকটি কথাই তখন লেখা।*

সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আলোচনা

(শনিবারের চিঠি, ১৩৩৪, চৈত্র ; ইং ১৯২৮ সন)

॥ ১ ॥

"The thing that hath been, it is that which shall be ; and that which is done is that which shall be done ; and there is no new thing under the sun,

"Is there anything where of it may be said, See, this is new ? It hath been already old time, which was before us.

Ecclesiastes. Ch, I, vv. 9- 10.

আজ আর আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকরা কিছু ন'ন একথা বলিবার জো নাই। তাঁহারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্‌কোরা নূতন একটা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত সত্যের তুলনায় আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অতি পুরাতন কথার চর্বিত-চর্বণ মাত্র। বিদ্রোহ-পন্থীরা বলেন, সাহিত্যে অশ্লীলতার স্থান আছে। তাঁহাদের প্রবন্ধাদি হইতে আরও জানিতে পারিলাম, স্বয়ং কালিদাস নাকি তাঁহার কাব্যে সম্ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন, এমন কি সেক্‌সপীয়রও নাকি স্যার টোবি বেল্‌চের মারফৎ বলিয়াছেন—রুচিবাগীশেরা যাহাই বলুক মদ ও মেয়েমানুষ পৃথিবীতে বরাবরই ছিল, বরাবরই আছে, বরাবরই থাকিবে। এই আবিষ্কারে তরুণ সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকমহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। কেহ তরুণ

* 'শনিবারের চিঠি'র স্বত্বাধিকারীরা আমাকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করিতে দিয়াছেন ও শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইহা নকল করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বিপ্লববাদীদের গবেষণার প্রশংসা করিতেছেন, কেহ তাঁহাদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাদের স্পষ্ট-বাদিতা, সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

আজ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, জননী বঙ্গভূমি। আর তোমার কিসের দুঃখ, মা! তোমার সন্তানের তপস্যায় আজ দেশে শ্লীলের, নীতির, ধর্মের—ভূতের, ভগবানের, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে'র মোহ ঘুচিল।

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল টুটিল মোহকারা
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই—"

ভারত তবু কই? ভারত তবু কই, অন্তত বাংলাদেশে তবু কই বলিয়া আক্ষেপ করিবার অধিকার আর আমাদের নাই। বাঙালীর ছেলেও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে জানে। সে মৌলিক গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে সাহিত্যে অশ্লীলের স্থান আছে, কালিদাসে অশ্লীলতা আছে!!! আপনারা সকলে হাততালি দিন।

কি শুভ মুহূর্তেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। আজ বাঁচিয়া আছি বলিয়াই ত বাংলা সাহিত্যে নবীনের, তরুণের, বিদ্রোহের, অশ্লীলের অভিষেক দেখিতে পাইলাম।

"Bliss was in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven!"

বয়সে অথবা বুদ্ধিতে শিশু হইবার একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে তখন আদেখ্‌লেপনা করিতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ হয় না। সেই বয়সে ঝাড়ের তিনকোণা কাচ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হর-গৌরীর মিলনের বর্ণনা পর্যন্ত যাহা-কিছু-একটা দেখিয়া হাঁ হইয়া যাইবার একটা অপরিসীম, অফুরন্ত, দুর্নিবার ক্ষমতা থাকে। পৃথিবীতে যতই দিন কাটে, যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া উঠে, ততই অবাক হইয়া যাইবার ক্ষমতাটাও কমিয়া আসে, ততই রাজা সলোমনের মত মনে হয়,—হায়! চিরতরুণী পৃথিবীকে চিরবৃদ্ধায় রূপান্তরিত করাই যদি মনের পরিণতির, জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার ফল হয় তবে এমন জ্ঞানের, এমন অভিজ্ঞতার, এমন মানসিক পরিণতির কি প্রয়োজন ছিল? জ্ঞান যে দুঃখের হেতু। আর এই জগৎ—Vanity of Vanities, all is Vanity!

বৃদ্ধ হিন্দু-সমাজেরও এই মত। কিন্তু সাহিত্যিক পূর্বাশার কোলে অশ্লীল-ঊষার প্রথম ও সলজ্জ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাঁহারা পাখীর মত আনন্দকাকলী করিয়া নূতন দিনের আবাহন করিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া মনে হইতেছে এতদিনে বুঝি হিন্দু সমাজের বৃদ্ধ অপবাদ ঘুচিতে চলিল। অলঙ্কার ও কামশাস্ত্রের নির্দেশমত হাজার বৎসর ধরিয়া কাব্যের পর কাব্যে শত শত শ্লোকে নরনারীর আসঙ্গ-লিপ্সার কথা লিখিয়া বৃদ্ধের অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, তাহার চোখে আর অশ্লীলতার নেশা লাগিয়া উঠিতেছিল না। আজ কি সে নিজের জরা আর কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া যযাতির মত যৌবন ও ভোগের কামনা ফিরিয়া পাইল, না সে মরিয়াছে? চৌর-পঞ্চাশৎ, অমরুশতক, শৃঙ্গারশতকের নির্জলা ব্র্যাণ্ডিতে যাহার নেশা হইত না, সে আজ এক পয়সার বিড়ি খাইয়া নেশা করি বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৃদ্ধ হিন্দু সমাজ আর বাঁচিয়া নাই। সে পাঁড় মাতাল মরিয়াছে। তাহারই পোশাক পরিয়া এক অর্বাচীন ছোকরা বাপের হুঁকায় চুরি করিয়া এক টান দিয়াই ঘুরিয়া পড়িয়াছে।

'কথামালা' অথবা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের পরই 'গীতগোবিন্দ' পড়িলে অবশ্য অশ্লীলতার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া, কলম্বস্ যেরূপ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন মনোজগতে তেমনি একটা নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছি, একথা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু যে অভাগা কর্মদোষে চরিত্রের এই সহজ, সরল, নির্বোধ অমায়িকতা হইয়াছে তাহার উপায় কি? তাহার কাছে যে অশ্লীলতাকে শ্লীলতার চেয়েও নূতনত্বহীন, বিস্বাদ ও ইতর বলিয়া মনে হয়। মনে হয় বলি কেন? অশ্লীলতা যে বাস্তবিকই অতিশয় পুরাতন ও অতি সুলভ। আজকালকার সাহিত্যিকদের ও তাঁহাদের বিদ্রোহবায়ুগ্রস্ত পৃষ্ঠপোষক-গণের ধারণা ছিল যে অশ্লীলতা প্রথম সৃষ্ট হয় তের-শ চৌত্রিশ সালে বাংলাদেশের কলিকাতা ও ঢাকা শহরে। পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন কালিদাসে অশ্লীলতা আছে, সেক্স্পীয়রেও অশ্লীলতা আছে, এমন কি ভারতচন্দ্রেও অশ্লীলতা আছে, তখন তাঁহারা স্বপক্ষে এতগুলি বড় নজীর পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মৌলিকতার মায়া একেবারে কাটাইয়া ফেলিলেন। আমরা বলি সেক্স্-পীয়র কালিদাসই বা কতদিনের মানুষ। অশ্লীলতা তাঁহাদের চেয়েও বহু পুরাতন। মানবসমাজে অশ্লীলতা পিরামিডের মত অচল অটল, কিন্তু পিরামিডের

অপেক্ষাও প্রাচীন।

আমার যতদূর মনে পড়ে, মিশরের তৃতীয় 'ডাইনাস্টি'র রাজা স্নেফুরা মিশরের প্রথম পিরামিড নির্মাণ করেন। এডুয়ার্ড মাইয়ুরের গণনারীতি অনুসারে সে বড় জোর পাঁচ হাজার বৎসরের কথা। আর্টে প্রথম অশ্লীলতা দেখিতে পাই তাহারও অনেক আগে, কোয়ার্টারনারি যুগের শেষের দিকে, পুরাতন প্রস্তর-যুগের ওরিনাসিয়ান (Aurignacian) স্তরে। তখন আমরা মানুষ বলিতে যে জন্তুকে বুঝি (Homo sapiens) সে সবেমাত্র পশ্চিম ইয়োরোপে দেখা দিয়াছে। মধ্য ইয়োরোপ তখনও চতুর্থ বরফ যুগের (Wurmian glaciation) শুভ্র তুষারে ঢাকা। হস্তী গণেশ (Elephas antiquus), অতিকায় হস্তী (Elephas primigenius). লোমাবৃত গণ্ডার (Rhinoceros tichorhinus), বল্‌গা হরিণ (Rangifer tarandus), বাইসন (Bos-priscus), গুহাবাসী ভালুক (Ursus spelaeus) তখনও ফ্রান্সের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুদূর অতীতে আমাদের বন্য পূর্বপুরুষেরা (Cromagnon race) নগ্ন স্ত্রীমূর্তি গড়িয়া (Venus of Brassempony, Venus of Willendorf, Statuettes of Mentone, Venus of Laussel ও অন্যান্য বহু মূর্তি) অশ্লীলতার চর্চা করিতেছিল। আশ্চর্যের কথা এই, তাহাদিগকে নবীন বাঙালী সমালোচক অথবা এরোপ্লেনের জন্যে অপেক্ষা করিতে হয় নাই।

অশ্লীলতার সঙ্গে স্টীম এঞ্জিন, কমিউনিজ্‌ম্‌ অথবা বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্ন সমস্যার কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া বিশ্বাস আমার কখনই ছিল না। কিন্তু আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলনের খোলাখুলি চিত্র হয়ত তরুণ সাহিত্যিকদের না হইলেও সভ্য মানুষেরই কীর্তি। দুঃখের কথা এই যে, এই সামান্য গৌরবটুকুতেও আমাদের দাবী নাই। এখানেও সেই ক্রোমানিয়োঁ জাতিই আমাদের পূর্ববর্তী। সেদিন 'নেচার' পত্রিকায় পড়িলাম, ফ্রান্সের এক জায়গায় পুরাতন প্রস্তর যুগের একটি উৎকীর্ণ ফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি খোদিত আছে। এই ফলকটিকে প্যারিসের অ্যাঁস্তিতু দ্য পালেঅঁতলজি উমেনের অধ্যাপক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক মসিয় মার্সেলোঁ বুল প্রথমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিত্র বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সহকর্মী অধ্যাপক ডাক্তার ভের্ণো খোদিত মূর্তিগুলির মাংসপেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইহা প্রকৃতপক্ষে

সঙ্গমের চিত্র।

মানুষের আদিম অশ্লীলতার সাক্ষী অতিকায় হস্তী, লোমাবৃত গণ্ডার, গুহাবাসী ভালুক কত কাল হইল পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অশ্লীলতার সেই সনাতন সুরধনীটি আজও মানব সমাজকে সরস করিয়া বহিতেছে। তাহার কত রূপই দেখিলাম। আরব্য উপন্যাস (Dr. Mardrus-এর অনুবাদ), বোকাচচো ও বিদ্যাপতিতে অশ্লীলতার রোমান্টিক রূপ ; অভিড্, অমরু, লঙ্গাস্, জয়দেবে অশ্লীলতার 'ক্লাসিসিজম্', খাজুরাহো, কোণারক ও পুরীর মন্দিরের গায়ে, কাসানোভাতে অশ্লীলতার ব্রহ্মবাদ ; কন্‌গ্রিভ, ওয়াইচালি, ভলতের, ভারতচন্দ্রে অশ্লীলতার নাগরিক রূপ ; রাবলে, গু ব্র্যাতোম্ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অশ্লীলতার গ্রাম্যতা।

ভবিষ্য অশ্লীলতা কি রূপ ধরিয়া সাহিত্যে দেখা দিবে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হইলেও আমরা সে বিষয়ে একটা আন্দাজ করিয়া ফেলিতে পারি। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিক জগতে বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, জয়দেব, কাসানোভার অভিজাত অশ্লীলতার স্থান নাই। রাষ্ট্রে ও সমাজে "অ্যারিস্টোক্রেট' ও 'ক্যাপিট্যালিস্ট' যে পথে গিয়াছে, অশ্লীলতার জমিদারদিগকেও সেই পথেই যাইতে হইবে। অশ্লীলতার অভিজাতদিগের সম্মুখে অশ্লীলতার মুটে-মজুররা আর মাথা নীচু করিয়া থাকিবে না। কেরানীতে কেরানীতে স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় আলাপ, সমপাঠিনী সম্বন্ধে কুসংস্কার-বর্জিত কলেজের ছেলের চাপাগলায় মন্তব্য, দেয়ালে পেন্সিল দিয়া লেখা নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ শিলালিপি, দৈনন্দিন জীবনের এই সকল অনাড়ম্বর সাদাসিদে, ছোটখাটো, বস্তুতান্ত্রিক অশ্লীলতাকে উপকরণ করিয়া অশ্লীলতার প্রোলেটারিয়ান রূপ মূর্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমি এ কি বলিতেছি ? এখানেও তো তরুণ সাহিত্যিকরা নূতন কিছু করিয়াছেন বলিয়া বড়াই করিতে পারিবেন না। অশ্লীলতার সহস্র রূপের কথা বলিবার সময়ে আমি সম্রাট নিরোর অমাত্য পেট্রোনিয়ানের রচিত 'স্যাটিরিকনে'র কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। বাস্তব ও বস্তিবাসী অশ্লীলতায়ও আর মৌলিকতা নাই। 'Tis too late to be ambitious', আমাদের সাহিত্যিকরা জন্মগ্রহণ করিতে প্রায় এক হাজার আট শত সত্তর বৎসর দেরি করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার শুনিলাম, বৎসর সাতেক আগে মিঃ জেম্‌স্ জয়েস্‌ও এই পতিত জমিটুকু ভাল করিয়াই চাষ করিয়াছেন। সত্যই নূতন কিছু নাই। Is there anything whereof is may be said, See, this is new ? It hath been already of

old time, which was before us.

॥ ২ ॥

"দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়ত ঐ মেহের আলিও আমার মত এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

"আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে'?"

"সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণামান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল—'তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়'।"

রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুধিত পাষাণ, গল্পগুচ্ছ

সকলেই জানেন যীশুকে যখন বন্দী করিয়া পীলাতের সম্মুখে আনা হয়, তখন পীলাতের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেন, "আমি সত্যকে প্রচার করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। যে সত্যকে চায়, তাহারই কানে আমার বাণী প্রবেশ করিবে।" যীশুর কথা শুনিয়া পীলাত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি?" কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। কথাটা হয়ত শুনিতে খারাপ, তবুও স্বীকার না করিয়া পারি না যে, আমি পীলাতের দলে। পীলাত শুধু সত্যকে জানা সম্ভবপর নয় এই সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার অবিশ্বাস আরও দূরগামী। মানুষ সত্যকে জানিতে চায়, মানুষের জীবনযাত্রার জন্য সত্যের কোনও প্রয়োজন আছে, এই দুইটি কথার একটি কথায়ও আমার আস্থা নাই। সত্যান্বেষী হওয়া আর আত্মঘাতী হওয়া যে একই জিনিস তাহার একটি প্রমাণ সেদিন পাইলাম। এক বিলাতী পত্রিকায় ডাক্তার ফ্রয়েডের কয়েকটি কথা বাহির হইয়াছে। ডাক্তার ফ্রয়েড নাকি বলিয়াছেন,—"আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। জীবন বড়ই দুঃখময়। যতই দিন কাটিতেছে আমার এ বিশ্বাস ততই দৃঢ় হইতেছে।" যিনি মানুষের রহস্য-

ময় জীবনের মূল সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীর নরনারীকে নিষ্ঠুর মানসিক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার মুখে এ কি কথা? হায় বৈজ্ঞানিক! সত্যের জলধিতে স্নান করিয়া উঠিয়াছ বলিয়াই কি জীবনে তোমার এই বিতৃষ্ণা? Sex অথবা libido-ই মানব-জীবনের শেষ কথা, তারপর আর কোন রহস্য নাই এই কথাটি জানিয়াছ বলিয়াই কি জীবন তোমার কাছে এত বিস্বাদ, এত নীরস, এত তিক্ত হইয়া গিয়াছে?

শিকার করিতে গিয়া, দৈবক্রমে স্নানরতা আর্টেমিসের অনাবৃত দেহ দেখিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া নিষ্পাপ অক্টেয়ন নিজের কুকুরের দংশনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণ হারাইল। বিজ্ঞানবিদ্‌কেও জীবনের আর্টেমিসের অভিশাপ লাগিয়াছে। যে প্রেম জীবনের উৎস তাহাকে সাদা চোখে দেখিয়া কেহ জীবনে আস্থা রাখিতে পারে নাই। মসিয় ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াকের কথায়, বুদ্ধির কাছে প্রেম তো le desert de L'amour,—প্রেমের মরুভূমি। প্রেমের প্রকৃত রূপ কি তাহা কে বলিতে পারে? জড় জগৎকে বুঝিবার জন্য মানুষ যে বুদ্ধি পাইয়াছিল সেই বুদ্ধি দিয়া যে বুদ্ধি জীবধর্মের একটা আংশিক রূপমাত্র সেই বুদ্ধি দিয়া, অথণ্ড জীবধর্মকে বুঝিবার চেষ্টার মধ্যে যে স্পর্ধা আছে তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না?

সত্যের মধ্যে কোন সান্ত্বনা নাই, রহস্য ও কল্পনাই জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে এ কথাটা আমি আগেও বলিয়াছি। আজ শুধু একটা সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়া এই মোটা কথাটা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। নারীদেহের আকর্ষণ কত প্রবল তাহা আমরা সকলেই জানি, বোধও করি। কিন্তু আজ যদি পৃথিবীর সকল নারী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিত তবে কি নারীদেহের সেই মাদকতা থাকিত? আমরা দেখিতে পাই, যে নারীর অঙ্গে বস্ত্রাদি যত বেশী তাঁহার আকর্ষণও তত বেশী। প্রমাণ মেয়ে-স্কুলের ছাত্রী। অল্পবয়স্ক সাহিত্যিকদিগকে স্পষ্টতঃ ও ইঙ্গিতে অনেক সময়েই মেয়ে-স্কুলের ছাত্রীদের উন্মাদকর মোহ ও আকর্ষণের কথা বলিতে শুনি। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, নবীনা বিদুষীদের পোশাক।

সেকেলে মেয়েদের একখানা শাড়ীর জায়গায় ইহারা দশখানা কাপড় পরেন, কম্বিনেশনের উপর সেমিজ, সেমিজের উপর বডিস ও পেটিকোট, বডিস ও পেটিকোটের উপর ব্লাউজ ও শাড়ী, তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে কার্ডিগান অথবা ফারকোট, ভেলভেটের নাগরা দিয়া পা দুটি ঢাকিয়া দিবার ও চুল টানিয়া

দিয়া কান দুটি ঢাকিবার কথা নাই বলিলাম। সত্যকে এতগুলি ভারী ভারী জামা-কাপড় দিয়া চাপা দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তো এই সত্য এত মধুর, এত মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। মেডিকেল কলেজের ডিসেক্‌শন টেবিলের উপর অনেক নগ্ন সত্য পড়িয়া থাকে। তাহাদের উদ্দেশে কবিতা লেখা হইয়াছে, এমন কথা তো আজ পর্যন্ত শুনি নাই।

জামা-কাপড়ের উপরই যে নারীদেহের আকর্ষণ নির্ভর করে একথা নূতন নয়। এই সহজ তথ্যটি 'অ্যানথ্রপলজিস্ট' মাত্রেরই সুপরিচিত। ওয়েস্টারমার্ক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন নারীদেহকে পুরুষের কাছে, পুরুষের দেহকে নারীর কাছে কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত করিয়া লোভনীয় করিয়া তুলিবার জন্যই পোশাক ও অলঙ্কারের ব্যবহার মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পৃথিবীর অর্ধেক রূপমোহ, অর্ধেক লাম্পট্য বস্ত্র-ব্যবহারের আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

রহস্যের মধ্যে যে জীবনের মাধুর্য এ কথাটা আমাদের সাহিত্যিকরা জানেন না তাহাই বা কি করিয়া বলি? তাঁহাদিগকে তো স্থানে-অস্থানে, যখন-তখন মোনা-লিজার inscrutable হাসির কথা বলিতে শুনি। তাই এক একবার আশ্চর্য হইয়া ভাবি এই সত্য কথাটা জানিয়াও ইঁহারা দুঃশাসনের মত নরনারীর দৈহিক সম্বন্ধের বস্ত্র-হরণ করিবার জন্য লাগিয়া গিয়াছেন কেন তাঁহারা কি আসলেই রূপমোহকে, প্রেমকে, জীবনকে বিজ্ঞানের হাড়িকাঠে বলি দিয়া সত্যকে জানিবার জন্য বদ্ধপরিকর, না তাঁহাদের এই চেষ্টার মধ্যে একটা গোপন ও অজ্ঞানকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা আছে।

আত্মপ্রবঞ্চনা যে কোথাও আছে তাহার এই তিনটি প্রমাণ পাইয়াছি। একসময়ে আমাকে একটি জায়গায় থাকিতে হইত। সেই বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আসক্তির কোনও লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও কোনও পরিচয় পাই নাই। তাহাদিগকে দুই একবার প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা চন্দ্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরে কি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে এই বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। কিন্তু একদিন দৈবক্রমে সেই বাড়ীতে ছয় খণ্ড হ্যাভেলক এলিস আসিয়া পড়াতে তাঁহাদের সুগভীর বিজ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম। তাঁহাদের কাড়াকাড়ি দেখিয়া কাপ্তান স্কট ও কাপ্তান আমুণ্ডসনের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের জন্য প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন বুঝিলাম মানুষের জড়-

বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি না থাকিলেও জীববিজ্ঞানের প্রতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয়-জীববিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি থাকিতে পারে। সম্প্রতি এই সত্যটিকে আবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার পুস্তক-বিক্রেতার কাছে শুনিলাম অনেকে তাহার কাছ হইতে প্রত্যেক ভলিউমের জন্য পাঁচ টাকা হারে ভাড়া দিয়া হ্যাভেলক এলিসের সুবিখ্যাত গ্রন্থখানা পড়িতে লইয়া যান। যে বাঙালী পাঠক বৎসরে পাঁচ টাকার বই কিনিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞানের জন্য এই কষ্টস্বীকার বড়ই আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এই জ্ঞানপিপাসা যে পুরুষদের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে। কলিকাতার কোন বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ের অবিবাহিতা ছাত্রীদের মধ্যে কোন এক বিশেষ প্রকারের ছবি ক্রয়বিক্রয় হয় বা হইত তাহার অন্ততঃ একটি প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

আজ শুধু মনে পড়িতেছে সেণ্ট জনের সেই উক্তি, আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্যাস্কেলের খেদ! "All that there is in this world is lust of the eyes, lust of the flesh and pride of life. Unhappy and accursed is the land through which flow these three rivers of fire."

না না, মানুষের কি দোষ? ক্ষুধিত পাষাণের বক্ষে তিন রাত্রি কাটাইয়া কে তাহার মোহে অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় ছুটিয়া যায় নাই? দিন নাই রাত্রি নাই আমরা কাহার একটা আকুল আহ্বান শুনিতেছি। কেহ যেন এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ-ভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও, কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে লইয়া যাও, আমাকে উদ্ধার কর। আমি কে? আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব? আমি এই ঘূর্ণ্যমান, পরিবর্তমান স্বপ্ন-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব?

এই আকুল আহ্বান মিথ্যা, কামনার এই তীব্র অনুভূতি মিথ্যা, ইহা জীব-ধর্মের মায়াজাল মাত্র, এই কথাটা মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না, পারিবেও না। জগতে সত্যের জন্যই সত্যান্বেষণ বলিয়া কোন জিনিস নাই। দর্শনে, বিজ্ঞানে আমরা জীবধর্মেরই দাস। তবু মিথ্যা এই সত্যের বড়াই করিয়া বেড়াইতে হইবে এইটাই সব চেয়ে নিদারুণ পরিহাস।

মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বদাই এরূপ সজাগ ও

তীক্ষ্ণ হইয়া রহিয়াছে কেন, উহার একটা গূঢ় কারণ আছে। মানুষের মধ্যে—শুধু মানুষের মধ্যে বলি কেন, সকল প্রাণীর মধ্যেই এই বৃত্তিটি অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়—সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রজনন-সংক্রান্ত মুখ্য ও গৌণ ব্যাপারগুলিকে গোপন করিয়া রাখিবার একটা অভ্যাস আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্বর ও অনুন্নত জাতি। তাহাদের মধ্যেও এক দীক্ষা ও দুই-একটি বিশেষ উৎসবের সময় ব্যতীত প্রকাশ্যে সঙ্গত হইবার প্রথা নাই। তাহার কারণ নিছক কাম একটা অসুন্দর (unaesthetic) বৃত্তি। শুধু তাহার সাহায্যে জীবের বংশরক্ষা হইবার উপায় নাই। প্রাণী বীভৎস জিনিসের প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। উদ্দীপিত-রাগ অবস্থার সুন্দর-অসুন্দর বোধ না থাকিলেও রাগের উদ্দীপনার জন্য সুন্দরের প্রয়োজন আছে। পশু-পক্ষীকেও বংশরক্ষার জন্য secondary sexual character-এর aesthetic আবরণের আশ্রয় লইতে হয়। মানুষের পক্ষে এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন আরও বেশী।

তাই যদি কেহ জীবজন্মের হেতু এই গোপনীয় বৃত্তিগুলিকে অনাবৃত করিয়া দেখাইতে চায় তখনই তাহার আত্মরক্ষার সংস্কারে আঘাত লাগে। জীবধর্ম পালনের জন্য এই রহস্য ও সৌন্দর্যের ফাঁদ পাতিবার বৃত্তিতেই শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বোধের উৎপত্তি। অশ্লীলতা ও দুর্নীতি এক জিনিস নয়। হত্যা, চুরি অথবা ব্যভিচার আমাদের নীতিজ্ঞানে আঘাত দেয় কিন্তু শ্লীলতাবোধকে ক্ষুণ্ন করে না। নরনারীর দৈহিক আকর্ষণ সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা আমাদের নীতিজ্ঞানকে ক্ষুণ্ন করে না বটে, কিন্তু আমাদের শ্লীলতাবোধে আঘাত দেয়। নীতিজ্ঞান সামাজিক বৃত্তি, শ্লীলতাবোধ দৈহিক বৃত্তি। সেই জন্যই এই দুয়ের মধ্যে শ্লীলতাবোধই বেশী প্রাচীন ও শক্তিশালী।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের নিগূঢ় ব্যাপারগুলিকে গোপন করিয়া রাখাই যদি নৈসর্গিক ধর্ম হয় তবে মানুষ এই বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতে এত ভালবাসে কেন, গোপনে মারি স্টোপস, হ্যাভেলক এলিস, বাৎস্যায়ন পড়িবার জন্যই বা তাহার আগ্রহ কেন? ইহার কারণ মানুষের নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি লোভ। মেণ্ডেলিজম্ সম্বন্ধে যাঁহারা একটু-আধটু আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে জীবের কতগুলি ধর্ম একা-একা থাকে না, জোড়ে-জোড়ে থাকে। নর-নারীর দৈহিক সম্বন্ধের রহস্যকে গোপন করিয়া রাখিবার অভ্যাস ও সেই দৈহিক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা, এই দুইটি জিনিস পরস্পর-বিরোধী হইলেও মেণ্ডেলিয় ধর্মের মত মানুষের মনের একটি যুগ্মবৃত্তি। বিশুদ্ধ

অশ্লীলতা আমরা দেখিতে পাই শিশুর মধ্যে, অথবা ইংরেজীতে যাহাকে exhibitionism রোগ বলে সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে। শিশুদের একটা স্বাভাবিক অশ্লীলতা আছে। যে কেহ শিশুদের সংসর্গে আসিয়াছেন, তিনিই জানেন যে শিশুরা হঠাৎ বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অশ্লীল কথা উচ্চারণ, অশ্লীল চিত্র অঙ্কন অথবা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া বসে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ স্বাভাবিক অশ্লীলতা কাটিয়া গিয়া আর একটি রহস্যময় অশ্লীলতা মানুষকে পাইয়া বসে।

যৌবনোন্মুখ বালক-বালিকার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল, নিজের জীবনে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একটি উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই গভীর মানসিক বৃত্তির সাধারণ প্রকাশ শ্লীলতাবিরুদ্ধ রসিকতায়। অশ্লীলতা মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাকেও ঘরের এক কোণে কোথাও একটু স্থান দিতে হইবে, এই দুইটা কথা স্বীকার করিবার মত সাহস মানুষের যতদিন পর্যন্ত ছিল ততদিন অশ্লীলতাকে দর্শন, বিজ্ঞান, লোকহিত, বিপ্লববাদ, সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয় নাই। কিন্তু সভ্য মানুষ অতি সহজেই আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে, তাই আজ সে পুরাতন হাস্যপরায়ণ অসভ্য রসিকতার জায়গায় একটা বর্ণচোরা ক্রন্দনশীল সভ্য অশ্লীলতা আবিষ্কার করিয়া, নিজের বিবেকবুদ্ধিকে বাঁচাইয়া অতি সহজে জীবধর্ম পালন করিতেছে। শুধু এইটুকুর মধ্যে গৌরব কোথায়? মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া এই রহস্যের আলোচনা করিয়াছে তবুও সে সত্যকে পায় নাই, তাহার কৌতূহলও নিবৃত্ত হয় নাই। পাওয়ায় ও না-পাওয়ায়, বিরহে ও মিলনে দেহের এই রহস্য নর-নারীর জাগরণ ও সুপ্তিকে দুঃস্বপ্নের মত ব্যাপিয়া আছে।

"For days together we have desired to crush a body on our bosom, We have believed that a body can be possessed. And here it is, at last, with us. We burn and our blood is on fire. By the science of caresses our hands see it ; our eyes touch it ; it does not defend itself. It is given to us wholly, entirely. We are one with it. We drink its breath, yet we do not possess, The fierce tide rushes on, beats the living wall, passes over it, comes back, but finds it no more. We said, 'We thought we had surprised the mysterious

movements of the knees, revealed the secret of that which links the shoulders'. But the last inventions of volupte are but vain pursuits. Never, never shall we find that body we seek".

(Francois Mauriac, Fleuve do Feu. p. 123—24)

মানুষের বুদ্ধি অনেক রহস্য ভেদ করিয়াছে, আরও অনেক রহস্য ভেদ করিবে, কিন্তু যে রহস্য তাহার কল্পনায়, তাহার রহস্য সে ভেদ করিবে কি করিয়া ? যদি কোনদিন মানুষের চোখের সম্মুখ হইতে এই মিথ্যার যবনিকাটুকু সরিয়া যায়, তবে সে সত্যের দেখা পাইবে,—কিন্তু জীবনের বিনিময়ে।

"If a man got hold of truth, the sole truth as it is known to God and let it fall from his hands, the world will be annihilated by the shock and the universe will melt away like a dream. Divine truth like a last judgement will reduce it to powder".

ডাক্তার ফ্রয়েডের কি সেই চরম সত্যের সন্ধান মিলিয়াছে ?

॥ ৩ ॥

"Poetry may have also an ulterior value as a means to culture or religion, because it conveys instruction or softens the passions, or furthers a good cause ; because it brings the poet fame, or money or a quiet conscience. So much the better let it be valued for these reasons too. But its ulterior worth neither is nor can directly determine its poetic worth as a satisfying imaginative experience and this is to be judged entirely from within. The consideration of ulterior ends, whether by the poet in the act of composing or by the reader in the act of experiencing, tends to lower poetic value. It does so because it tends to change the nature of poetry by taking it out of its own atmosphere. For its nature is to be not a part, nor yet a copy, of the real world

(as we commonly understand that phrase), but to be a world by itself, independent, complete, autonomous."

A. C. Bradley,

Oxford Lectures on Poetry.

মানুষের প্রথম আবির্ভাব হইতে আজ পর্যন্ত অশ্লীলতার চিরজয়যুক্ত অভিযান দেখিয়া আমার মনে হয় মানুষের একটা নূতন সংজ্ঞা জাগিয়াছে। লিনিউস বলিয়াছিলেন, মানুষ Homo sapiens অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব। বার্গসঁ বলিলেন, মানুষ Homo faber অর্থাৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। আমি বলি, মানুষ 'হোমো সাপিয়েনস'ও নয়, 'হোমো ফাবের'ও নয়, মানুষ প্রকৃতপক্ষে 'হোমে অশ্লীলেন্‌সিস'। মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে একটা বড় রকমের দেহগত বৈষম্য আছে এ কথাটা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হাক্‌সলীর 'জীব-জগতে মানুষের স্থান' বইখানা প্রকাশিত হইবার পর আর বলা চলে না। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণার ফলে মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে বুদ্ধিগত বৈষম্যের দেয়ালও বুঝি ভাঙিয়া পড়ে। তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়? মেচ্‌-নিকফ বলেন,—

"All attempts to demonstrate the presence in the human brain of parts that were absent in the simian brain have failed. It is a curious fact that man displays a more marked difference from monkeys in the structure of the reproductive system than in the structure of the brain.

(Elie Metchnikoff, Nature of Man, p. 81)

মানসিক বৃত্তির দিক হইতে আমি বলি, অশ্লীলতা করিবার ও অশ্লীলতাবোধের ক্ষমতাই মানুষের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহাও সেই প্রজনন-সংক্রান্ত function-এরই কথা। সেই জন্যই বোধ করি ডাক্তার ফ্রয়েডও বলিয়াছেন, sex-ই মানুষের কর্ম ও চিন্তার এক ও অদ্বিতীয় উৎস।

মনুষ্য-সমাজে অশ্লীলতা আছে এই কথাটা এত সুপরিচিত যে ইহার পুনরাবৃত্তি একমাত্র শিশুর মুখেই শোভা পায়। এখন প্রশ্ন এই, সাহিত্যে ইহার স্থান আছে কি? আর যদি স্থান থাকিয়া থাকে, তবে কি শর্তে আছে? আমাদের সমালোচকেরা যখন বলেন, সাহিত্যে এই জিনিসটির স্থান আছে তখন আমি ইঁহাদের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হই। আবার যখন তাঁহারা বলেন,

এই জিনিসটি বাস্তব সত্য সেই জন্যই সাহিত্যে ইহার স্থান আছে তখন আমি ইঁহাদের সরলতা দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, সাহিত্যে কোন্ জিনিসের স্থান নাই ? স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ জীবনের একটা খুব বড় ব্যাপার, ইহার অপেক্ষা কত ছোটখাটো, সামান্য ব্যাপার লইয়াও তো কত কবিতা, কত গল্প, কত উপন্যাস লেখা হইয়াছে। যে গোরাদিগকে দেখিলে আমাদের প্রাণে কবিত্বের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবারই ইচ্ছা হয়, কিপলিং সেই গোরাদের জীবনযাত্রা লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, ভেরহেরণ বর্তমান জগতের কলকারখানা লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, লুক্রেশিয়াস "নেচার অফ্ থিঙ্গস্"-এর রহস্য উদ্‌ঘাটনকেই তাঁহার কাব্যের প্রেরণা করিয়া লইয়াছেন, মিঃ এইচ্. জি. ওয়েলস্ ও অন্যান্য লেখকদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়নির্বাচন সম্বন্ধে মোটা কথাটা এই,—লেখক জগতের যে কোনও জিনিস লইয়া যাহা খুশী লিখিতে পারেন শুধু তাঁহাকে কৃতকার্য হইতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার রচিত বিষয়কে আর্টের কোঠায় নিয়া ফেলিতে হইবে। স্বাধীনতার এই দামটুকু দিবার ক্ষমতা যাঁহার নাই তাঁহার স্বাধীনতায়ও কোন অধিকার নাই। যিনি যত বড় বিষয়বস্তু নির্বাচন করিয়া লইবেন, অকৃতকার্য হইলে তাঁহার অকৃতকার্যতাও তত বড় হইয়া দেখা দিবে। আপনারা অবশ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কৃতকার্যতা বলিতে আমি কি বুঝি, আর্টের কোঠায় নিয়া ফেলা, এই কথাটারই বা অর্থ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব আর্ট অর্থে আমি রূপান্তর বুঝি (রূপান্তর অর্থাৎ "those various transmutations which forms undergo in becoming parts of aesthetic construction." কথাগুলি ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-সমালোচক মিঃ রজার ফ্রাই-এর।

বাস্তব জীবনে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহার ফটোগ্রাফ যেমন চিত্রকলা নয়, বাস্তব জীবনে আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহার বর্ণনাও তেমনি সাহিত্য নয়। জ্যামিতির সত্য ও আর্টের সত্য প্রায় একদরের জিনিস। দুই-এরই বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিয়াও সম্বন্ধ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমি কি বলিতে চাই তাহা পরিষ্কার হইবে। আমরা পথে মাঠে ঘাটে কত ধ্বনি তো শুনিতে পাই। যদি কলের সাহায্যে সেই ধ্বনিগুলিকে রেকর্ডে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই কি সেই ধ্বনিগুলির সমষ্টি সঙ্গীত হইয়া উঠিবে ? বাস্তবে জীবনের ধ্বনি হউক, রং

হউক, শব্দ হউক, মানসিক অবস্থা হইক, রূপ হউক, ঘটনা হউক, যে কোন জিনিসকে উপাদান করিয়া একটা বিশিষ্ট ধরনে সাজাইয়া দেওয়ার নামই আর্ট। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসের সৃষ্টি—"to rouse emotion by rhythmic change of states of mind due to the meaning of words."

এই কথাটার বিস্তৃত আলোচনা করিবার সময় আজ আর নাই। তাই প্রফেসর ল্যাসেলস্ এবারক্রম্বির একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইব। মিঃ এবারক্রম্বি বলিয়াছেন—Art is perfection of experience, জীবনে যাহা কিছু অসম্পূর্ণ, খণ্ড-খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অপূর্ণ অবস্থায় আছে, তাহাকে পূর্ণ, অখণ্ড, একীভূত করিয়া একটা 'আইডিয়েল' অর্থপূর্ণতা (significance) দেওয়াই আর্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই significance রসের, তথ্যের নয়।

আর্টের এই সংজ্ঞা অনুসারে নবীন সাহিত্যিকরা আর্টিস্ট নন,—এ-কথা বলিবার সাহস আমার নাই। তাঁহারাও বাস্তবের অসম্পূর্ণতাকে আর্টিস্টিক পূর্ণতা দিতে পারেন।—

"বাংলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই,— Tolstoy মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—Dostoevsky কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু Gorkey-র সঙ্গে একত্র খাই, Hamsun হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জ্বরো কপালে Bojer তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়,—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, (Anatole) France কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে। সেদিন কুটে কালো ঝড়ো মেঘের মতো Browning এসেছিল—সঙ্গে Barrett—রুখু মাথা,—রোগা চোখে অপূর্ব বিষণ্ণতা; ঘরে ঢুকেই বল্লে,—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কতদূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজন মেঝের ওপর বসে কত গল্প করলাম।"

উপরের দৃষ্টান্তটিকে আমি সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করি। কারণ, এখানে লেখক বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া আর্ট-লোকে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। জীবনে এরূপ অখণ্ড, সম্পূর্ণ, অন্যরসবর্জিত, নিটোল, বিরাট নিবুদ্ধিতা দেখিতে পাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, কাহারও হইয়াছে বলিয়াও বিশ্বাস করি না। বাস্তব জীবনে যে হতভাগ্য এতগুলি নাম অন্ততঃ মুখস্থ করিতে পারিয়াছে, সে হাজার বুদ্ধিহীন হইলেও এতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইবে না, এ কথাটা আমি শপথ করিয়া

বলিতে পারি। কিন্তু আর্টের মূল্য, আর্টের সার্থকতা তো বস্তুতন্ত্রতার মধ্যে নয়। লেখক বাস্তবকে রূপান্তরিত করিয়া হাজার-গোলাপ-চোঁয়ানো একফোঁটা আতরের মত একবিন্দু 'ইডিয়সি-রস' বাহির করিতে পারিয়াছেন। এই সফলতার মধ্যেই তো তাঁহার গৌরব।

যদি আমাদের সাহিত্যিকরা অন্যজাতীয় রসসৃষ্টিতে সমান ক্ষমতার পরিচয় না দিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। সকল ব্যক্তির ও সকল জাতির রস ও রূপানুভূতি এক প্রকারের হয় না। মিঃ রজার ফ্রাই বলিয়াছেন 'কিউব' পাশ্চাত্ত্য জাতির, 'সিলিণ্ডার' অথবা 'ওভয়েড' প্রাচ্য জাতির রূপানুভূতির বৈশিষ্ট্য। রসানুভূতিরও হয়ত এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাক্তন সংস্কারের ফলেই হউক, অথবা অভ্যাসের ফলেই হউক আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের হাত একটি বিশেষ রসে পাকিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদের সকল রসসৃষ্টির পিছনেই এই আদি ও অকৃত্রিম রসটি উঁকি মারিতে চায়। তাঁহারা করুণ-রস সৃষ্টি করিতে গিয়া লেখেন "ট্রাম চলে লোহার চাকায় লোহার লাইন দুটো পিষে পিষে।" কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা! নীচের উদাহরণটিতে আমাদের কামানল প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য একটা সুস্পষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই—

"দুই হাত দিয়ে পদ্মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর মিঠে মুখখানা আমার মুখের উপর, ওর নরম বুক আমার বুকে এসে লাগছে—তার নীচে ওর ছোট্ট হৃদয়ের ভীরু শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছি।...লতার মত ওর হাত দুটি আমায় ঘিরে আছে।...পদ্মার মুখে চুমো দিলাম, পদ্মার বুকে চুমো দিলাম;— পদ্মার মুখে মধুর গন্ধ, পদ্মার বুকে মদের গন্ধ, পদ্মার সর্ব্বাঙ্গে আমার দেয়া ফুলের গন্ধ।

"তারপর পদ্মা আমার মুখে চুমো দিলে, আবার চুমো দিলে, আবার চুমো দিলে,—পদ্মা আমায় চুমো দিলে, আমায়, আমায়, আমায়।—"

কিন্তু এখানে লেখকের দিক হইতে, নায়িকা-চুম্বন লাভ করিয়া নায়কের কত দূর বুদ্ধিভ্রংশ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম রস সৃষ্টি করিবার গৌণ উদ্দেশ্য থাকায় শৃঙ্গার-রসের ব্যভিচার ঘটিয়াছে।

এখন সত্যানুসন্ধানের কথা বলি। বিখ্যাত ফরাসী কবি মসিয় পল ভালেরী এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া লোকে যখন দার্শনিক কবি এইরূপ শব্দের ব্যবহার করে তখন তাঁহারা দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও

বিসম্বাদী জিনিসকে জড়াইয়া ফেলিয়া শিশুর মত একটা ভুল করিয়া ফেলে বলিয়া মনে হয়। দর্শনের উদ্দেশ্য তত্ত্বানুসন্ধান কাব্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে একটা বিশেষ অবস্থায় লইয়া যাওয়া।* অনুভূতি আর জ্ঞান এক জিনিস নয়।

"Ah, love, let us be true
To one another ! for the world which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neithet joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain ;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night."

এই কবিতাটিতে ম্যাথিউ আর্নল্ড অথবা 'We are such stuff as dreams are made on, our little life is rounded with a sleep' এই কথাটিতে সেক্‌স্‌পীয়র জীবন ও মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে কোনও তত্ত্বের প্রচার করিতে চান নাই। জীবন সুখের কি দুঃখের, জীবনের কোনও মূল্য আছে কিনা এ সকল প্রশ্নের সমাধান সাহিত্যের কাজ নয়। মিঃ মিড্‌লটন মারি বলিয়াছেন—"The great writer does not realy come to conclusions about life ; he discerns a quality in it"—তাই কবির কাব্য পড়িয়া আমরা তত্ত্বের কথা ভাবি না, আমাদের মন আশার হউক, নিরাশার হউক, দুঃখের হউক, সুখের হউক, যে সুরে বাঁধা আছে, কবির গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরে বাজিয়া উঠে।

* "Parler aujourd'hui de poesie philosophique (fut-ce en invoquant Alfred de Vigny, Leconte de Lisle, et, quelques autres), c'est naivement confondre des conditions et des applications de I'esprit incompatibles entre elles. N'estce pas oublier que le but de celui qui specule est de fixer ou de creer une notion—c'est-a-dire un pouvoir et un instrument de pouvoir, cependant que le poete moderne essaye de produire en vous un etat et de porter cet etat exceptionnel au point d'une jouissance parfaite ?"

স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ লইয়া কবিতা বা গল্প লিখিতে গিয়া যাঁহারা প্রেম মিথ্যা কাম সত্য, অথবা কাম মিথ্যা প্রেম সত্য, এই দুইটি তথ্যের যে কোনোটিকে প্রমাণ করিতে চান সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান নাই। ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা দ্বিতীয় বাৎস্যায়ন, কল্যাণমল্ল অথবা হ্যাভেলক এলিস হইতে পারেন। তাঁহাদের সে গৌরবে কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু সাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র। দুই তিন বৎসর পূর্বে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কাব্যে অশ্লীলতার স্থান সম্বন্ধে ইংরেজী মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় আমি একটু আলোচনা করিয়াছিলাম, সেই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

"Bharatchandra treats the charming, bizarre, repelling, pitiful, overpowering facts of sex-life with wit, flippancy, and, as many would consider, indecency. On this question, a war of arguments is likely to be waged between the upholders of the romantic conception of love and the advocates of what, in the absence of a better adjective, has been termed its realistic conception. No controversy could be more irrelevant and less fruitful. Love is too deep-seated, complex and protean a passion to be contained in either of these two simle entities : sensuality and sentiment. The poet or the novelist's idea of love, whether as something ethereal and disembodied or something frankly carnal, is not the outcome of a scientific investigation like that of Mr. Havelock Ellis. It ir purely ideal (in the artistic sense) and is the result of the process of simplification and selection which is unconsciously and ceaselessly going on in the artist's mind and which endows his visions with a beauty and harmony of effect unattainable in real life."*

আমি বলিতে চাই, বাস্তব জীবনের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা আর সাহিত্যের আদিরস এক জিনিস নয়। আমরা যখন চিত্রে নরনারীর নগ্নমূর্তি দেখিয়া

* The Modern Review, Nov, 1925
(এইটিই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা।)

মোহিত হই, তখন আমরা মানুষের অঙ্গ-সংস্থানের কথা ভাবি না, মানবদেহকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনের কল্পলোকে যে রূপ (form) ও সামঞ্জস্যের (proportion) আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই কথা মনে করি। এই রূপানুভূতির সঙ্গে ইউক্লিডের জ্যামিতির বরঞ্চ যোগ আছে, গ্রের অ্যানাটমির কোন যোগ নাই। যদি নগ্ন মনুষ্যমূর্তির চিত্রে নগ্নতা ভিন্ন আর কিছুই না থাকিত, তবে জর্জোনে ও টিশিয়ানের ছবি এবং মাসিক বসুমতী ও ভারতবর্ষে যে সকল বিবসনা, অন্তত সিক্তবসনা সুন্দরীদের ছবি বাহির হয় তাহার মধ্যে কোন তফাৎ থাকিত না। সাহিত্যেও এই কথাটি খাটে। বাস্তবজীবনে কামের ফল অবসাদ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে সুখ থাকিতে পারে কিন্তু আনন্দ নাই। Omne animal post…triste, সেক্‌স্‌পীয়রও বলিয়াছেন, 'Th'expense of spirit in a waste of shame is lust in action." ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সুখকে—ভাবাধিগমের অবসান হইতে, অবসাদ হইতে, বিচ্ছিন্নতার শৃঙ্খল ও অতৃপ্তি হইতে মুক্ত করিয়া একটা অবাস্তব, পূর্ণ ও অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, দেহজাত সুখের রসসৃষ্টি করাই, যে-সকল অশ্লীল রচনা সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহার আদর্শ। কিন্তু একটা কথা ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে—

Consideration of ulterior ends whether by the writer in the act of composing or by the reader in the act of experiencing tends to lower poetic value.

অশ্লীল সাহিত্য লিখিবার সময়ে লেখকের উপর ও পড়িবার সময়ে পাঠকের উপর বাস্তব জীবনে দৈহিক উত্তেজনার যে নৈসর্গিক ফল, তাহা যদি হইয়া থাকে তবেই সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন আসিয়া পড়িবে। আপামর জনসাধারণের রসিকতা সূক্ষ্ম নয়, সংযমও কঠিন নয়, সেই জন্যই অধিকারীভেদের কথা ওঠে।

বাঙালী লেখকদের অশ্লীল রচনা সাহিত্য কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। তাঁহারা কি তাঁহাদের অশ্লীলতার প্রতি নবজাগ্রত নিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বলিতে পারিবেন যে, এই সকল অকথা-কুকথা লিখিবার সময়ে তাঁহারা ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পাপচিন্তার লেশমাত্রও ছিল না? পাঠকদের 'প্লেবিসিটে' লওয়াই বা কি করিয়া সম্ভব হয়?

তবে আমি একজন পাঠকের পক্ষ হইতে বলিতে পারি তাহার মনে ইহাদের অশ্লীলতা দেখিয়া হাসি-তামাশা করিবার কুপ্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় হয় নাই। তাহার সহৃদয়তার অভাবের জন্য সে শাস্তিও পাইয়াছে। শত

শত পণ্ডিতের শত শত বচন উদ্ধৃত করিয়াও সে রসিক-সমাজে আমল পাইতেছে না। সেণ্ট পল সত্যই বলিয়াছেন "Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal."

মানুষকে ভাল না বাসিলে মানুষের ভালবাসাও পাওয়া যায় না। কিন্তু কি করিয়া ভালবাসি বলুন দেখি? ইঁহাদের অশ্লীলতা করিবার আকাঙ্ক্ষা, অথচ অশ্লীলতা করিবার সাহস ও বৈদগ্ধ্যের অভাব দেখিয়া আমার যে শুধু একটা পুরাতন ফরাসী গল্প মনে পড়িয়া যায়! গল্পটা এই—

এক ভদ্রলোকের একটি ছেলে ছিল। একদিন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, বাপু, তোমার লেখাপড়া শেষ হইয়াছে। তুমি ল্যাটিন শিখিয়াছ, গ্রীক শিখিয়াছ, ইতিহাস, ধর্ম, নাচও বাদ দাও নাই। এখন তোমার শুধু 'সমাজবিজ্ঞান' শিখিতে বাকী। কিন্তু এ বিজ্ঞান শিখাইয়া দেওয়া হাজার বড় পণ্ডিতেরও কর্ম নয়। এই নাও, আমি মাদাম অমুকের কাছে একখানা চিঠি দিয়া দিতেছি। তিনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, তিনি তোমাকে একটা মানুষের মত মানুষ বানাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন সেই-জন্যই আশা করিতেছি, তিনি বাপের জন্য যে কষ্টটুকু স্বীকার করিয়াছেন, ছেলের জন্যও সেটুকু করিবেন।

ছেলে বাপের চিঠি লইয়া ভদ্রমহিলার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারও ছেলেটিকে দেখিয়া ভালই লাগিল। তিনি তখন তাহাকে সোফায় নিজের পাশে বসাইয়া, 'সমাজবিজ্ঞান' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করিলেন। কিন্তু যুবকের মনে কিছুতেই সাহসের সঞ্চার হয় না। দেখিয়া শুনিয়া ভদ্রমহিলা ছাত্রের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। কি করা যায়! আকার, ইঙ্গিত, উপদেশ সবই যখন বিফল হইল তখন মহিলাটি শেষ ও সনাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া, 'আমার নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে আসচে' বলিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। যুবক তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে ছুটিয়া না গিয়া চাকরবাকরদের জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া বাড়ীটাকে গির্জ্জায় পরিণত করিয়া ফেলিল। অমায়িক ভদ্রমহিলাটি তখন চক্ষু একবার অর্ধোন্মীলিত করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, 'যান্ আপনি, শুধু দুজন থাকতে আপনি আমার শুশ্রূষা করতে পারলেন না, আর কি ঝি-চাকরের সামনে পারবেন?'

বাস্তবিকই গ্রাম্য লোকে অশ্লীলতা করিতে পার না, অশ্লীলতার জন্য

নাগরিকতার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের সভ্যতা আজও আরণ্য। তাই আমাদের সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষায় অশ্লীল বলিলে যাহা বুঝায়, এইরূপ অনেক জিনিস আছে, কিন্তু অশ্লীলতা বলিলে সভ্যসমাজে যাহা বুঝায় তাহা নাই। সাহিত্যিক অশ্লীলতারও একটা লাবণ্য, একটা সৌষ্ঠব আছে। বর্বরতা করিলে তাহাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমাদের সাহিত্যিকরা যদি অশ্লীলতারও জাতি মারিতে চান তবে মারুন। সহ্য না করিয়া কি করিব? রাস্তায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে অষ্ট-প্রহর যে গ্রাম্যতা দেখিতেছি, শুনিতেছি, সহ্য করিতেছি, তাহা যদি আজ ছাপার অক্ষরে দেখি তবু সহ্য করিব। কিন্তু ছাপার অক্ষরে দেখিলে ব্যাকরণ ভুল যে বড় বাজে—ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।

* * *

উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি ঠিক চল্লিশ বৎসর আগে নিজের ত্রিশ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলাম। আজ সত্তর বৎসর বয়সে এই বিষয়ে আবার লিখিতে গেলে ভাষা হয়ত অংশত ভিন্ন ধরনের হইত, তবে মতামত মূলত অন্য রকমের হইত না। কিন্তু সাহিত্যে অশ্লীলতা (অর্থাৎ নরনারীর দৈহিক মিলনের খোলসা বা চাপা বর্ণনা) থাকা উচিত কি অনুচিত, এই প্রশ্নটার অপেক্ষাও আরও সার্থক একটা প্রশ্ন আছে। তাহা এই—সাহিত্যে এই ব্যাপারের বিবরণ থাকে কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ।

মানুষের জীবন লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সুতরাং জীবনের কোনও দিককেই সাহিত্য ছাড়িতে পারে না। নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক জীবনের একটা বড় দিক, উহাকেই বা সাহিত্য ছাড়িবে কেন? মানুষ যাহা কিছু করে, যাহাতে তাহার আগ্রহ আছে, তাহারই বর্ণনা ও আলোচনা সাহিত্য হইতে প্রত্যাশা করে—সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা এবং আলোচনা, এই দুইটাও চায়। ইহাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

ইহার উপরেও একটা কথা আছে। বাস্তব জীবনে যাহা ঘটে, মানুষ সাহিত্যে শুধু যে তাহার প্রতিবিম্বই দেখিতে চায়, তাহাই নয়, উহার আরও সুসম্বদ্ধ ঘনীভূত ও তীব্র ছবি চায়। মানুষ একই সঙ্গে কর্তা ও দ্রষ্টা। সেজন্য কোনও কাজ কেবলমাত্র করিয়াই তাহার তৃপ্তি হয় না, সে দেখিতেও চায়। এই নিয়মটা মানুষের সকল কার্যকলাপেই খাটে, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কেও উহা বলবৎ। এমন কি বলা যায়, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ব্যাপারে এই নিয়ম আরও বলবৎ। কারণ সঙ্গম কার্যত একটা অত্যন্ত গতানুগতিক, একঘেয়ে

ও রুটিন-বাঁধা ব্যাপার সুতরাং কর্মকাণ্ডে উহার পুরা রস পাওয়া যায় না। এইজন্য সাহিত্য হইতে উহার রস যোগাড় করিবার চেষ্টা হওয়া প্রায় অনিবার্য। এটা সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহা হইতেই আসিয়াছে।

তবু এটাও শেষ কথা নয়। তাহা হইলে সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্কের যে বর্ণনা ও অনুভূতি পাওয়া যায় তাহা আরব্য উপন্যাসের গল্পের পর আর বেশী অগ্রসর হইতে পারিত না ; বেশী বলি কেন, একটুও অগ্রসর হইত না। কিন্তু তাহা তো হয় নাই। কেন হয় নাই, কেন অগ্রগতি বন্ধ না হইয়া সমানে চলিয়াছে ? ইহার পরিষ্কার উত্তর সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে।

সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কেন অবিচ্ছেদ্য তাহার আংশিক আভাস এইমাত্র দিয়াছি। কিন্তু এই অবিচ্ছিন্নতার পুরাপুরি হিসাব এখনও দেওয়া হয় নাই। সংক্ষেপে কথাটা বলিব। মানুষ সাহিত্যে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সব দিকেরই—তা সে যেদিকই হউক না কেন—বিবরণ চাহিয়াছে। এই চাওয়া হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। কিন্তু এই চাওয়ার ফলে সাহিত্য যাহা দিল, তাহা মানবজীনের দৈনন্দিন ও সাধারণ অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, উহার উপরে এবং অতিরিক্ত অনেক কিছু। তাহার ফলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষের দৈনন্দিন ও ব্যক্তিগত জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল তাহাতে অনুভূতি আরও গভীর, আদর্শ ও কর্ম আরও অনেক উচ্চ, সুখ-দুঃখ আরও অর্থপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। এক কথায় বলা যাইতে পারে, মানুষের সমষ্টিগত জীবনের মাহাত্ম্য যদি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, ব্যক্তিগত জীবনের মূল ও মহিমা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি, এটাও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনের মহিমা সাহিত্যেই প্রথম উপলব্ধি হইয়া পরে বাস্তব জীবনে গিয়াছে। সুতরাং সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে গভীর ও উন্নত করিবার একটা উপায়। মানুষের সাংসারিক জীবনে এই দানই সাহিত্যের সর্বোচ্চ কীর্তি। ইহাকে বাদ দিলে সাহিত্যের মূল্য ও মাহাত্ম্য একেবারে কমিয়া যাইবে, উহা হইয়া দাঁড়াইবে শুধু মানুষের সাধারণ জীবনের ক্ষীণ ছায়া।

মানুষের সমগ্র জীবনে সাহিত্যের যাহা দান, নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে দান তাহারই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কের যে অভি-ব্যক্তির কথা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি (৩৮—৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) উহাও শুধু বাস্তব জীবনের ব্যাপার নয়, উহার পিছনেও সাহিত্যই গভীর এবং ব্যাপক ভাবে

আছে। রোমান্টিক প্রেমের রূপ যে প্রথমে কাব্যে দেখা দিয়া পরে জীবনে যায়, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট আছে।* এই ব্যাপারে সাহিত্যের দাবী খুব কম করিয়া উপস্থাপিত করিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রেমের অনুভূতি অস্পষ্টভাবে মানুষের মনে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আসিয়া থাকিলেও, সাহিত্যেই উহার স্পষ্টতা ও শক্তি পূর্ণরূপে দেখা গেল—অর্থাৎ, সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ দেখিয়াই মানুষ নিজের মনে প্রেমকে চিনিতে পারিল। সাহিত্যে ছাড়া রোমান্টিক প্রেম জীবনে আসিত কিনা, অন্ততপক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

এই যুক্তির অনুক্রমণে ইহাও বলিতে হয় যে, আজও সাহিত্যের বাহিরে নর-নারীর প্রেমের সত্যকার ও পূর্ণ চিত্র পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ ধারণা করা এবং পূর্ণ অনুভূতি পাওয়া অসম্ভব। তাই হৃদয়ে প্রেমের অনুভূতি জাগিবামাত্রই কিশোর-কিশোরীরা কাব্য ও উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করে, এবং পড়িয়া বুঝিতে পারে তাহাদের জীবনে কিসের আবির্ভাব হইতে চলিয়াছে। মানুষের লৌকিক কথাবার্তা হইতে ইহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই বলিলেই চলে।

সাহিত্যে নরনারীর সম্পর্কের এই যে বিবর্তন, ইহার ইতিহাস মনে রাখিয়া বলিতেই হইবে—যে-সাহিত্য এই সম্পর্ককে কাম হইতে প্রেমের স্তরে তুলিয়াছে সেই সাহিত্যের মধ্যেই সেই সম্পর্ককে আবার শুধু কামের স্তরে নামাইয়া দিবার কোনও সার্থকতা নেই। উহা নরনারীর সম্পর্কের বিবর্তনের ধারাকে উজান বহাইবার মত হইবে।

সাহিত্যের সহিত নরনারীর জীবনের এই যে সম্পর্ক, তাহার পুরাতন ইতিহাস মনে রাখিয়াই এই উপসংহারের গোড়ার দিকে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম তাহার আলোচনা করিতে হইবে। প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করিব। বাংলা সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্র পাই, তাহা কি সাহিত্যেই আবদ্ধ ছিল, না জীবনেও আসিয়াছিল? আমি উত্তর দিব, আসিয়াছিল—অর্থাৎ আমি বলিব, বাঙালীর মানসিক জীবনের ইতিহাস এই ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি; শুধু বাঙালীর জীবনের পরিধির মধ্যে। সোজা কথায় বাঙালী জীবনে প্রেম ও বাংলা সাহিত্যে প্রেম, এই দুইটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটিকে আর একটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ধরিয়াই লইতে হইবে, সাহিত্যে প্রেমের যে অনুভূতি পাওয়া

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথম দিক দ্রষ্টব্য।

যাইতেছে তাহা জীবনে গিয়াছে, ও জীবনে যে প্রেম আছে তাহা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে যে বাংলা সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট রূপ যে-ধরনের সেই ধরনটা বিবেচনা করিলে এই যোগাযোগটা আরও নিবিড়, আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোঝা যাইবে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান সৃষ্টি কাব্য ও উপন্যাস, অন্য রচনা পরিমাণেও বেশী নয়, উৎকর্ষেও অসাধারণ নয়। বহু বাংলা কাব্য ও উপন্যাসকে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের উচ্চতম সাহিত্যিক সৃষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষায় দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ বা ধর্ম সংক্রান্ত যে-সব বই লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত কোনও উল্লেখযোগ্য বই-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না, এই তুলনা করিলে সেগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে বোঝা যায়, হৃদয়ের তাগিদ বাংলা সাহিত্যের যে প্রেরণা যোগাইয়াছিল, বুদ্ধির তাগিদ তাহার কাছেও যায় নাই। নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কথাটা আরও জোর করিয়া বলা চলে। মনে হয়, নূতন সাহিত্য হইতে বাঙালী নর-নারীর জীবনে প্রেমের স্রোত আসিবার পর সেই সাহিত্য প্রেমের তৃষ্ণা মিটাইবার প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে—বাংলা সাহিত্য যাহারা পড়িত তাহাদের বেশীর ভাগই যে অল্পবয়স্ক যুবক ও যুবতী ছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। এই যুবক-যুবতীরা তাহাদের হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই সাহিত্য পড়িত ও সাহিত্য হইতে হৃদয়ের খাদ্য পাইত, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্য ও জীবনের সাম্য ছিল কিনা, সে-প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত লেখকদের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে না, কারণ তাঁহারা প্রেমের কথা যে ভাবে লিখিয়াছেন, নিজেদের জীবনে সে-ভাবে অনুভব না করিলে লিখিতে পারিতেন না। প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক একমাত্র পাঠক সম্প্রদায় সম্বন্ধে। ইংরেজ সমাজে বা ফরাসী ও জার্মান সমাজে সাহিত্যের প্রেম যে সমপর্যায়ের সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ করা চলে না, কারণ বহু প্রমাণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনীতেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালীর ক্ষেত্রে এই প্রমাণ একেবারেই নাই সুতরাং দুই-এর মধ্যে তুলনার উপায় নাই।

তবু বাঙালীর চরিত্র ও মানসধর্ম বিবেচনা করিয়া হয়ত এটা বলা অসঙ্গত

হইবে না যে, প্রেমের যে রূপ আমরা বাংলা সাহিত্যে পাই, তীব্রতায়, গভীরতায় ও শক্তিতে তাহার অনুরূপ বাস্তব জীবনে কিছু দেখা দিয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের মন, এবং অতি উচ্চশিক্ষিত অলেখক বাঙালী মনের মধ্যেও একটা গুরুতর অসাম্য ছিল। এই দুইজনের লেখা পড়িয়া অনেক সময়েই আমার মনে প্রশ্ন জাগে,—বাঙালী-সাধারণ ইহাদের লেখার কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল? সাধারণ পাঠকের কথা তুলিব না, কিন্তু বাঙালী সমালোচকদের লেখা যাহা পড়িয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে, এই দুইজন লেখকের বক্তব্যের অর্ধেকও এই সকল বাঙালী সমালোচকদের মনে প্রবেশ করে নাই। তাহা হইলে কি বলিব যে, এই সকল অসাধারণ বাঙালীর মনের সহিত শিক্ষিত বাঙালী মনেরও সমধর্মত্ব ছিল না? বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে এই অসাম্যের পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আছে। লিখিবার পরও লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা অসন্তোষ ছিল, অতৃপ্তি ছিল। তাঁহারা বলিতে পারেন নাই—"অস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা", হয়ত শুধু শুধু আশা করিয়াছিলেন, **"উৎপৎস্যতে"**। ভব-ভূতির ভরসা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, দুই-এরই ছিল, ইহাদের সম্ভবত ছিল শুধু ভবিষ্যতের।

তবে মনের সাম্য না থাকিলেও যোগাযোগ যে ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বাঙালীর মনের একটা গুণ আছে যাহা সেই মনের শক্তিহীনতা ও অগভীরতার ক্ষতি খানিকটা পূরণ করিতে পারে। প্রথমত বাঙালী মনের একটা জাগরূকতা আছে যাহাতে সে নিজে অসাধারণ না হইয়াও অসাধারণতাকে উপলব্ধি করিতে পারে; আর একটা ক্ষমতা আছে—সে কোনও অসাধারণ মনের পরিচয় পাইলে পূজা করিতে পারে। বাঙালীর বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-পূজা এই বৃত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; বুদ্ধির উপরও নয়, আবেগের শক্তির উপরও নয়।

এই পূজা অনেক সময়ই অন্ধ মূর্তিপূজার গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হইয়াছে। আজিকার দিনে বাঙালীর মধ্যে রবীন্দ্র-পূজা যে রূপ ধরিয়াছে তাহা অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রীলোকের বঞ্চিত জীবনের তাড়না হইতে নাড়ুগোপাল বুকে চাপিয়া থাকার মত। আমি এই মূঢ় পূজার বিসম্বাদী কয়েকটা কথা বলিয়া যথেষ্ট গাল খাইয়াছি। তবু আমি বলিব, এই অন্ধ পূজাও অসাড়তার চেয়ে ভাল। ইহা হইতেও বুঝা যায় মনের অসামান্যতা অনুভব করিবার ক্ষমতা বাঙালীর আছে, সুতরাং সেই অসামান্যতার একটু আঁচ সে তাহার সামান্য মনেও আনিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে প্রথমে লিখিয়াছিলেন, তখন পূজাটা এত নির্বিচার এবং অন্ধ ছিল না, অপরপক্ষে অনুভূতিটা আরও প্রবল ছিল। সুতরাং ইঁহারা যে মানস জীবনের রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই মানস জীবনের অন্তত খানিকটা জীবনে আনিবার প্রয়াস বাঙালী তখন করিয়াছিল ; ইঁহাদের সব কথা হয়ত বুঝিতে পারে নাই, তবু এটা অনুভব করিয়াছে যে, ইঁহাদের রচনায় জীবনের যে একটা গৌরব দেখানো হইয়াছে, তাহা তাহাদের জীবনে নাই ; সুতরাং উহা কাম্য, এবং এই কারণেই তাহাকে জীবনে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা বাঙালী নিজের শক্তি অনুযায়ী করিয়াছিল। সে শক্তি বেশী নয়, তবু তাহার সবটুকুই নিয়োগ সে একদিন করিয়াছিল।

প্রেম সম্বন্ধে বাঙালীর কাছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যে নিবেদন, তাহা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ভাষায় আবদ্ধ করিব। তাঁহারা যেন বলিয়াছিলেন,

> "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
> তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
> কোরো না বিড়ম্বিত তারে।"

বাঙালী ইহা হইতে একদিকে বুঝিয়াছিল যে, তাহার প্রেমবর্জিত জীবন অবগুণ্ঠিত ও কুণ্ঠিত, কিন্তু আর একদিকে ইহাও বুঝিয়াছিল, এই জীবনে প্রেমকে বিড়ম্বিত না করিয়া তাহার জন্য হৃদয়দল খুলিতে হইবে, আপন পর ভুলিতে হইবে, দিশা হারাইয়া বাহির ভুবনে তাহার মাধুরী ভারে ভারে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই মাধুরীর আভাস বাঙালীর বাস্তব জীবন হইতে আমি মাঝে মাঝে পাইয়াছি, যেন কোনও লুকানো মালঞ্চ হইতে বেল-যূঁইএর গন্ধ অতি মৃদুভাবে ভাসিয়া আসিতেছে। এই মালঞ্চ কখনও চোখে দেখি নাই, কিন্তু উহার মাধুর্য কল্পনা করিতে পারিয়াছি। তাই উহার কথাও স্মরণ করিয়া একটা বিখ্যাত গান আবৃত্তি করি—"সুন্দর জগৎ, তুমি কোথায় ? ফিরে এসো !"

সূচী

[উদ্ধৃত কবিতা রচয়িতার নামে অথবা রচয়িতা অজ্ঞাতনামা হইলে প্রথম অক্ষরে সূচীবদ্ধ হইয়াছে